উৎপাতের ধন চিৎপাতে

উৎপাতের ধন চিৎপাতে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ।। ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

UTPATER DHAN CHITPATE

প্রথম প্রকাশ :
২৩ জানুআরি ১৯৬৩

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯, মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৭

বর্ণ-বিন্যাস :
কম্প-অ্যাক্ট
সি জি-৮০, সল্ট লেক,
কলকাতা-৭০০ ০৯১

মুদ্রক :
লোকনাথ প্রিন্টিং অ্যান্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : অনিকেত রায়

উৎপাতের ধন চিৎপাতে

জগন্নাথ গোস্বামীর গাড়িটা বড়মামা শেষে কিনে ফেললেন।

বড়মামার যাঁরা ভালো চান, তাঁরা সকলেই বারণ করেছিলেন, 'সুধাংশু কাজটা ভাল করলে না। জগন্নাথ ঘোড়েল লোক। বোকা পেয়ে তোমার মাথায় টুপি পরাতে চাইছে। গাড়িটা পেট্রলে চলে না। ইঞ্জিনের অশ্বশক্তিতে নড়তে দেখিনি। মনুষ্যশক্তিতেই এতকাল চলে এসেছে। কিনতে হয় নতুন গাড়ি কেনো তোমার কি বাপ অত ঠেলাঠেলির লোক আছে! ধধ্ধড়ে জিনিস। খোলটাই আছে. ভেতরে আত্মা নেই।'

জীবনে যে মানুষ কারুর কথাই শোনেননি, শুধু নিজের কথাই শোনাতে চেয়েছেন তিনি বুক ঠুকে গাড়িটা কিনেই ফেললেন।

গাড়ি সোজা চলে গেল কারখানায়। ছিল কালো, ফিরে এল গাঢ় বাদামী হয়ে। ফোম লেদারের ঝকঝকে গদি। বামপারে মরচে ধরেছিল, নিকেল পড়ে ঝকঝকে হয়েছে। হাতল-টাতল সব ঝিলিক মারছে। কার রেডিও, স্টিরিও। আয়োজনে কোনও খুঁত নেই। পেছনের কাচে আধুনিক স্টিকার! ঘোড়া ছুটছে. বড়মামার ইচ্ছে গাড়ি চলবে কীর্তনের সুর ছড়াতে ছড়াতে।

'তুই একবার ভেবে দ্যাখ পিণ্টু, কারুর পাশ দিয়ে হুস্ করে গাড়ি বেরিয়ে গেল, কানে ঠোক্কর মারলো ইঞ্জিনের শব্দ নয়, প্রেমদাতা নিতাই। পৃথিবীতে প্রেমের বড় অভাব রে!'

মেজমামা বললেন, 'তোমার এই কীর্তনাঙ্গ গাড়ি চলবে না দাদা। আসল যে ইঞ্জিন সেইটাই তো নেই।'

'কী করে বুঝলি মেজো? তুই তো সারাজীবন ফিলজফি পড়িয়ে এলি। ঈশ্বর আছেন না নেই। আজ পর্যন্ত সে সমস্যার সমাধানও হল না। ইঞ্জিনের তুই কী বুঝিস?'

'সবাই বলছে!'

'আজও তুই প্রতিবেশীদের চিনলি না। প্রতিবেশী মানে প্রতিবাঁশি। বেসুরে বাজাই হল তাদের কাজ। বাগড়া ছাড়া তারা আর কী দিতে জানে? এই গাড়ি চেপে তুই কলেজ যাবি। কুসী স্কুলে যাবে। আমার কুকুর ডগ-হসপিটালে যাবে।

ছুটির দিনে আমরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবো। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে। সায়েবদের মত। লোকের কথায় নেচো না ব্রাদার। কানপাতলা লোক জীবনে সুখী হতে পারে না।'

মেজমামা বললেন, 'ভালো হলেই ভালো, তবে দশ হাজার টাকায় গাড়ি হয় না দাদা। ছ্যাকড়া গাড়ি হতে পারে।'

'আচ্ছা দেখাই যাক না কী হয়। নো রিস্ক, নো গেন। ইংরেজিটা ভোলোনি নিশ্চয়?'

বড়মামা একটা ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে গাড়ির পালিশকে আরও পালিশ করতে লাগলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি পাশে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে। আমার দায়িত্ব লাকির ওপর নজর রাখা। লাকির স্বভাব হল, আদরের জিনিসে সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে জিভ বের করে হ্যাহ্যা করা। মানুষের গায়ে আঁচড় লাগলে হরেক রকম ওষুধ আছে। গাড়ির পালিশে আঁচড় লাগলে একমাত্র ওষুধ আবার পালিশ চড়ানো!

নিকেলের হাতল ঘষতে ঘষতে বড়মামা লাকিকে অনবরত সাবধান করে চলেছেন 'লাকি খুব সাবধান, পা তুলবে না!'

আমার একটা প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত যার সঠিক উত্তর কারোর কাছেই পেলুম না কুকুরের চারটেই পা, না সামনের দুটো হাত পেছনের দুটো পা?

প্রশ্নটা বড়মামাকে আবার একবার করতুম, সুযোগ পেলুম না। বাঘাদা এসে গেলেন। বড়মামাকে গাড়ি চালানো শেখাবেন। সাংঘাতিক চেহারা। রয়াল বেঙ্গলের মত গোঁফজোড়া। প্রায় ফুট-ছয়েক লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। বাঘের মত গলা। টাইপ প্যান্ট-জামা পরা। আমাকে একটু টুস্‌কি মারলে উলটে পড়ে যাব। লাকি যথারীতি হাত তিনেক পেছিয়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

বাঘাদা বললেন, 'আপনার কুকুরটা আমাকে দেখলেই অমন করে কেন বলুন তো?'

বড়মামা বললেন, 'ওর তো দৈত্য দেখার তেমন অভ্যাস নেই। দু-একদিন দেখতে দেখতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

বাঘাদা বাঘের মত গলায় হেসে উঠলেন। লাকি আরও একপা পেছিয়ে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

মাসিমা দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা সাত-সকালেই কী আরম্ভ করলে? লোকে সকালে প্রভাতী গান শোনে, কীর্তন শোনে, এ বাড়ির যেন সবই অদ্ভুত। রাতে ছুঁচোর কীর্তন, সকালে কুকুরের কনসার্ট।'

বাঘাদা ওপরদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না দিদি!'

'তোমাকে নয়, তোমার ওই কাঠবেড়ালির ল্যাজের মত গোঁফ ও সহ্য করতে পারছে না। কাল আসার আগে কামিয়ে এসো।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। বাঘাদা করুণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা সুধাংশুদা, আমার ভেতরে কি একটা চোর আছে? শুনেছি কুকুর মানুষ চিনতে পারে!'

'তুমি কি আচার চুরি করে খাও?'

'ছেলেবেলায় খেতুম।'

'অ্যায়, ঠিক ধরে ফেলেছি। কুকুরের নাক বড় সাংঘাতিক। আমি যেদিন সিরাপ চুরি করে খাই, আমাকে খুব ধমকায়।'

'সিরাপ চুরি?'

'ওই যে গো, ডাক্তারখানায় সিরাপ থাকে না, মিকশ্চার তৈরি হয়। ওই জিনিসটার ওপর আমার অনেকদিনের লোভ, যেই দেখি কম্পাউন্ডার চা কি সিগারেট খেতে গেছে অমনি বোতল খুলে খানিকটা মুখে ঢেলে দি।'

'সিরাপ তো আপনার নিজেরই জিনিস, নিজে খেলে চুরি হয় না কি?'

'ধুস, সিরাপ তো রুগীদের। মাঝে মাঝে কম্পাউন্ডার ধরে ফেলে, কী হল, এই দেখে গেলুম আধ বোতল সিরাপ এরই মধ্যে সিকি বোতল হয়ে গেল! আমি ভয়ে চুপ করে থাকি। ফ্যাঁস-ফোঁস করে খুব মন দিয়ে রুগীর ব্লাড-প্রেসার দেখতে থাকি। চুরি করে খাওয়ার যে কি আনন্দ কুকুর বুঝবে কী করে!'

বাঘাদা বললেন, 'চলুন এইবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর রাস্তাঘাট আর ফাঁকা পাওয়া যাবে না।'

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ বড়মামা পাশে। আমি পিছনে। লাকিও আসার জন্যে বায়না ধরেছিল। বেশ মোটা একটা মাংসের হাড়ের লোভ দেখিয়ে হরিয়ার কোলে তুলে দিয়ে আসা হয়েছে।

গাড়ি বি-টি রোডে বেরিয়ে এল। সবে রোদ উঠেছে। চারপাশ ঝকঝক করছে। দু-চারটে লরি হুসহাস করে আসছে-যাচ্ছে। গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ-পাশে দাঁড় করিয়ে বাঘাদার সঙ্গে বড়মামার জায়গা বদল হল। বাঘাদা এক রাউন্ড বক্তৃতা দিয়ে নিলেন ক্লাচ কাকে বলে, ব্রেক কোন পায়ে, গিয়ার কাকে বলে।

বড়মামা বললেন, 'হাত-পা কেন কাঁপছে বলো তো?'

'ভয়ে। ও ভয় এখুনি কেটে যাবে। ভয়ের কী আছে! একটা জিনিস শিখিয়ে

দি, অসুবিধে দেখলেই থেমে পড়বেন। থামার আগে জানালা দিয়ে ডান হাতটা বের করে দেবেন।'

'তার মানে?'

'মানে বুঝবে পেছনের গাড়ি। মানে তোমরা পাশ দিয়ে এগিয়ে পড় আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনাকে রোডসাইনের যে বইটা দিয়েছি সেটা ভালো করে দেখেছেন? নো রাইট টার্ন, নো লেফট টার্ন, ক্রসিং অ্যাহেড।'

'ও আমি সব দেখে নেবো। এখন তো আর লাগছে না। এখন তো সোজা যাবো, সোজা ফিরে আসব।'

'না না, ওটা আপনি সবার আগে ভালো করে বুঝতে শিখুন। সোজা রাস্তায় সবসময় চলা যায় না। জীবন অত সোজা নয়। পদে পদে বাঁক, ক্রসিং, বাম্প।'

বড়মামা ক্লাচ ছাড়লেন, গাড়ি সাংঘাতিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উল্কার বেগে সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার একটা ঝাঁকানি মেরে থেমে পড়ল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়ের বেগে একটা লরি দু-ইঞ্চি তফাত দিয়ে চলে গেল। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম।

বাঘাদা জিজ্ঞেস করলেন 'এটা কী করলেন?'

'কী জানি কী করলুম, কোন্ পা কোথায় চলে গেল!'

'কোন্ পা কোথায় চলে গেল মানে? একটা পা ক্লাচে, একটা পা ব্রেকে, স্টিয়ারিং-এ গিয়ার। এই তো আপনার মোট তিনটে যন্ত্র। এটা ছাড়বেন, প্রয়োজন হলে ওটা চাপবেন।'

'আমি ভুলে লেফট-রাইট করে ফেলেছিলুম। অনেক দিনের অভ্যাস তো।'

'এখুনি তো আমরা তিনজনই মারা পড়তুম।'

'তুমি তো আমার পাশে আছ।'

'পাশে আছি, কিন্তু পায়ে তো নেই!

'নাও, নাও অনেক বকেছ। আর ভুল হবে না।'

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। একটু লগবগ করলেও বেশ চলেছে। সোজা রাস্তা চলে গেছে ব্যারাকপুরের দিকে। টিটাগড়ের কাছে এসে গাড়ি হঠাৎ গোঁত করে রাস্তার বাঁ পাশ থেকে ছুটে সোজা নেমে গেল পাশে। স্টিয়ারিং নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রের যুদ্ধ চলছে। ধামা, কুলো, ধুচুনি সাজানো ছিল, মড়মড় করে মাড়িয়ে দর্মার বেড়া ঠেলে গাড়ি সোজা ঢুকে পড়ল আটচালায়। চারদিকে গেলো গেলো শব্দ।

একটা উনুনের দু-হাত দূরে গাড়ি থেমে পড়ল। মনে হচ্ছে দরমার গাড়ি। যমদূতের মত গোটা চারেক লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে। নামলেও মারবে, না নামলেও মারবে। এত বিপদেও বাঘাদার সেই এক প্রশ্ন, 'এটা কী করলেন?'

মারমুখী লোক চারটির একজন বড়মামার রুগী। বড়মামা লোক বুঝে, অবস্থা বুঝে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। এ সেই রকম একজন রুগী। বড়মামাকে দেখেই চিনেছে, 'আরে ডাক্তারবাবু যে!'

বড়মামা হাসিমুখে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। যেন প্লেন থেকে পাইলট নেমে এল। বড়মামা বললেন 'রামু হিসেব কর কত টাকা গেল।'

রামু বললে, 'হিসেব পরে হবে। রামজী আপনাকে পাঠিয়েছেন। ওই দেখুন আমার বহু, বোখার হয়ে পড়ে আছে।'

হাত-পাঁচেক দূরে মাচার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন আপদমস্তক মুড়ি দিয়ে। গাড়ি আর কিছু দূর এগোলেই অসুখ সেরে যেত!

রুগীর মুখ দেখেই বড়মামা বললেন, 'ম্যালেরিয়া। পিলে বেশ বড় হয়েছে রে। ডিসপেনসারিতে আয় ওষুধ দিয়ে দেবো। এক পুরিয়ার ব্যাপার।'

রুগী দেখতে দেখতে হিসেবও হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শ-তিনেক টাকা।

বাঘাদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'ছ-টা দরমা আর গোটাকতক ঝুড়ির দাম তিনশো টাকা? ভালোমানুষ পেয়ে টুপি পরাতে চাইছ? ধর্মে সইবে?'

'ধর্মটর্ম বলবেননি বাবু, দিন-কাল কি পড়েছে?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বটেই। তাতো বটেই!'

'তাতো বটেই?' বাঘাদা হুঙ্কার ছাড়লেন। 'ওই দরমা আর ঝুড়ি সব আমি নিয়ে যাবো।'

'আঃ, বাঘা নীচ হয়ো না।' বড়মামা শাসনের গলায় বললেন।

'রাখুন মশায় আপনার নীচ। মূল্য যখন ধরে দিতেই হবে, মাল আমাদের।'

'কী করবে?'

'পুড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে দেবো।'

বাঘাদার গোঁ বাবা। দরমা আর ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে গাড়ি বাড়ি ফিরে এলো নটার সময়! এবার আর বড়মামা নয়, বাঘাদাই গাড়ি চালালেন। রাস্তার দুপাশ থেকে বড়মামার যাঁরা চেনা, তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ভালো সওদা হয়েছে ডাক্তারবাবু। তবে একটু দেখেশুনে আস্ত মাল কিনতে পারলে আরও ভালো হত!'

মাসিমা বাগানে খরগোসদের ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন ; দেখেই হই হই করে উঠলেন, 'একি, একি? মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তোলা গাড়ি না কি? এ সব কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে?

বাঘাদা বললেন, 'তুলে আনিনি। কিনে এনেছি দিদি। তিনশো টাকা দাম।'

মেজমামা আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একমনে জগিং করছিলেন। তিনশো মনে হয় এখনও হয়নি। মাঝপথেই থেমে পড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাথায় আবার কি ব্রেন্‌ওয়েভ খেলে গেল, ভাঙা কঞ্চি আর বাঁখারি দিয়ে কী বানাবে, গ্রিন হাউস?'

বড়মামা এতক্ষণে কথা বললেন, 'আরে না রে বাবা। এরা চাপা পড়েছিল। এসব হল ডেডবডি, ক্যাজুয়েলটিস।'

'অ্যাঁ বলো কি, এক চাপাতে অনেক নামিয়েছ তো, প্রায় লরির রেকর্ড।'

মাসিমা বললেন, 'উঃ, মানুষ হলে কী করতে? তোমাকে নিয়ে আর পারি না বড়দা! তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার রাতের ঘুম গেছে। মেজদা তুমি বললে কিচ্ছু ভাবিসনি কুসী ও গাড়ি চলবে না। গাড়ি চলছে না শুধু, চাপা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

বাঘাদা বললেন, 'চাপা নয়, ভাঙা দিদি। এটা একটা দরমার ছাউনির ভাঙা অংশ। আমরা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলুম। আপনি কলও বলতে পারেন। ওঁরা মনে মনে ডাক্তারবাবুকে ডাকছিলেন। গাড়ি একেবারে রুগীর বিছানার পাশে গিয়ে থামল। ডাক্তারবাবু নেমেই রুগীর নাড়ী টিপে ধরলেন। ভালো ডাক্তার তো, শুধু ওষুধের ব্যবস্থা নয়, তিনশো টাকা দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিলেন।'

'ভিটে-মাটির যে-টুকু আছে সেটুকু এবার খেসারত দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাক। তারপর একদিন ভালো করে পাবলিকের হাতে আড়ং-ধোলাই হোক। তবে যদি তোমার চেতনা হয়!'

মেজমামা আবার জগিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'তুমি চালিয়ে যাও বড়দা। এইভাবে রেকর্ড করতে করতে একদিন তুমি ট্রাক-ড্রাইভার হতে পারবে। এখন থেকে পাগড়ি বাঁধাটা অভ্যাস করে রাখো, খইনি ধরো, তোমার ব্রাইট ফিউচার।'

মেজমামা লাফাতে শুরু করলেন এক-দুই-তিন...

বাগানের একপাশে ধামা ধুচুনি দরমা ভাঙা পড়ে রইল। গাড়ি ব্যাক করে ঢুকে গেল গ্যারেজে। বাঘাদা হাসি হাসি মুখে মাসিমাকে বললেন, 'দিদি অনেক বকেছেন, এবার বেশ বড় এক কাপ চা।'

॥ ২ ॥

দিন পনের হয়ে গেল, বড়মামা গাড়ি চালানো শিখছেন। মাসিমা আমাকে আর বড়মামার সঙ্গে যেতে দেন না। বিপদ হলে কে দেখবে! তাছাড়া সকালে লেখাপড়া করবে না বড়দের সঙ্গে হই হই করে বেড়াবে? বাঘাদা বলছেন বড়মামার হাত-পা দুটোই নাকি বেশ ধাতে এসে গেছে।

আজ রবিবার। পড়ার ছুটি। বড়মামা বললেন 'কুসী বাঘা সার্টিফিকেট দিয়েছে। আজ আমি পিণ্টু আর লাকিকে নিয়ে বেরোই? ছেলেটা রোজ মুখ শুকিয়ে থাকে, আর লাকিটা একদিনও গাড়ি চাপেনি! কুকুর বলে কি মানুষ নয়?'

বাঘাদা বিশাল গলায় বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ আজ ওরা চলুক। ঘরে থেকে থেকে সব ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। এ যুগ হল ফাইটিং-এর যুগ। কিন্তু...।'

কিন্তুতে এসে বাঘাদা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু হয়ে গেলেন।

বড়মামা বললেন 'থামলে কেন, শেষ করো, শেষ করো।'

'কিন্তু লাকি যদি পেছন থেকে ঘাড়ে ঘ্যাঁক করে দেয়!'

'আমার কুকুর সে কুকুর নয় বাঘা। ও মানুষ হলে নেতা হত, বুঝলে! ধমকায়, ভয় দেখায়, কদাচ কামড়ায় না। চলো বেরিয়ে পড়ি। হাত-পা নিসপিস করছে।'

মাসিমা হ্যাঁ না বলার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। লাকি চনমন করছে। বেড়াতে যাবার নাম শুনলেই আনন্দে আটখানা! পেছনের ডান পাশের জানালায় লাকির জিভ বের করা মুখ। বাঁ পাশের জানালায় আমার মুখ। ফরফর করে গাড়ি চলছে! জানি না এই কদিনে বড়মামা কী কী করেছেন। তবে অনেককেই দেখলুম, গাড়ি দেখে হয় নর্দমা টপকে রকে, না হয় খুব দ্রুত পা চালিয়ে কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে।

বাঘাদা খালি বলছেন 'অত শক্ত হচ্ছেন কেন? বেশ নরম হয়ে চালান, নরম হয়ে চালান।'

আজ আবার গান চলেছে, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

শুকচর চলে গেল, চলে গেল সোদপুর। টিটাগড়ের সেই ধামা-ধুচুনি-ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে গেল। লাকি মাঝে মাঝে নেচে উঠছে! বাতাসে ফুরফুর লোম উড়ছে। ফুটফুটে, খুশি খুশি মুখ, ঢুলঢুল চোখ। গান চলেছে 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে ॥ কণ্ঠ যে রোধ করে...।'

বড়মামা অকারণে মাঝে মাঝে হর্ন বাজাচ্ছেন। বাঘাদা বলছেন 'শুধু শুধু হর্ন দিচ্ছেন কেন? মিসিয়ুস্ অফ হর্ন।'

'যাঃ, ওটাও তো রপ্ত করতে হবে। শিখছি যখন সব ভালো করে শিখব। ফাঁকিবাজি আমার কোষ্ঠীতে নেই। সাফল্যের চাবিকাঠি কার হাতে? নিষ্ঠার হাতে।'

কথা শেষ করেই একবার হর্ন দিলেন। বাঁ পাশ দিয়ে ভুঁসকো চেহারার গোটাকতক মোষ যাচ্ছিল ; একটা ভীতু মোষ চমকে লাফিয়ে উঠতেই, লাকি বিকট সুরে ঘেউ ঘেউ করে পেছনের আসন টপকে সামনের আসনে।

তারপর পরপর সব ঘটতে লাগল। গাড়ি রাস্তা ছেড়ে গড়িয়ে একটা মাঠে নেমে গেল। বাঘাদা বলছেন 'ব্রেক ব্রেক।'

বড়মামা বলছেন 'ব্রেক কোন্‌টা, ক্লাচ কোন্‌টা?'

লাকি বলছে 'ঘেউ ঘেউ।'

স্টিরিও বলছে, 'কণ্ঠ যে রোধ করে সুর তো নাহি সরে।'

ওদিকে হু হু করে এগিয়ে আসছে একটা জলা। কচুরিপানা ভাসছে। আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ইংরেজি সিনেমা দেখছি।

বাঘাদা কোনওরকমে পা বাড়িয়ে, হেলে কাত হয়ে কী একটা করলেন। পুকুরপাড়ে এসে গাড়ি থেমে পড়ল। চান করা আর হলো না।

বড়মামা হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কি রকম হলো?'

বাঘাদা বললেন, 'দারুণ, তুলনাহীন! আর একটু হলেই ভরাডুবি হত!'

বড়মামা, নেমে পড়লেন, 'আঃ কি সুন্দর! সবুজ সবুজ, যেন সবুজের সাহারা। ঘাসের গন্ধ, জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। মাথার ওপর নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে! ফড়িং দেখেছো ফড়িং?'

বাঘাদা বললেন, 'আপনি প্রাণ খুলে ফড়িং দেখুন। আমি ততক্ষণ রেল ঘর থেকে একটা ক্রেন নিয়ে আসি। টো করে গাড়িটাকে ওপরে তুলতে হবে।'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুমি কখন ফিরবে?'

'তা তো বলতে পারছি না।'

বাঘাদা দূরে ক্রমশ ছোটো হতে হতে একটা পুতুলের মত হয়ে গেলেন। গাড়ির ভেতরে গান বাজছে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।'

বড়মামা হঠাৎ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললেন, 'উঃ! কোথায় নেমে এসেছি দ্যাখ। একবার তাকিয়ে দ্যাখ। রাস্তাটা মনে হচ্ছে পাঁচতলা উঁচুতে।

ছিপ হাতে দুজন এদিকেই আসছেন। বড়মামা বললেন, 'সেরেছে, চেনা হলেই বিপদ।'

চেনা হবে না মানে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বড়মামার রুগী ছড়িয়ে আছে।

'আরে ডাক্তারবাবু যে!' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'গাড়ি চান করাচ্ছেন?'

'না হে না এসেছিলুম মাছ ধরতেই, তোমাদের চিন্তায় আজকাল সব ভুলে যাই। এখন দেখছি ছিপ আনতেই ভুলে গেছি।'

'আর তার জন্যে মাছ ধরা আটকাবে? আমরা কী করতে আছি! একস্ট্রা ছিপ আছে। চলুন বসে যাই। আপনার খুব সাহস ডাক্তারবাবু, গাড়ি নিয়ে নামলেন কী করে?'

বড়মামা বীরের মত হাসলেন, হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে পুকুর ধারে চলে গেলেন। হয়ে গেল আজ। বড়মামার সাংঘাতিক মাছধরার নেশা। একবার বসে পড়লে, সহজে আর উঠছেন না।

'লাকি, আজ আমাদের উপোস।'

লাকি উত্তরে আমার গাল চেটে দিল। কখন যে বাঘাদা আসবেন ক্রেন নিয়ে, ঈশ্বরই জানেন। মাসিমার কথা শুনলে এই দুর্ভোগ আর হত না। এতক্ষণ ছাদে উঠে চাঁদিয়াল ঘুড়িটা ওড়াতুম ফড়ফড় করে। বড়মামা ওদিকে চার করে ছিপ নিয়ে বসে পড়েছেন। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশ একেবারে ঘন নীল। হাত নেড়ে রঙ বেরঙের ঘুড়িকে ডাকছে—আয়, আয়, উঠে আয় আমার বুকে। পকেটে একটা চকোলেট আছে। মুখে ফেলতে পারছি না লাকির জন্যে। ও বেচারা কী খাবে?

মনে মনে বাঘাদাকে ডাকতে লাগলুম। বাঘাদা, এসো, বাঘাদা এসো। ডাকের কোনও জোর নেই। ঘণ্টা ছয়েক পরে বাঘাদা এলেন পান চিবোতে চিবোতে। সঙ্গে ক্রেন নয়, ভীম ভবানীর মত চারটে লোক, মোটা একটা কাছি। আমার কাছে এসে বললেন, 'ফাসক্লাস।'

'কী ফাসক্লাস?'

তরুণের দোকানের ফিসফ্রাই। এক একটা প্রায় আধ হাত চওড়া। স্যালাড আর রাই দিয়ে খেতে যা লাগল না, টেরিফিক। অনেক ঝামেলা তো, তাই গায়ে একটু জোর করে নিলুম। পেটে খেলে পিঠে সয়। সুধাংশুদা গেলেন কোথায়?'

'ওই তো মাছ ধরতে বসে গেছেন।'

'অ্যাঁ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। যাক, আমার কাজ আমি করে যাই।'

পেছনের বাম্পারে দড়ি বাঁধা শুরু হল। সে এক এলাহি ব্যাপার। লাকি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এক দৈত্যতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সামনে পাঁচ-পাঁচটা দৈত্য।

একজন দৈত্য বললে, 'ইতনা চিল্লাতা কেঁউ।'

লাকি উত্তর দিলে, 'ঘেউ ঘেউ।'

বেলা বারোটার সময় আমরা তিনজন বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা পুকুর ধারেই রয়ে গেলেন। কার ক্ষমতা ওঠায়। মাসিমার ভয় দেখালুম, তাতেও কোনও ফল হল না। হাত নেড়ে বললেন, 'তোমার মাসিমাকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি, এ লস্ট চাইল্ড!'

মাসিমা শুনে বললেন, 'দাঁড়া, আমি ওই গাড়ি টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দেবো। বড়কত্তার বড় বাড় বেড়েছে!'

মেজমামা বললেন, 'কী করে খুলবি?'

'হাতুড়ি মেরে তাল তুবড়ে দোবো। এতবড় সাহস, বলে কিনা তোমার মাসিকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি। হারাচ্ছি দাঁড়াও, আমাকে চেনে না?'

তিন সেন্টিমিটার একটা মাছ হাতে সন্ধের মুখে বড়মামা বাড়ি ঢুকলেন। সারাদিনের রোদে আর মাসিমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে! ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুসী কোথায়?'

'বাথরুমে চান করছেন।'

'মেজাজ?'

'ফায়ার। বলেছেন, নিলডাউন করিয়ে রাখবেন আপনাকে, আর গাড়িটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে দেবেন জলে।'

'এসে কী বলেছিস?'

'যা বলেছিলেন।'

'ইস্, এখন কী হবে? কে আমাকে বাঁচাবে? মশারি ফেলে শুয়ে পড়ি। খোঁজ করলে বলবি, হাই ফিভার। তোর কাছে রসুন আছে?'

'রসুন কী করবেন?"

'সেই যে ছেলেবেলায় যেমন করতুম। চেপে শুয়ে থাকব। দেখতে দেখতে জ্বর এসে যাবে।'

॥ ৩ ॥

বাঘাদা বটতলায় দাঁড়িয়ে বললেন 'নাঃ আপনার হাত মোটামুটি ভালই তৈরি হয়েছে। এখন দরকার সাহস।

বড়মামা হাসলেন, 'সাহস? পৃথিবীতে কুসীকে ছাড়া আমি কাউকে ভয় পাই না বাঘা।'

গাড়ির পেছনে একটা এল অক্ষর লেগে গেছে, বড়মামা লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।

'আপনাকে ব্যাকগিয়ারটা আর একটু ভাল করে সাধতে হবে।'

'এখন থেকে দিনকতক তাহলে অনবরত পেছন দিকেই চালাই।'

'না, তার দরকার নেই। সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে ার করতে গ্যারেজে ঢোকাতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আজ গাড়িটা আপনি একা বর করুন। দেখি কেমন পারেন।'

গ্যারেজের উল্টো দিকে নিত্যবাবুর বাড়ি। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। বাঘাদা কবারেই গোঁত করে বের করে ফেলেন। বড়মামা স্টার্ট দিলেন। স্টিয়ারিংকে মস্কার করলেন। বাঘাদা সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ভঙ্গি করে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাঘাদা যে ভাবে বের করেন, বড়মামা সেইভাবে ওস্তাদী কায়দায় সাঁৎ করে ুরে বেরবার চেষ্টা করলেন। হলো না। বাঘাদা লাফিয়ে সরে গেলেন। গাড়ি ্যারাচে হয়ে নিত্যবাবুদের দেয়ালে ধাক্কা মারার আগেই বড়মামা ব্রেক কষলেন। াড়ি টুক করে দেয়ালে ঠোক্কর মারল।

সাহসী বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করলেন। এবার গাড়ির পেছন দিকটা ্যারেজের দেয়ালে লেগে গেল। তারপর সামনে পেছনে পরপর এমন সব ায়দা করলেন, দু'বাড়ির দেয়ালের মাঝে গাড়ি কোনাকুনি আটকে গেল। াগোতেও পারে না, পেছতেও পারে না।

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ বসে নানাভাবে চেষ্টা করলেন। ঘেমে নেয়ে গেছেন। অসম্ভব। কী করে এমন করলেন? বড়মামা হেসে বললেন 'সে এক রকমের ায়দা।'

'কায়দা? সারাজীবন গাড়ি এই কায়দাতেই পড়ে থাক।'

'অ্যাঁ, সে কী? অ্যাঁ, সে কী!'

'কেন তুমি একে ম্যানেজ করতে পারবে না? তোমার তো পাকা হাত।'

'স্বয়ং ঈশ্বর এলেও পারবেন না।'

'বাঘাদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন। বড়মামা চিন্তিত।

'বাঘা কী, হবে তাহলে? ওই নিত্যবাবুর বাড়িটাকে ঠেলে একটু পেছিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।'

'গাড়ি ঠ্যালা যায় সুধাংশুদা, বাড়ি ঠ্যালা যায় না।'

গাড়ির এ-পাশে ও-পাশে ঘুরে ঘুরে দুজনের নানারকম গবেষণা চলেছে। ড়মামা মাঝে মাঝে হতাশ মুখে নিত্যবাবুর নতুন তিনতলা বাড়িটার দিকে াকাচ্ছেন, পারলে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে উড়িয়ে দিতেন। এদিকে সারি সারি াইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'পাশে! মানুষের লাইন পড়ে গেছে। কারুর াতে বাজারের ব্যাগ, কারুর মাথায় ঝাঁকা, কারুর কাঁধে ফুলঝাড়ু। পিঠে

কাগজের বস্তা। একটা দুঃসাহসী ছেলে গাড়ির চাল টপকে চলে গেল। বড়মামা হাঁ হাঁ, করে উঠলেন।

সোনপাপড়িঅলা হাঁকছে, 'চাই সনপাপড়ি!'

কাগজওয়ালা হাঁকছে, 'পুরানা কাগজ।'

ফুলঝাড়ু হাঁকছে 'চাই ঝাড়ু।'

এরই মধ্যে একটি সাইকেল রিকশায় মাইক নিয়ে বসে কবিরাজী দাঁতের মাজন। তিনিও চুপ করে বসে নেই, 'দাঁত কনকন, গরম খেতে পারেন না, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই কবিরাজী কালো দাঁতের মাজনটা...।'

রিকশা, সব কটা হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করছে!

'কী হোলো দাদা!'

বাঘাদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ তো দেখছি ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম গ্যারেজটা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই।'

'তাহলে যে দোতলাটাও নেমে আসবে বাঘা?

'উপায় কী? কতক্ষণ এদের আটকে রাখবেন?'

হুই-হট্টগোলে মাসিমা আর মেজমামা এসে গেছেন।

মাসিমা বললেন, 'যা চেয়েছিলুম তাই হয়েছে। বাঘাদা এই আপদটাকে খণ্ড খণ্ড করে লণ্ডভণ্ড করে দাও!

বড়মামা আর্তনাদ করে উঠলে, 'না, কুসী, না!'

'না মানে? এছাড়া আর কী উপায় আছে? বাড়ি তুমি ভাঙতে পারবে না তোমার এই ভাঙা গাড়ি ভাঙা যায়। উৎপাতের ধন চিৎপাতেই যাক।'

বড়মামার সেই গাড়ি আজও আছে। সবটাই আছে। গ্যারেজেই আছে জুড়ে নিলেই হয়। চারটে চাকা চার দেয়ালে ঠেসানো। চলতে চায়, পারে না, কারণ ইঞ্জিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একপাশে। গাড়ির খাঁচায় আমাদের পুষি ছটা বাচ্চা নিয়ে চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। সামনের আর পেছনের গদি বড়মামার ঘরে লাকি চাখাচাখি করছে। ফোম লেদার তেমন সুবিধে করতে পারছে না ব্যাটারিটা খুব সার্ভিস দিচ্ছে। আলো চলে গেলে দুটো ফ্লোরেসেন্ট বাতি জ্বলে

সবই আছে. নেই কেবল বড়মামার উৎসাহ। তিনি এখন রিসার্চ করছেন অন্য বিষয় নিয়ে। গোটা তিরিশ বাঁদর এনে বারান্দায় রেখেছেন, সার সার খাঁচায়। যুগান্তকারী একটা কিছু করবেন। নোবেল পুরস্কার নাকি আর বেশি দূরে নেই।

বালির ওপর পোল

মান্দারহিলে আমরা বেড়াতে গেছি। শীতের সময়। সঙ্গে আছেন আমার কাকা। ভীষণ ডাকাবুকো মানুষ। সাহস খুব বেশি হলে বলা হয়, দুঃসাহস। বাইরে চেঞ্জে গেলে সকাল-বিকেল বেড়াতেই হবে। না বেড়ালে চেঞ্জে এসেছ কেন? কেউ না প্রশ্ন করুক, নিজেদের বিবেকই প্রশ্ন করবে।

বেলা তিনটের সময় কাকাবাবু বললেন, গেট রেডি। কোট পরো। মোজা চাপাও। মাফলারে মাথা মোড়ো। আজ আমরা বহুদূরে যাবো হাঁটার রেকর্ড করব। দুধ খেয়েচো?

তখন সস্তাগণ্ডার বাজার। দুধের বন্যা বইছে। রোজ সকালে বিশাল এক বালতিতে দুধ আসে। এত দুধ যে, তাইতে রূপকথার রাজপুত্রের মত স্নান করা যায়। বাড়ির আশেপাশে অসংখ্য বাঁশ আর বেতের ঝাড়। সেই বাঁশঝাড় থেকে কচি বাঁশ কেটে এনে, দুধ মন্থনের যন্ত্র তৈরি হয়েছে। মুখের দিকটা ডাল-ঘোঁটার কাঁটার মত ছেতরে দেওয়া হয়েছে। নীলচে সবুজ কচি বাঁশ যে কী সুন্দর দেখতে! একটা থামের পাশে দুধভর্তি বালতি। থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই বাঁশের টুকরো দুধে ডুবে আছে। বাঁশে প্যাঁচানো আর একটা দড়ির দু-প্রান্ত ধরে টানো. কাঁটা অমনি বনবন করে দুধের মধ্যে ঘুরতে লাগল তরঙ্গ তুলে। সে এক আশ্চর্য খেলা! যত ঘোরে ততই মাখন ভেসে ওঠে. ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো। সারা সকাল দুধ মন্থন করেই কেটে যায়।

সেই দুধ এক গেলাস চোঁ চোঁ করে খেয়ে আমরা তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবুর হাতে একটা পাঁচ শেলের বিরাট টর্চ। সূর্য পাটে বসার আয়োজন করছে। সারাদিনের পর ছুটির সময় আসছে। আবার দেখা হবে কাল সকালে। দূরে আকাশের গায়ে মান্দারহিল লেগে আছে। সমুদ্র মন্থনের সময় ওই পাহাড়কেই দেবতা আর অসুরের মন্থন দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পাহাড়ের গায়ে নিচের দিকে দড়ি বাঁধার দাগ গোল হয়ে আছে, আমরা দেখে এসেছি, একদিন। দড়ি নয়, বাঁধা হয়েছিল বিশাল ময়াল সাপ। দেবতারা ধরেছিলেন ল্যাজের দিক, অসুরের ধরেছিলেন মুখের দিক। টানাটানির চোটে সাপের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল কলসি কলসি গরল। সেই গরল

ধারণ করেছিলেন মহাদেব। গলার কাছটা নীল হয়ে গেল। মহাদেব হলে
নীলকণ্ঠ।

আমরা দু-জনে হাঁটছি আর হাঁটছি। কাকাবাবু হাঁটছেন নেচে নেচে। হাঁটা
বেগও তেমনি। আমাকে মাঝে মাঝে দৌড়তে হচ্ছে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে
একটা পিচের রাস্তা সোজা চলে গেছে। কখনও উঠছে ওপরে, কখনও নামে
নিচে। চারপাশে ফাঁকা মাঠ। ছড়ানো পাথর। ছোটো, বড়, মাঝারি। যে
দৈত্যদের লড়াই হয়ে গেছে।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর আমার পা ধরে গেল। আর পারছি না হাঁটতে
কাকাবাবু বললেন তুই এখানে বসে থাক। আমি মাইল দশেকের আগে থামবে
না।

চারপাশে ফাঁকা মাঠ। বাবলাগাছের ঝোপ। রাশি রাশি পাথর। ছোট-বড়
টিলা। সূর্য নেমে যাচ্ছে হু হু করে পাহাড়ের আড়ালে। শীত আসছে হিল হিল
করে সাপের মত। কাকাবাবু কথা কটা বলেই যে গতিতে হাঁটছিলেন, সেই
গতিতেই এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। দুরত্ব বেড়েই চলেছে। ভয়ে বুক
কাঁপছে। চিৎকার করে ডাকলুম, কাকাবাবু!

প্রতিধ্বনি ঘুরে এল। যতবার ডাকি ততবারই আমার গলা, আমার ডাক ব
ছোটো ঢেউয়ের আকারে ফিরে ফিরে আসে। ভীষণ ভয়ে ছুটতে শুরু করলুম
যে পা হাঁটতে পারছিল না, সেই পা দৌড়োচ্ছে দেখে অবাক!

বেশ খানিকটা ছুটে কাকাবাবুকে ধরে ফেলে হাঁপাতে লাগলুম। রাগে
অভিমানে চোখে জল এসে গেছে। কাকাবাবু পিঠে হাত রেখে বললেন, কী
বুঝলি? দেহের জোরে মানুষ সব পারে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে।

আমি না এলে আপনি আমাকে ফেলে চলে যেতেন?

না রে পাগল। আমি তোকে সাহসী করতে চাই, কষ্টসহিষ্ণু করতে চাই

এইবার আমরা দু-জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগলুম। কাকাবাবু গান
ধরলেন, দুর্গম গিরি...। গানের ফাঁকে ফাঁকে আমি কেবল বলতে লাগলুম, সন্ধে
হয়ে গেলে কী হবে?

ঘোড়ার ডিম হবে। দুর্গম গিরি...

আমরা ফিরবো কী করে?

ফিরবো না, কান্তার মরু...

আমার কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না। হঠাৎ দূর আকাশের গায়ে একটা

ব্রিজ দেখা গেল। দিন-শেষের সোনালি রোদ পড়ে, রুপোর মত ঝক ঝক করছে।

আরেব্বাস ব্রিজ রে। বলে কাকাবাবু ছুটতে লাগলেন।

আশ্চর্য, ব্রিজ কোথা থেকে এলো! নদী কই? আমি আনন্দে ছুটলুম।

তখন কি জানতুম, ব্রিজের ওপারে কী আছে? ব্রিজের তলায় কী আছে। ভাগ্যে কী আছে?

চকচকে অ্যালুমিনিয়াম রঙের ব্রিজ পড়ে আছে বিশাল এক মজা নদীর ওপর। একফোঁটা জল নেই। শুধু সাদা বালি। শেষ দিনের আলোয় রুপোর দানার মত চক চক করছে। কাকাবাবু ব্রিজের মাঝখানে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন।

কম উঁচু নয়। অনেক নিচে বালির নদী। তাকালেই ভয় করে। নদীর সব জল কে যেন শুষে নিয়েছে। সামনে পেছনে যতদূর তাকানো যায় ধু ধু করছে শুধু বালি।

এ আবার কেমন নদী? জল নেই একফোঁটা?

জল নেই কী রে, সব জল ভেতরে চলে গেছে। এ নদীর নাম ফল্গু নদী। নাম শুনেছিস? তাকিয়ে দেখ। যেখানটা খুঁড়বি সেখান থেকেই পরিষ্কার জল বেরোবে। কাচের মত টলটলে।

কাকাবাবুর হাতে পাঁচ শেলের এক বিরাট টর্চ। সেই টর্চ বাড়িয়ে দেখাতে লাগলেন, ওই জায়গায় জায়গায় গর্ত খোঁড়ার চিহ্ন রয়েছে। দেহাতিরা এসে জল নিয়ে গেছে। দেখেছিস?

দেখেছিস বলার সঙ্গে সঙ্গে, অসাবধানে তাঁর হাত ফসকে টর্চটা নিচে পড়ে গেল। এত উঁচুতে আছি, টর্চটা পড়তে কত সময় লাগল ঘড়ি ধরে দেখা থাকলে অঙ্ক কষে উচ্চতা বলা যেত। জিনিসটা নরম বালিতে পড়ে দেবে গেল।

যাঃ পড়ে গেল, বলে কাকাবাবু আমার দিকে তাকালেন, কী হবে? ফেরার সময় যে অন্ধকার হয়ে যাবে।

কী করে ফেললেন?

ইচ্ছে করে। বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ পরীক্ষা করে একটা সূত্র বের করার জন্যে পিসার টাওয়ার থেকে নানা ওজনের জিনিস নিচে ফেলতেন। ঘড়ি ধরে

দেখতেন কত সময় লাগল। বড় হলে পড়বি, ল অফ গ্র্যাভিটি। নিউটন সায়েবের নাম শুনেছিস, যিনি সেই গাছ থেকে আপেল পড়া দেখেছিলেন।

হ্যাঁ শুনেছি।

আজ আমি সেই নিউটন। সেদিন ছিল আপেল। আজ হল টর্চ। এইবার ফেলবো তোমাকে? টাক-ডুমাডুম-ডুম।

কাকাবাবু ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিউটন হয়ে নাচতে লাগলেন। কাকাবাবু সব পারেন। হঠাৎ হঠাৎ দুম করে এমন সব কাজ করেন, ভাবলে ভয় হয়। তারপর সামাল দিতে জীবন বেরিয়ে যায়। এইতো এখানে বেড়াতে আসার সপ্তাহখানেক আগে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে এক কাণ্ড করে এলেন। ঝাঁকড়া একটা রঙ্গনগাছে থলের মত বিরাট একটা কী ঝুলছে। তার ওপর একগাদা মাছির মত পোকা বিজ বিজ করছে। কাকাবাবু বললেন, এটা কি জানিস?

দেখে মনে হয়েছিল, মৌচাক। বললুম মৌচাক।

বলেছিস ঠিক। মৌচাকে খোঁচা মারলে কী হয় জানিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উড়ে এসে কামড়ে দেয়।

মৌমাছির কামড় কোনদিন খেয়েছিস?

না।

আম খেয়েছো, জাম খেয়েছো, মৌমাছির কামড় খাওনি খোকা। একটু খেয়ে দেখো।

খেয়ে দেখো, বলেই মৌচাকে মারলেন এক খোঁচা। তারপর কী হলো, আমি বলতে পারবো না। অন্যের মুখে যেমন শুনেছি। যেভাবে শুনেছি সেই ভাবেই বলি। ঘণ্টাখানেক পরে, আমরা দু-জনে আমাদের বাড়ির উঠানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ভিজে বেড়ালের মত চেহারা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা গায়ে ঝুলছে ঝাঁঝি আর পানা। মা জিজ্ঞেস করছেন, একী চেহারা? কী করে এমন হলো? এই তো দু-জনে বেশ সেজেগুজে বাগান দেখতে বেরোলে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হল না। উত্তর দিলেন উদ্ধারকারী গ্রামের মানুষেরা। তাঁরা বললেন—দেখলুম মা, এই ছেলেকাটা এই বড়বাবুটা মাঠ ভেঙে পাঁই পাঁই করে ছুটছে। পেছনে আকাশ কালো করে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। আমরা মা বলতে লাগলুম, পানা পুকুরে ডুবে পড়ো, নইলে মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।

কাকাবাবুকে কেউ না চেনে তো আমি চিনি হাড়ে হাড়ে। কখন কী

করে বসবেন কেউ জানে না। আমি পায়ে পায়ে ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেইদিকেই সরতে লাগলুম। আজ নিউটন হয়েছেন। সেদিন প্যাসকেল হয়ে আমাকে জলে ডোবাতে চেয়েছিলেন। জলের ঊর্ধ্ব-চাপের পরীক্ষা হচ্ছিল! আমার পায়ে পায়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা কাকাবাবুর নজর এড়ায়নি। পালাচ্ছিস কোথায়, বলে খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন।

পালাতে চাইলেও কী পালাবার উপায় আছে! আর পালিয়ে যাবই বা কোথায়! নিচে ধু ধু বালির নদী। চারপাশে গভীর জঙ্গল। কালো পিচের রাস্তা ক্রমশই উঁচু হয়ে হয়ে আকাশের দিকে চলে গেছে। এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি, একটিও মানুষ চোখে পড়ল না। এমন নির্জন জায়গা পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

পালাবার তালে আছিস? কোথায় পালাবি? একা একা যেতে পারবি?

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, আমাকে ফেলে দেবেন না কাকাবাবু। মারা যাবো।

হ্যাঁ, মারা যাওয়া অত সোজা! ধপাস করে নরম বালির ওপর গিয়ে পড়বি, দেখবি কেমন আরাম লাগবে!

না, প্লিজ না।

প্লিজ-ফ্লিজ জানি না। এক্সপেরিমেন্ট ইজ্ এক্সপেরিমেন্ট! টর্চটাকে তো তুলতে হবে, পয়সার জিনিস।

ফেললেন কেন?

তুলবো বলে।

তুলে আনুন।

আমি কেন তুলবো? তোলাতুলির কাজ ছোটদের।

আমি আবার উঠে আসব কী করে?

সে আমি জানি না। আমার কাজ ফেলা। তোমার কাজ ওঠা।

বাঃ, তার মানে টর্চ আর আমি দু-জনেই একসঙ্গে যাই। টর্চও গেল. আমিও গেলুম।

আমি দড়ি ঝুলিয়ে দোব, তুই ধরে ধরে উঠে আসবি।

দড়ি পাবেন কোথায়?

সে আমি কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে নিয়ে আসবো।

অত বড় দড়ি পাবেন?

সে দুশ্চিন্তা আমার. তোমাকে সে-জন্যে ভাবতে হবে না। দড়ি আর কথা, যত খুশি ততই লম্বা করা যায়। লম্বা দড়ি, লম্বা বাত।

কাকাবাবু নিচের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন, আরে! তাজ্জব কী বাত। টর্চটা তো আর নেই। তাহলে, তাহলে কি...?

তাহলে কী কাকাবাবু?

যা সন্দেহ করেছিলুম।

চোর?

আজ্ঞে চোর নয়, চোরাবালি। ইস্! আমার তো আবার সব বদবিটকেলে খেয়াল, তোকে যদি দুম্ সত্যি সত্যিই ফেলে দিতুম, তাহলে কী সর্বনাশ হতো বলতো? তুই ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতিস।

চোরাবালি আবার কী জিনিস? আমি তো শুনেছি, চোরা না শোনে ধর্মেরবাণী।

চোরাবালি বড় সাংঘাতিক জিনিস। পরীক্ষা করে দেখতে চাস্?

না বাবা। দেখতে গিয়ে মরি আর কি?

তুই মরবি কেন? আমি মরে তোকে দেখিয়ে যাবো। পড়িসনি বিজ্ঞানী নিজের ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে জীবন দান করেছেন! এভারেস্টে উঠতে গিয়ে কত দুঃসাহসী আর ফিরে আসেননি। জীবন বড়, না আবিষ্কার বড়! সত্য বড়, না ভয় বড়! দেখ তাহলে!

কথা শেষ করেই কাকাবাবু ব্রিজের রেলিঙের ওপর ঝাঁ-করে উঠে পড়লেন। সরু রেলিঙে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছেন না। লগবগ, লগবগ করছেন। যে-কোনও মুহূর্তে নিচে পড়ে যাবেন। পড়া মানেই চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া।

আমি আতঙ্কে চিৎকার শুরু করলুম, ও কাকাবাবু লাফাবেন না, ও কাকাবাবু লাফাবেন না।

কে কার কথা শোনে! হাত দুটো পেছন দিকে ঝুলিয়ে বিশাল এক লাফ মারার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, আর কোনও উপায় না দেখে আমি তারস্বরে ‘বাবা, বাবা’ বলে কাঁদতে শুরু করলুম।

কান্নায় কাজ হল। কাকাবাবু সামনে লাফ না মেরে পেছনে লাফ মারলেন। শরীরটাকে সোজা করে আমার দিকে ঘুরে বললেন, ভীরু, কাপুরুষ! তোর দ্বারা কিস্সু হবে না।

বাঃ, আপনি লাফ মেরে মরে যাবেন, আর আমি একটু কাঁদব না?

আগে দেখবি তো, আমি সত্যিই মরছি কী না। সেই ইংরেজি কথাটা বুঝি ভুলে গেছিস, ভীরুরা প্রকৃত মরার আগে হাজার বার মরে?

পোলের ওদিক থেকে বিরাট আকারের একটা কুকুর গদাইলস্কর চালে আসছে। চোখ সেদিকে চলে গেল। ইয়া হাঁড়ির মত গোব্দা মুখ। বেড়ালের মত লম্বা লম্বা গোঁফ। কুকুরের গোঁফ হয়! ঠিক মনে পড়ছে না। এসব প্রশ্নের উত্তর কাকাবাবুই দিতে পারেন। তাঁর অনেক জ্ঞান। আমি তো বোকা।

কাকাবাবু, কুকুরের গোঁফ হয়?

সেই স্বাস্থ্যবান কুকুরটা তখন হেলতে-দুলতে আমাদের সামনে এসে গেছে। হাঁটছে দ্যাখো, যেন চেঞ্জারবাবু বেড়াতে বেরিয়েছে। গায়ের রঙটাও কী সুন্দর। এমন কুকুর আমাদের দেশে দেখিনি। ভাল খাওয়া আর জলবায়ু পেলে কী না হয়!

কাকাবাবু বললেন, এটা ব্যাটাছেলে কুকুর, তাই গোঁফ বেরিয়েছে। জায়গাটা কিরকম দেখেছিস, একটা সাধারণ কুকুর, তারও স্বাস্থ্য দেখ্।

কুকুরটা একবার থমকে দাঁড়াল। ভ্যাঁচ করে একবার হাঁচল। তারপর যে পথে যাচ্ছিল, সেই পথেই চলল হেলে-দুলে। আমরা চলেছি এদিকে, ও চলেছে ওদিকে।

কাকাবাবু বললেন, ব্যাটা খুব খেয়েছে। নড়তে পারছে না। নাও আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাদের কম করে আরও অন্তত মাইল-পাঁচেক হাঁটতে হবে। তা না হলে দূর করে দেবে।

কে দূর করে দেবে?

ওরে বাবা, জানিস না বুঝি? চেঞ্জারদের ওপর স্থানীয় লোকের খুব নজর। না হাঁটলে, ভাল হজম হবে না, হজম না হলে খাওয়া কমে যাবে, খাওয়া কম হলে বিক্রি কমে যাবে, ব্যবসা মরে যাবে, মোটা না হলে জায়গার নাম কমে যাবে। সব এক সুতোয় বাঁধা। নে, নে, আর দেরি নয়, জোরে জোরে হাঁট।

পোলটা বেশ বড়। আমরা প্রায় শেষে এসে গেছি। রাস্তা সোজা চলে গেছে, দূরে একটা পাহাড়ের দিকে। দু-পাশে বাবলা গাছ। পেছনে কারা যেন ছুটে আসছে! একপাল গরু, ল্যাজ তুলে ছুটে আসছে! এখুনি আমাদের গুঁতিয়ে ফেলে দেবে। একপাশে সরে দাঁড়ালুম।

এত গরু একসঙ্গে ছুটে আসছে কেন?

দ্যাখো, দ্যাখো, দেখে শেখ। এদেশে গরুরাও চুপ করে বসে থাকে না, বিকেলে দল বেঁধে ছুটতে বেরিয়েছে। মানুষের দুটো কাজ, বুঝলে, এক দেখে শেখা, আর এক ঠেকে শেখা। চল্ আমরাও দৌড়ই।

গরুর পালের পেছনে, লাঠি উঁচিয়ে এক রাখাল আসছে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে। গরুতে-মানুষে রেস হচ্ছে যেন।

কাকাবাবু হেঁকে উৎসাহ দিলেন, বহুত আচ্ছা জি, বহুত আচ্ছা।

রাখাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আচ্ছা নেহী জি, শের নিকালা, ইধারসেই উধার গিয়া। দেখা নেহী? কথা কটা বলতে বলতেই রাখাল বহুদূরে চলে গেল।

শের কী জিনিস কাকাবাবু? ওজন? এক সের, দু-সের!

তোমার মুণ্ডু! শের মানে, বাঘ। ওরে...

কাকাবাবু কথা শেষ না করেই ছুটতে শুরু করলেন। আমিও ছুটছি। ছুটতে আমি ভালই পারি।

ছুটতে ছুটতে কাকাবাবু বললেন, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কুকুরের গোঁফ হয় না। ওটা কুকুর নয়, কেঁদো একটা বাঘ। উরে বাবারে! খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। ছোট্ ছোট্। চাচা, আপনা প্রাণ বাঁচা!

কাকাবাবু ছুটছেন লম্বা লম্বা পা ফেলে। তাঁর সঙ্গে আমি পারবো কেন? তবে আমারও খুব স্পিড এসে গেছে। ছুটতে ছুটতে আমার একবার মনে হল অলিম্পিকে দৌড়োবার সময় পেছনে যদি একটা বাঘ লেলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি ভারতের জন্যে একটা স্বর্ণপদক আনতে পারি।

মানুষ বিপদে পড়লে কেউ কারুর নয়। কাকাবাবু একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না। শুধু ছুটেই যাচ্ছেন। এমন সময় দূরে সেই বাঘটা বারকয়েক ডেকে উঠল। কী বিশ্রী হেঁড়ে ডাক। আকাশ-বাতাস যেন ফেঁড়ে ফেলছে। দুটো কান চুলবুল করে উঠল। সেই ডাকে গাছে গাছে পাখির ঝাঁক কিচির-মিচির করে আরও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। কী বোকা রে বাবা! তোরা তো আছিস গাছে! বাঘ কী গাছে উঠবে? বাঘ কী বেড়াল, যে পাখি ধরে খাবে!

পোল শেষ হয়ে গেল। কাকাবাবু আমার থেকে প্রায় বিশ বাইশ গজ এগিয়ে গেছেন। ভয়ে ভয়ে, কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, 'আমাকে ফেলে পালাবেন না কাকাবাবু।'

কাকাবাবু যে বেগে দৌড়চ্ছিলেন সামনের দিকে ঠিক সেই বেগে পেছন দিকে দৌড়ে এসে ছোঁ-মেরে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। এখন আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ঘোড়ায় চেপেছি। সেই ছড়াটা মনে পড়ছে, টাট্টু ঘোড়া খুব ছুটেছে। ঠাকুরদাদার চুল পেকেছে। ডামাডোলের দিন পড়েছে। ঢাকের পিঠে পালক নাচে। সাহসও খুব বেড়ে গেছে। এত উঁচুতে যখন আছি, বাঘে আমার আর কী করবে! ধরলে কাকাবাবুকেই ধরবে!

এতটা দৌড়ে আমার জিভ বেরিয়ে গেছে। কাকাবাবুও বেশ হাঁপাচ্ছেন।

টং থেকে বললুম, আর দৌড়ে কী হবে। এবার তো থামলে হয়।

কথা শেষ হতে না হতেই সামনের দিক থেকে চার-পাঁচজন আমাদের দিকে তীরবেগে দৌড়ে এলো। একজনের হাতে আবার লণ্ঠন। ছোটার তালে তালে দুলছে।

কাকাবাবু থেমে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যা হুয়া ভাই?

তারা দূর থেকে বললে, শুনা নেহি, শের নিকালা?

যা বাব্বা, শের তো পিছে নিকালা।

নেহি জী চক্কর মারকে সামনা আ গিয়া।

তব্ তো মাটি কর দিয়া রে বাবা!

আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম কাকাবাবু আবার সেদিকেই ছুটতে লাগলেন। পোলের ঢাল বেয়ে উঠতে এবার জীবন বেরোচ্ছে।

কিছুটা ছুটেই দেখা গেল একটি দেহাতি লোক বেশ আপনমনে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে আরমসে চলেছে। বাঘ-টাঘ তার কাছে যেন কিছুই নয়। পিঠে একটা পুঁটলি দুলছে চলার তালে তালে।

কাকাবাবু তার কাছে এসে বললেন, শুনা, শের নিকালা।

লোকটি গম্ভীর গলা বললে, নিকালা তো কেয়া হুয়া!

তোমকো খা লেগা।

লোকটি ভীষণ রেগে বললে, তোম নেহি আপ বোলো জি।

আপকো খা লেগা।

খানে দেও।

লোকটি উদাস গলায় খানে দো, বলে যে চালে হাঁটছিল সেই চালেই হাঁটতে লাগল। আবার গান ধরেছে, রাম নাম সুখদায়ী।

কথা বলার জন্যে কাকাবাবু একটু থেমেছিলেন। লোকটি গান ধরতেই আবার ছুটতে শুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে বললেন, যাও বা বাঁচার আশা ছিল, গান ধরে সব মাটি করে দিলে। বাঘ এবার নিশানা ঠিক করে এই দিকেই তেড়ে আসবে।

পোল আবার ফুরিয়ে গেল। পোলের বেশ মজা। একেবারে সমান মাপ। এ-পাশেও যতটাও-পাশেও ততটা। ধনুকের মত পড়ে আছে, বালিতে দু-পাশ ঢুকিয়ে। আমরা এখন বাড়িমুখো। অন্ধকার হয়ে এলেও, আকাশের নিচের দিকটা লালচে হয়ে আছে। গাছের মাথা-টাথাগুলো বেশ কালো দেখালেও নরম

একটা আলো বেরিয়ে এসেছে। বেশ গা ছমছমে সন্ধে। চারপাশ নির্জন। ধু ধু মাঠ। ঝোপ-ঝাপ, পাথরের চাঁই। আকাশের গায়ে নীলচে রঙের যেসব পাহাড় লেগেছিল, সেগুলো একেবারে জমাট অন্ধকারের স্তূপের মত দেখাচ্ছে। বাবলাগাছের কাঁটা ছুঁয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বাতাস আসছে সিন্ সিন্ শব্দে।

পোল থেকে নেমে কাকাবাবু সবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছেন, নে এবার কাঁধ থেকে নাম! অমনি সামনের দিকে যারা গিয়েছিল, দেখা গেল তারা আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া হুয়া জি? ফির কেয়া হুয়া?

শের নিকালরে বাপ, শের নিকালা।

কাকাবাবু রেগে গিয়ে বললেন, মারে গা এক ঝাপ্পড়। রসিকতা পা গিয়া। একবার বোলতা হায় উধার, আর একবার বোলতা হায় ইধার। মামার বাড়ি পা গিয়া?

কাকাবাবুর কথা কে শুনবে! তারা তখন কোথায় চলে গেছে। পেছনে শোনা গেল লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ। আর সেই গান। রাম নাম সুখদায়ী।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী করি বল তো? সারা রাতই কী এই পোলের এধার থেকে ওধার, আর ওধার থেকে এধার ছোটাছুটি করে বেড়াতে হবে? তাহলে আর বাঁচবো না রে! তার ওপর তুই চেপে আছিস কাঁধে। ওজন তো কম নয় তোর!

আমাকে এবার নামিয়ে দিন কাকাবাবু। এবার আমার লজ্জা করছে।

যাক তোরও তাহলে লজ্জা আছে?

কাকাবাবু ধীরে ধীরে আমাকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। পায়ে যেন কোনও জোর নেই। এখন বাঘ এলে আর দৌড়তে পারব না। কী আর করব, বাঘের পায়ে ধরব। সেই পথিক লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে আপনমনে আমাদের পাশ দিয়ে চলেছে। কাকাবাবু কিছু ভেবে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া করে গা জি?

লোকটি উদাস গলায় বললে, আরাম করো, আরাম করো, রামজিকা নাম করো।

কাকাবাবু আমাকে বললেন, লোকটার সাহস দেখেছিস? ভগবানের নামের জোর দেখ!

চলুন আমরাও রাম-নাম নিতে নিতে পেছন পেছন যাই। আমরা যাবার জন্যে পা বাড়াতেই লোকটি গম্ভীর গলায় বললে, ঠারিয়ে!

কাকাবাবু বললেন, কেন?

কল্কেতে কী একটা ভরতে ভরতে লোকটি যা বলল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, তোমরা যদি দু'জন ওদিকে যাও, তাহলে বিপদ হতে পারে! একটু অপেক্ষা কর! আমি ধূমপান করে নি! বাঘটার খিদে পেয়েছে, তাই অমন ঘোরাঘুরি করছে! বাঘটাকে আমি চিনি!. খুব ভাল ছেলে! মানুষ ও খায় না। একটা গরু বা মোষ পেলেই ও পাহাড়ের দিকে চলে যাবে!

কথা শেষ করে লোকটি কল্কেতে টান লাগাল! আগুন ঝিলিমিলি করছে! আর একটু জোরে টান মারার সঙ্গে সঙ্গে ব্লপ করে আগন জ্বলে উঠল! আগুনের গোল একটা বল ঠিকরে আকাশের দিকে উঠে গেল! এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি!

কাকাবাবু ভয়ে চমকে উঠে বললেন, বাপ্! এ যে ভৌতিক কাণ্ড!

পথিক পাঁচবার গাঁজায় দম দিলেন। পাঁচটা আগুনের গোলা আকাশের দিকে উঠে গেল। সন্ধ্যা শেষে রাত নেমে গেছে চারপাশে। সব কিছুই কেমন যেন ভৌতিক হয়েছে। ঝোপঝাড়, বড় গাছ, ছোট গাছ, টিলা, পাহাড়। সব কিছুই যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ওঁত পেতে বসে আছে। পথের পাশ থেকে মাঝে মাছে একটা দুটো আলগা পাথর ছড়্ ছড়্ শব্দ করে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শব্দে আমরা চমকে উঠছি। ভাবছি বাঘ বুঝি এসে গেল।

পথিক কল্কে ঠুকে গাঁজার আগুন পথের পাশে ফেলে দিলেন। বাতাসে আগুনের ফুলঝুরি খেলে গেল। পথিক তার ঝোলাটি আমাদের সামনে ফাঁক করে ধরে বললে, সব এর মধ্যে ফেলে দাও।

কাকাবাবু বললেন, কী ফেলবো?

তোমাদের অহংকার, হিংসা, পাপচিন্তা, মনের মধ্যে যা যা ময়লা আছে, সব, সব ফেলে দাও এর মধ্যে।

আমার মনে কিছু হিংসে ছিল, রাগ ছিল, লোভ ছিল, মনে মনে সব বিসর্জন দিলুম পথিকের তালিমারা ঝুলিতে। কাকাবাবু কী ফেললেন জানি না। তবে কিছু একটা ফেললেন।

পথিক ঝোলা মুড়ে বললে, আর শের তোমাদের কিছু করতে পারবে না। শুধু শের কেন কেউ কিছু করতে পারবে না। নাও, এবার আমার সঙ্গে চলো।

আমরা তিনজনে উঠে দাঁড়ালুম। দূর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় জল হবে না কি? আজ কার মুখ দেখে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম কে জানে! আমি আয়নায় আমার মুখই দেখেছিলুম। চলতে চলতে পথিক জিজ্ঞেস করল, কী, এখন শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছে না?

হ্যাঁ, বেশ হাল্কা লাগছে। কাকাবাবু বললেন।

আমি অবশ্য তেমন কিছু বুঝছি না। কাকাবাবু সাধু-সন্তে, তুকতাকে ভীষণ বিশ্বাস রাখেন। জ্যোতিষচর্চা করেন। মাঝে মাঝে প্রেতচক্র বসান। গভীর রাতে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বলেন, অনেকরকম অলৌকিক জিনিস দেখা যায়। গাছেরা নাকি ফিসফিস করে কথা বলে। জড়পদার্থেরা হেঁটে-চলে বেড়ায়।

পথিক পিঠে ঝোলা নিয়ে সামনে নুয়ে পড়ে টুকটুক করে হেঁটে চলেছে। আমরা চলেছি পাশে পাশে। কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে পাতলা অন্ধকার। বাতাসের সন সন শব্দ। বাঘের গর্জন থেমে গেছে। হয়তো শিকার পেয়েছে। সামনে ঝাঁকড়া মত বিশাল একটা গাছ। তলায় তলায় আলকাতরার মত আঁধার। ধক্ ধক্ করে দুটো আলো জ্বলছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কি রে বাবা?

পথিক বললে, ডরো মাৎ! এই সেই শের।

মট্ করে একটা শব্দ হল। কাকাবাবু বললেন, হাড় ভাঙার শব্দ। কী করব আমরা এগোব? কাকাবাবুরও গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। আমার পা-দুটো অবশ হয়ে আসছে।

পথিক জ্বলজ্বলে চোখ দুটো লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, তোমরা আমার পেছন দিয়ে আস্তে আস্তে গাছতলাটা পেরিয়ে চলে যাও আমি আসছি।

পথিক বাঘের খুব কাছে গিয়ে বললে, ক্যা মস্তান শিকার মিল গিয়া?

বাঘ উত্তরে একটা চাপা গর্জন ছাড়ল। দুবার ল্যাজ আছড়াল পটাপট্ শব্দে। আমরা যতটা সম্ভব দ্রুত গাছতলাটা পেরিয়ে গেলুম। আর একবার হাড় ভাঙার শব্দ হল। পথিক লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে এল। কিছুই যেন হয়নি। যেন বড় একটা বেড়াল আদর করে এল। গুন্‌গুন্ করে সেই একই গান ঠোঁটে লেগে আছে।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর আমরা লোকালয়ে এসে পড়লুম। কিছু কিছু দোকানপাট রয়েছে। মিঠাইওয়ালা লাড্ডু পাকাচ্ছে। গরম কচুরি ভাজার গন্ধ আসছে নাকে। থাক থাক পেঁড়া সাজানো রয়েছে। বড় কড়ায় দুধ ফুটছে। পথিককে দেখে সেই বাজার মত জায়গাটার সমস্ত মানুষ একবাক্যে হই হই করে উঠল, আইয়ে মহারাজ আইয়ে।

পথিক শুধু উদাত্ত গলায় বললে, জয় রামজি কি জয়, জয় রাম।

আমরা এত হেঁটেছি যে পা যেন আর চলছে না। মিঠাইওয়ালার দোকানের

বাঁশের বেঞ্চিতে কাকাবাবু আর আমি থেসকে বসে পড়লুম। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি। স্থানীয় লোকেরা পথিককে ছেঁকে ধরল। মহারাজের কী খাতির। কাঁচা শালপাতায় লাড্ডু আর প্যাঁড়া এসে গেল। খাঁটি ঘিয়ে কচুরি ভাজা হচ্ছে। কী তার গন্ধক বাঘের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে এখন পেটে চন-চনে খিদে। ভেবেছিলুম, আমরা হয়তো বাদ পড়ে যাব। না, এরা ভদ্রতা জানে। আমাদের জন্যেও খাবার এসে গেল।

মহারাজের কাছে নানা লোকের নানা বায়না। কাবুর বোখার হয়েছে, কারুর পেটে দরদ। কারুর বাত। মহারাজ সকলকেই ওষুধ দিচ্ছেন। ওষুধ আর কিছুই নয় প্রসাদ। মুখ থেকে বের করে দিচ্ছেন কাউকে এক টুকরো প্যাঁড়া, কাউকে লাড্ডু। মুখে ফেলামাত্রই অসুখ সেরে যাচ্ছে। মহারাজের জয়ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক কেঁপে উঠছে। মিঠাইওয়ালা বেশ বড় তিন ভাঁড় দুধ পাঠিয়ে দিলেন মোটা সর ভাসছে। কাকাবাবু ভীষণ খেতে ভালবাসেন। মুখ দেখে মনে হল ভীষণ খুশি হয়েছেন। চুমুকে চুমুকে দুধটা মেরে দিয়ে, তিনিও জয়ধ্বনি দিলেন, জয় মহারাজের জয়।

কাকাবাবু বললেন, তুই সোজা বাড়ি চলে যা। আমি একটু সাধুসঙ্গ করে যাই। মহারাজের কাছে অনেক জিনিস। একটু সেবা করে দেখি। যদি কিছু পাওয়া যায়।

এই অন্ধকারে আমি একলা যাবো কী করে?

কী যে বলিস! এই তো একটু মাত্র পথ। সোজা গান গাইতে গাইতে চলে যা। ভয় কি? পুরুষ মানুষের আবার ভয় কী?

শোনা গেল, মহারাজ আজ এখানেই রাত কাটাবেন। আর একটু পরেই দূর ওই গ্রামে রামলীলা হবে। মহারাজ সেই লীলা দেখবেন। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দলে দলে হ্যাজাক লাইট চলেছে। কালো কালো ছায়া চলেছে সার বেঁধে. মেয়েপুরুষের দল। আকাশ ফুঁড়ে একটা বাজি উঠল। ফট্‌ করে ফেটে তারার ফুল ঝরতে লাগল। চারপাশ আলোয় আলো।

মিঠাইওয়ালার দোকানের পাশ থেকে অন্ধকারে কে যেন ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। প্রথমে ভেবেছিলাম সাপ। বাঘের হাত থেকে বেঁচে এইবার নাগের হাতে মৃত্যু। মিঠাইওয়ালা বললে, মহারাজ আমার বহু কাঁদছে।

মহারাজ বললেন, আও বেটি ইধার আও।

মহিলা মহারাজের পায়ের কাছে এসে বসলেন। মাসখানেক হল একমাত্র শিশুটি মারা গেছে। তাই ভীষণ দুঃখু। মহারাজ তার মাথায় হাত রাখতেই ফুলে ফুলে কান্না থেমে গেল। মহারাজ মৃদুস্বরে বললেন, জয় রামজি কী জয়!

মহারাজ ঝোলার মধ্যে হাত চালিয়ে একটা পাকা পেয়ারা বের করে মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, যাও বেটি ঘরে যাও। এই ফল খেলে তোমার সব দুঃখ চলে যাবে। তুমি আনন্দ পাবে।

মহিলা ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কাকাবাবু সাধুজিকে বললেন, মহারাজ, আমি আপনার চেলা হতে চাই।

মহারাজ অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হ্যাজাকের আলো এসে পড়েছে মুখের একপাশে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে আগুনের টুকরোর মত। এতক্ষণ মানুষটিকে আমরা সাধারণ পথিক ভেবেছিলুম, এখন মনে হচ্ছে ভীষণ শক্তি আছে ভেতরে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে, আমিও একবার চেপে ধরি। সামনে পরীক্ষা। একটু শক্তি পেলে হয় তো ফার্স্ট হয়ে যাব। সকলের তাক লেগে যাবে। অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো। ইংরিজিতে মিনিমাম সত্তর। বাঙলায় আশি।

পাহাড়ের দিকে বিদ্যুৎ ঝিলিকের সঙ্গে সঙ্গে বাজ-পড়ার বিশাল শব্দে বনস্থলী কেঁপে উঠল। হঠাৎ পাগলা হাতির মত আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে গাছপালা মড়মড়িয়ে বাতাস ছুটে এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। ধুলো উড়ছে। বন্দুকের ছর্‌রার মত কাঁকর, বালি গা ঘষে চলেছে। মিঠাইওয়ালার দোকানের তেরপল ভটাস করে উড়ে চলে গেল জাদু-কার্পেটের মত। সবাই ছুটছে আশ্রয়ের জন্যে এদিকে-ওদিকে।

সেই পথিক মহারাজ নিশ্চল। কোনও চঞ্চলতা নেই। আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে মহারাজ বললেন, ডরো মাত। সব ঠিক হো যায়গা।

মহারাজের একটা হাত কাকাবাবুর কাঁধে। তিনি বসে রইলেন। অলৌকিক কি না জানি না, আমাদের চারপাশে বৃষ্টি হয়ে চলেছে অঝোরে, আমরা তিনজনে গোলাকার একটা শুকনো জায়গায় বেমালুম বসে আছি যেন অদৃশ্য একটি ছাদ আমাদের মাথার ওপর রয়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, বাজ অট্টহাসি হাসছে পাহাড়ের মাথায়।

কাকাবাবু পরের দিন সকালে ইঁদারার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন। এই শীতে পরনে শুধু একটা গামছা। খালি গা। ফরসা শরীরে বিজকুড়ি বিজকুড়ি শীতকাঁটা। আমার পরনে প্যান্ট, শোয়েটার, মোজা, জুতো। গলায় সাতপাট মাফলার। মাথায় হনুমান টুপি। এত কিছুর দরকার ছিল না। ঠাণ্ডা লাগবে, ঠাণ্ডা লাগবে বলে মা পরিয়ে দিয়েছেন। কাকাবাবুর আজ এ অবস্থা কেন?

আপনার শীত করছে না?

দাঁত থেকে দাঁতন সরিয়ে বললেন, না।

কেন শীত করছে না?

সে অনেক ব্যাপার।

তার মানে?

তোর মনে আছে কালকের সেই সাধুর ঝুলি?

খুব মনে আছে।

কাল সেই ঝুলির মধ্যে কী কী ফেলেছি জানিস?

না।

শীত ফেলেছি, গ্রীষ্ম ফেলেছি, দুধ খাবার লোভ ফেলেছি। ভাল ভাল জামা কাপড় পরার ইচ্ছে, সব ফেলে দিয়েছি।

হঠাৎ হঠাৎ যা খুশি তাই করার ইচ্ছে, সেই ইচ্ছেটা ফেলেছেন?

যাকে তোর মা বলে পাগলামি?

ওই আর কি।

না রে সেটা ফেলতে ভুলে গেছি। ওটা ফেলে দিলে বাঁচব কী নিয়ে?

ফেললে ভালো হত। আমি তাহলে বেঁচে যেতুম।

তোকে মারবে কে রে গাধা? তুই দেড়শো বছর বাঁচবি।

মানুষ দেড়শো বছর বাঁচে নাকি? একমাত্র কচ্ছপ বাঁচে তিনশো বছর।

তুই কিস্যু জানিস না। গজকচ্ছপ বাঁচে দেড়শো বছর।

গজকচ্ছপ কী জিনিস?

ঠিক তোর মত দেখতে, তোর মত স্বভাব, ভীতু শীতকাতুরে, একেবারে অবিকল তোর মত।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে ইঁদারার কাছ থেকে সরে এলুম। সাধুর ঝুলিতে আরও অনেক কিছু ফেলার ছিল। বেলা দশটার সময় কিছু না খেয়ে, ধুতি আর শার্ট পরে কাকাবাবু হন হন করে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিছু খাবে-টাবে না? দুধ, মোহনভোগ?

মৃদু হেসে কাকাবাবু বলেছিলেন, আমার আর খাওয়ার প্রয়োজন নেই বউদি। চিরকালের মত আমার পেট ভরে গেছে।

মা হেসেছিলেন, দেখা যাবে বেলা একটা দেড়টার সময়। যখন বেড়িয়ে ফিরে আসবে।

একটা বাজল, দুটো বাজল, তিনটে বাজল, কাকাবাবুর আর দেখা নেই। আমার ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। ঘর-বার করছি। মা একবার বাইরে আসছেন, একবার ভেতরে যাচ্ছেন। অত সব রান্না, কারুরই খাওয়া হয়নি। বিদেশ বিভুঁই

জায়গা। কারই বা সাহায্য পাওয়া যাবে? মা গালে হাত দিয়ে গেটের পাশে রকে বসলেন। বেলা ক্রমশই পড়ে আসছে। শীত আসছে চেপে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে পারে বল তো?

মনে হয় সেই সাধুর আস্তানায়।

কোথায় সেই আস্তানা?

তাতো জানি না মা।

কাল সেই সাধুকে তোরা কোথায় পেয়েছিলিস?

ওই দূর গ্রামে। একটা মিঠাইয়ের দোকানে।

চল তাহলে একবার যাই।

সে তো মা অনেক দূরে।

তা হোক। তুই টর্চটা নে। ঘরে বসে ভেবে ভেবে মরার চেয়ে বাইরে খুঁজে আসাই ভাল।

দরজায় তালা মেরে মা আর আমি বেরলুম। আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে সেই সুখিয়াও সঙ্গে চলল। কাকাবাবু ফিরছেন না দেখে তার ভীষণ মন খারাপ হয়েছে। মাঝে মাঝেই আঁচলে চোখ মুছছে।

মা হাঁটতে হাঁটতে একসময় রাগ করে বললেন, এইসব মানুষের সঙ্গে কেউ বিদেশে আসে, তোর বাবার যে কি কাণ্ড! রোজই চিঠি দিচ্ছে, আজ আসছি আর কাল আসছি। আমাকে এরা সব পাগল করে ছাড়বে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমরা সেই মিঠাইওয়ালার দোকানে এসে পৌঁছলুম। আজও পুরি ভাজা হচ্ছে। বড় বড় লাড্ডু সাজানো দোকানে। অমৃতি তাকিয়ে আছে স্নেহের চোখে। ভীষণ খিদে। আজ আর কে খাওয়াবে। কাকাবাবুও নেই। সাধুবাবাও নেই।

মাকে দেখে মিঠাইওয়ালা দোকান থেকে নেমে এল। কেয়া হুয়া মাঈজি।

মা সব বললেন। মিঠাইওয়ালার দোকানে কাকাবাবু সকালে একবার এসেছিলেন। সাধুবাবার খবর নিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছেন।

পাহাড়? সে কত দূর?

ওই যে মা, আকাশের গায়ে আঁকা। এখান থেকে চার-পাঁচ ক্রোশ তো হবেই।

আমরা অন্ধকারে আকাশের গায়ে লেগে থাকা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আজ আর যাওয়া যাবে না।

ভোরের ট্রেনে বাবা এলেন। সব শুনে বললেন, বিকাশ তাহলে সত্যিই সাধু হয়ে গেল। এর আগেও একবার সাধু হয়ে গিয়েছিল।

সাধু হয়ে গেল, কি বাঘের পেটে গেল, জানলে কী করে?

মান্দার হিলে বাঘ। হাসালে তোমরা।

পরশু বাঘ বেরিয়েছিল। আর সেই বাঘই হল কাল।

চা, জলখাবার খেয়ে বাবা আমাকে নিয়ে পুলিশ চৌকিতে চললেন। দারোগাবাবু সব শুনে বললেন—মিস্টার, যে সাধু হয়ে গেছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি কী করে! আমরা যে চোরই ধরি। সাধুকে কি ধরা যায়! তবু একটা ছবি দিয়ে যাবেন। তালাস করে দেখবো।

মহাসমস্যা। কাকাবাবুর কোনও ছবি নেই।

মা বললেন, আর্টিস্টকে বলে আঁকিয়ে দাও। বলো এইরকম নাক, এইরকম চোখ। মানুষের চোখ আর নাকই তো আসল।

বাবা বললেন, চেহারা তো আমার চোখে ভাসছে। আমিই তো এঁকে দিতে পারি।

সাতদিন মান্দারহিলে কাটিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম। কাকাবাবুর কোনও খোঁজ নেই। কোথায়ই বা সেই সাধুবাবা। সব তোলপাড় হয়ে গেল তবু কাকাবাবুর কোনও সন্ধান নেই। এক মাস গেল, দুমাস গেল। এক বছর গেল, দুবছর গেল। কাকাবাবুর হাতঘড়ি দেরাজের ওপর টিকটিক করে। মা এখনও দুপুরে পা ছড়িয়ে বসে চোখের জল ফেলেন। অনেকে তীর্থ থেকে ফিরে এসে বলেন, একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল, ঠিক বিকাশের মত দেখতে। অমনি আমরা ছুটি সেই তীর্থে। বেড়ানো হয় কিন্তু কাকাবাবুকে ধরা যায় না।

কত বড় হয়ে গেলুম। কাকাবাবুর পাঞ্জাবি এখন আমার গায়ে ঠিক হতে পারে। কাকাবাবু বলেছিলেন, সাহসী হবি, পরোপকারী হবি। মনটাকে জলের মত পরিষ্কার রাখবি। আমার সাহস অনেক বেড়েছে। অন্যের উপকার করার চেষ্টা করি। আর মন! সেই সাধুর ঝোলার মধ্যে মনের সব নোংরা জিনিস তো ফেলেই দিয়েছি।

রোজ রাতে এখনও আমি স্বপ্ন দেখি। প্রতিদিন দেখি। বালির নদী পড়ে আছে নিচে। সেই বালিতে পড়ে আছে ঝকঝকে একটা রুপোর টর্চ। আর সোনার তৈরি একটা পোল কোথায় যেন চলে গেছে। নীল একটা পাহাড়ের কোলে। পোলের মাঝখানে পা ছড়িয়ে বসে আছে বিশাল একটা বাঘ। আর বাঘটার কিছু দূরে স্থির হয়ে বসে আছেন সেই সাধুবাবা আর আমার কাকাবাবু।

ছাঁৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মাঝরাত। আর ঘুমোতে পারি না। জেগে শুয়ে থাকি। আর তখনই জানতে পারি আমি একা নই, মা আর বাবা দু'জনেই জেগে। আর জেগে আছে সেই পোল। বালির ওপর শুয়ে আছে পোল। মাথার কাছে বসে আছে পাহাড়! সেই পাহাড়ের মাথায় জ্বলছে হোমের আগুন। আকাশ টক-টকে লাল।

নিজের ঢাক নিজে পেটালে

বড়মামা বললেন, 'এবার আমি নিজের ঢাক নিজেই পেটাব।'

মেজমামা চায়ের কাপে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'সে আবার কী?'

মাসিমা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তার মানে লণ্ডভণ্ড আবার একটা কিছু করে ছাড়বে। ইলেকশানে দাঁড়াতে চাইছ নাকি বড়দা?'

'ইলেকশান? ও ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে কি ধর্মগুরু হবে?'

'সে শক্তি নেই। ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে ঢাকটা পেটাবে কী করে? কী ভাবে?

'আমি নিজেই আমার জন্মদিন করব। তোরা তো কেউ কিছু করলি না।'

মেজমামা বললেন, 'জন্মদিন! বুড়ো বয়েসে জন্মদিন? লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'সারা গ্রামের মানুষকে আমি পেটপুরে খাওয়াব। সারাদিন সানাই বাজবে। ফুল, ফুলের মালা। এলাহি ব্যাপার করে ছেড়ে দোব। দেখি লোকে কেমন পাগল বলে! সেদিন সারাদিন আমি ফ্রিতে চিকিৎসা করব। একটাও পয়সা নোব না। ফ্রি ওষুধ।'

মেজমামা বললেন, 'মরবে, একেবারে হাড়-মাস আলাদা করে রেখে যাবে। তোমার জয়ঢাকের মতো পেট ফাঁসিয়ে দেবে।'

'দেখা যাক।'

মাসিমা বললেন, 'কে রাঁধবে? কে পরিবেশন করবে?'

'তোকে কিছু করতে হবে না। কলকাতা থেকে সাতজন হালুইকর আসবে। আমার বিশজন চ্যালা পরিবেশন করবে।'

' এ করে কী লাভ হবে। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে রুগীমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর

কউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে াওয়ানো মানে ভূতভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে াছি।'

বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মেজমামাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে রলেন। 'তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষ্মণ।'

মাসিমা বললেন, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!'

বড়মামা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কিন্তু মেজো, কী ভাবে ওদের নমন্তন্ন করা হবে! মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে! একটা গোরু, একটা ছাগলে তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কীভাবে হবে?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

মাসিমা বললেন, 'কবে হবে? তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

বড়মামা বললেন, 'সে আমি জানি। কোনও ভাল কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাসিমা উঠে চলে গেলেন। মেজমামা বললেন, 'তোমার জন্মদিন কবে?'

'সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো। আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা ছকে ফেলি। জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মেজো, নেমন্তন্ন মানেই তো ভাল-মন্দ খাওয়া। মানুষের খাওয়ার মেনু আমরা জানি। পশুর ভাল খাওয়া কী হবে? মেনুটা কী হবে?'

মেজমামা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'পাখির ভালমন্দ খাবার হল, ফল, মেওয়া। গোরুর হল, ভাল বিচিলি, আখের গুড়, ছোলা, সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা! কুকুরের হল মাংস।'

বড়মামা বললেন, 'দুধ, বিস্কুট।'

'মেনুটা আমরা পরে ঠিক করে ফেলব বড়দা।'

মেজমামা উঠে চলে গেলেন। কলেজে আজ আবার সকালেই ক্লাস। বড়মামা আমার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ড্রয়ার খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কোষ্ঠী বের করলেন।

'বুঝলি, জন্মতারিখটা খুঁজে বের করতে হবে। তুই কোষ্ঠী দেখতে জানিস?'

'আমি? আমি তো ওসব জানি না বড়মামা!'

'কী জানিস তুই? নে, এটাকে খোল। ধর।'

কোষ্ঠী খুলছে। খুলতে খুলতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেলুম। কত বড় কোষ্ঠী রে বাবা!

'বড়মামা, ঘর যে শেষ হয়ে গেল! দেয়ালে ঠেকে গেছি। আর যে যাবার জায়গা নেই! একে কী কোষ্ঠী বলে বড়মামা?'

'একে বলে গাছ-কোষ্ঠী। গাছের ডালে বসে ন্যাজের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখতে হয়। ভাটপাড়ার তর্কপঞ্চাননের তৈরি রে ব্যাটা! এতে সব আছে। নে, মাথার দিকটা মেঝেতে পেতে বইচাপা দিয়ে এদিকে চলে আয়।'

চাপা দিয়ে চলে এলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এস ঢুকল বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি। বড়মামা সাবধান করলেন, 'লাকি, কোষ্ঠী নিয়ে ইয়ারকি কোরো না। চুপ করে একপাশে বোসো।'

লাকি ফোঁস ফোঁস করে কোষ্ঠী শুঁকে চেয়ারে গিয়ে বসল জিভ বের করে।

বড়মামা বললেন, 'নে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিক থেকে দেখতে দেখতে নিচের দিকে নেমে আয়। দেখবি এক জায়গায় লেখা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য, প্রথম পুত্র জাতবান। ওই জায়গায় লেখা থাকবে মাস, দিন, সাল. তারিখ, সময়।

'এ খুব কঠিন্ কাজ যে বড়মামা! আপনার মনে নেই কবে, কোন্ দিন, কোন্ সালে জন্মেছেন?'

'ধুস, নিজের জন্মদিন মনে থাকে? নে নে, হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে আয়। কষ্ট কী রে? হামা দিতেও কষ্ট! ছেলেবেলায় কত হামা দিয়েছিস!'

পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামছি। সব কি আর পড়ছি, না পড়া যাচ্ছে? কত রকমের নকশা আঁকা। ছবি আঁকা। ছক কাটা। মানুষের ভাগ্য যে কী ভীষণ জটিল! নামতে নামতে পেটে নেমে এলুম। কোথায় সেই জাতবান! সব আছে, ওইটাই নেই।

'বড়মামা, তর্কপঞ্চাননমশাই ওটা লিখতে ভুলে গেছেন।'

'সে কী রে! আমি কি রামচন্দ্র! না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল!'

'লিখতে মনে হয় ভুলে গেছেন!'

'তাহলে এটা কার কোষ্ঠী! ভাল করে দ্যাখ রে গবেট। জন্মতারিখ, দিন, সময় ছাড়া কোষ্ঠী হয় না।'

'আপনি একবার দেখুন, আমার চোখে পড়ছে না।'

'এদিকে আয়, ন্যাজটা চেপে ধর। চেপে না ধরলে গুটিয়ে যাবে।'

বড়মামা হামা দিয়ে কোষ্ঠী পড়ছেন, ঘরে এলেন কবি করুণাকিরণ। বড়মামার

চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। বড় বড় কবিতা লেখেন। মাথায় বড় বড় কাঁচাপাকা চুল। ইদানীং বড়মামার কাছে প্রায়ই আসেন। শরীরে হাজারটা ব্যামো। কখনও পেট ভুটভাট। কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে বয়স্ক বলে বড়মামা খুব খাতির করেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ। আজ আবার কী রোগ নিয়ে এলেন কে জানে! এখুনি জানা যাবে।

কবি করুণাকিরণ বললেন, 'কী হে ডাক্তার, আবার নতুন করে হামা দেওয়া শিখছ না কি? দ্বিতীয় শৈশব এরই মধ্যে ফিরে এল?'

'আজ্ঞে না, নিজের জন্মতারিখ খুঁজছি।'

'ওটা কোষ্ঠী বুঝি? বাঃ, বেশ পেল্লায় ব্যাপার তো! খুঁজে পেলে?'

'আজ্ঞে না।'

'সরো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

আমরা তিনজনেই মেঝেতে হামাগুড়ি দেবার অবস্থায়। কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়মামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শুভদিনে জন্মেছ হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে তরতর, তরতর করে ওপর দিকে উঠে যাবে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল কেন? ডাক্তার, একবার প্রেশারটা চেক করো তো!'

মেজমামা আজকাল রাতে খই-দুধ ছাড়া অন্য কিছু খান না। ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাতে গুরুভোজন করলে তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে যায়। বেশি রাত অবধি লেখাপড়া করা যায় না। দুধে খই ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'তোমার জন্মদিন তাহলে পয়লা আষাঢ়!'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ। এসে গেল। প্ল্যানটা ভেবেছিস কী ভাবে কী হবে?'

'ক'দিন ধরেই খুব ভাবছি, বুঝলে? পাখি আর কুকুরের জন্যে চিন্তা নেই। জানো তো, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'তুই কাককে পাখির মধ্যে ফেলছিস?'

'ও মা, সে কী! কাক পাখি নয়! দুটো ডানা, উড়তে পারে। পাখি ছাড়া আবার কী?'

'ডাক আর স্বভাব দুটোই ভারী বিশ্রী।'

'তুমি রূপ দেখো না দাদা, গুণটাও দ্যাখো। ইংরিজিতে বলে নেচারস্

স্ক্যাভেঞ্জার । তাছাড়া পায়রা আছে, চড়াই আছে। আমাদের ঠাকুরদালানেই শ-খানেকের বেশি পায়রা আছে। একমুঠো দানা ছড়ালেই সব ফরফর করে নেমে আসবে।'

'আরে দুর, সে তো সব গোলা পায়রা!'

'গোলা পায়রা, পায়রা নয়! তুমি যে কি বলো দাদা! তোমার জন্যে জাপান থেকে ন্যাজঝোলা পায়রা কে আনবে দাদা! পাখি বলতে তুমি কী বোঝো?'

'ধর, টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। মানে সব জাতের পাখি, যারা গান গাইতে পারে।'

'দ্যাখো দাদা, অমন দুই দুই কোরো না। সব পাখিই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওই দিন একঝাঁক ছাতারে যদি ধরতে পারি, সভা একেবারে জমে যাবে।'

'প্লিজ মেজো, ছাতারে আমদানি করিসনি। ভীষণ ঝগড়াটে পাখি। চিল্লে বাজার মাত করে দেবে।'

'আরে, ভোজসভা একটু সরগরম না হলে মানায়! বিয়েবাড়িতে দ্যাখোনি যত না খাওয়া হয় তার চেয়ে বেশি হয় চিৎকার।'

মাসিমা তাড়া লাগালেন, 'তোমরা দয়া করে টেবিল ছেড়ে উঠবে? রাত ক'টা হল খেয়াল আছে?'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুই সব সময় অমন অসহযোগিতা করিস কেন কুসি? তোর সামান্য একটু সহানুভূতি পেলে, আমরা দু'ভাই পৃথিবী জয় করতে পারি।'

'থাক, তোমাদের আর পৃথিবী জয় করে কাজ নেই। সব মাথায় তুলে এখন জন্মদিন হচ্ছে। তাও কী রকম জন্মদিন, না পশুভোজন। লোকে শুনলে তোমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে দিয়ে আসবে।'

মেজমামা বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ো বড়দা। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুসিটার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই। একেবারেই স্টিরিও।'

দুই মামা ছাদে এসে ঢাউস দুটো বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। মাথার ওপর এক-আকাশ তারা। কোণের দিকে একফালি চাঁদ ঝুলছে। মনে হচ্ছে, কে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মাঝেমাঝে বাতাস বইছে। দুরে, বহুদুরে একপাল কুকুর চিৎকার করছে।

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, শুনছ। এই গ্রামে ওইরকম কয়েক পাল কুকুর আছে।'

'তুই ওদের নেমন্তন্ন করবি নাকি?'

'নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি কুকুর পাবে কোথায়?'

'ওরা তো লেড়ি রে?'

'তোমার বড়দা বড় জাতিভেদ। বর্ণবৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।'

'ওদের স্বভাব তুই জানিস না. মেজো, ম্যানেজ করতে পারবি না। শেষে পুলিশ ডাকতে হবে।'

'হ্যাঃ, পুলিশ ডাকতে হবে! কী যে তুমি বলো বড়দা। স্রেফ ইট মেরে ভাগিয়ে দোব।'

'গোরু আর ছাগলের জন্যে তা হলে কী করবি?'

'নিমন্ত্রণপত্র ছাড়ব। বয়ানটা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি। ভাগনে!'

'বলুন মেজমামা?'

'লেখ তো।'

কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই মেজমামা বলতে শুরু করলেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপলক্ষে আয়োজিত পশুভোজসভায়, স-শাবক আপনার গৃহপালিত গোরু/ছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্যে ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে জনসেবার সুযোগ দান করুন।

ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

নির্ঘণ্ট ঃ প্রাতে সানাই সহযোগে উৎসবের সূচনা। স্নান, পূজাপাঠ, হোম! অনুষ্ঠান-মণ্ডপের উদ্বোধন, মাঙ্গলিক সংগীত। পক্ষী-উৎসব। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পক্ষিভোজন করাবেন। ক্ষণ বিরতি। দ্বিপ্রহরে গো ও ছাগ উৎসব। সাড়ম্বরে গোরু ও ছাগলদের সুখাদ্য বিতরণ করা হবে। রাতে কুকুরসেবা। স্বস্তিবাচন। উৎসবের পরিসমাপ্তি।

নিমন্ত্রণপত্র লেখা শেষ হল। বড়মামা গদগদ স্বরে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! তোর মাথাটা মেজো বেশ ভালই খেলে। সাধে তুই নামকরা অধ্যাপক!'

'নাও, এখন শুয়ে পড়ো। বড় বড় হাই উঠছে। কাল সকালে ভোলাবাবুকে

প্রেসে দিয়ে আসতে বোলো, আর বেশি সময় নেই। শ-দুয়েক কপি ছাপালেই হবে।'

মেজমামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

শ্যামল হাজরার খড়ের গোলা। সন্ধে হয়ে এসেছে। হাজরামশাই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে, গদির ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে ঝিমোচ্ছেন। সামনে লাল ক্যাশ বাক্স। মেজমামা আর আমি দোকানে ঢুকতেই, হাজরামশাই ভদ্র হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আসুন, আসুন, মেজবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।'

হাজরামশাই কাশতে লাগলেন। একঢোক ধুনোর ধোঁয়া গিলে ফেলেছেন।

মেজমামা গদির ওপর ঝুলে বসলেন। চোখ জ্বালা করছে। মেজমামা বললেন, 'আপনার কাছে একটা খবরের জন্যে এলুম।'

হাজরামশাই কাশি সামলে বললেন, 'কী খবর মেজবাবু?'

'আচ্ছা, আপনার গোলা থেকে যাঁরা খড় নেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা সব আমায় দিতে পারেন?'

হাজরামশাই সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কেন বলুন তো? আমায় ভাতে মারতে চান?'

'ভাতে মারতে চাইব কেন?' মেজমামা আশ্চর্য হলেন।

'বলা যায় না, হয়তো পাশাপাশি আর একটা গোলা খুলে বসলেন!'

'পাগল হয়েছেন? প্রোফেসারি ছেড়ে গোলা খুলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'বলা যায় না মেজবাবু। ছেলে-চরানো, আর গোরু-চরানো প্রায় এক জিনিস। শেষে হয়তো ভাবলেন বিদ্যের বদলে খড় দেওয়াই ভাল। অনেক সহজ কাজ!'

মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা যা বলেছেন! ব্যবসা করতে জানলে তাই করতুম। না, সে কারণে নয়। আমি জানতে চাইছি অন্য কারণে।'

মেজমামা সব ভেঙে বললেন। বড়মামার অভিনব জন্মদিন পালনের কথা। গোরুদের সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করতে হলে গোরুর মালিকের নাম-ঠিকানা জানা দরকার। সব শুনে হাজরামশাই হাঁ হয়ে গেলেন।

'মেজবাবু, আপনি রসিকতা করছেন না তো! এ-রকম কথা কেউ কখনও শোনেনি।'

'আমার দাদা পশুভক্ত। সারাজীবন গোরু, ভেড়া, ছাগলেরই সেবা করে

গেল। সাত-সাতটা কুকুর। সেই ভালবাসা পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া আর-কি! বুঝলেন না হাজরামশাই!'

'সবই বুঝলুম, তবে এই দুর্মূল্যের বাজার। মানুষই খেতে পাচ্ছে না।'

'তাহলে বুঝুন, পশুরা কী অবস্থায় আছে? ক'টা গোরু ভালভাবে খেতে পায়? ক'টা ছাগল খাবার পর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে! ক'টা ছাড়া কুকুরের খাবার স্থিরতা থাকে? পশু বলে কি তারা মানুষ নয়!'

হাজরামশাই হাসলেন। হাসতে হাসতে মোটা একটা খাতা খুললেন, 'নিন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে নিন। চা খাবেন মেজবাবু?'

'তা একটু হলে মন্দ হয় না।'

হাজরামশাই কর্মচারীকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলেন। নাম-ঠিকানা লেখা চলতে লাগল। অনেকেরই গোরু আছে। মেজমামার খুব আনন্দ। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'গোরুতেই মাত করে দেবে। কুকুরের আর দরকার হবে না। বাড়িটা বৃন্দাবন হয়ে যাবে। দাদা আমার রাখালরাজা হয়ে গো-সেবা করবে।'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পাগলামির দিনটা তাহলে কবে ঠিক হল?'

বড়মামা আর মেজমামা দুজনেই বসেছিলেন। একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগলামি মানে? জীবসেবা মানে শিবসেবা। পড়িসনি?'

'পড়েছি দাদা। তবে এখন পড়েছি পাগলের হাতে। দিনটা কবে সেইটা শুধু বলে দাও। তার দু'দিন আগে আমি পালাব।'

'পালাবি মানে! বাড়িতে এতবড় একটা কাজ। শুধু কাজ নয়, সামথিং নিউ। তুই পালালে আমরা যাব কোথায়? তুই আমাদের অনুপ্রেরণা।'

'আমার ভূমিকা?'

'দর্শক। তুই হবি দর্শক। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে। এমন তো হয়নি কখনও। তাদের একটু আদর-আপ্যায়ন করবি। 'পশুপ্রেমী বড়দা' বলে আমরা একটা পুস্তিকা ছাপাচ্ছি। সেইটা জনে জনে বিতরণ করবি। মনে রাখবি—এটা সাধারণ বাড়ি নয়। তপোবন। আশ্রম।'

মাসিমা মুচকি হেসে চলে গেলেন। বড়মামা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমাদের পাগল বলে গেল!'

'আরে এ-পাগল সে-পাগল নয়। এ হল আদরের পাগল। প্রেমিক পাগল। যে-কোনও ভাল কাজ, অভিনব কাজের সূত্রপাতে লোকে পাগলই বলে।

তোমার সেই ব্যাঙ-নাচানো সায়েবের গল্প মনে পড়ে? পাগলামি থেকে এল বিদ্যুৎ। পাগলামি থেকে এল বসন্তের টিকে। নাও, এসো, চিঠিগুলো খামে ভরে ফেলা যাক। আজই নিমন্ত্রণে বেরোতে হবে। বেশি সময় নেই।'

'তুই কি সত্যিই 'পশুপ্রেমী বড়দা' ছাপাবি?'

'ছাপাবি কী? ছাপতে চলে গেছে।'

'কী লিখলি, আমাকে একবার দেখালি না ভাই।'

'ছেপে আসুক। পড়লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। শুরুটা আমার লাইন-দুয়েক মনে আছে—পশু না হলে পশুকে ভালবাসা যায় না। আমাদের পশুপ্রেমী বড়দা আশৈশব পশুপক্ষীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে এখন পশু-ভ্রাতা কি পশু-পিতার স্তরে চলে গেছেন।'

'এইসব লিখলি? লোকে আমাকে ভুল বুঝবে না তো!'

'কেন, ভুল বুঝবে কেন?'

'ওইসব লিখে আমাকেই তো পশু বানিয়ে দিলি।'

'মানুষের আর কোনও গৌরব নেই দাদা। এখন পশু হওয়াই গৌরবের। গোরু তবু দুধ দেয়। পাখি তবু গান গায়! কুকুর তবু পাহারা দেয়। তোমার মানুষ কী করে দাদা? শুধু বদমাইশি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' বড়মামা খামে চিঠি ভরতে লাগলেন আপনমনে।

সন্ধেবেলা আমি আর মেজমামা বেরিয়ে পড়লুম, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে। বেশ মজা লাগছে। প্রথম বাড়ি। মেজমামা ডাকলেন, 'হরিদা আছেন, হরিদা?'

হৃষ্টপুষ্ট, কালো চেহারার হরিদা বেরিয়ে এলেন। দেখলেই মনে হয় ডেলি সের দুয়েক দুধ খান। খাবেন না কেন? বাড়িতে তিন-তিনটে গোরু। হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কুচো-কুচো খড় লেগে আছে। মেজমামাকে দেখেই বললেন, 'আরেব্বাবা, কী সৌভাগ্য! মেজবাবু যে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ করতে এলুম। আগামী পয়লা আষাঢ় দাদার শুভ জন্মদিন।'

'বাঃ বাঃ, ডাক্তারবাবুর জন্মদিন! নিশ্চয় যাব। সপরিবারে, সবান্ধবে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ আপনাকে নয়, আপনার তিনটি গোরুকে।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরবেলা আপনার গোরু তিনটিকে বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। বলেন তো গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামত ওদেরও বলে যাই।'

'মানুষের ভাষা যে ওরা বুঝবে না মেজবাবু!'

'আপনি তাহলে ওদের বলে দেবেন। চিঠির তলায় অবশ্য লেখাই আছে, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়। আপনি তাহলে ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে যাবেন, কেমন?'

'আমার গোরু তিনটে মেজবাবু ভিন্-জাতের। একটু ভাল খায়।'

'কী খায় হরিদা?'

'পাঁচ কেজি ছোলা এক-একজন..।'

'পেট ছেড়ে দেবে।'

'আজ্ঞে না, ওইটাই ওদের খোরাকি, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি আর খড়ের কুচো, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক ডজন ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'অাঁ বলেন কী? মরে যাবে যে।'

'আপনি আপনার পেটের মাপে দেখছেন মেজবাবু। গোরুর পেট তো পেট নয়, জালা। বিদেশি গোরু মেজবাবু, খোরাকটি ঠিক রাখলে তবেই না দুধ ছাড়বে! এবেলা-ওবেলা যোল-সতের কেজি।'

'এই সাংঘাতিক খোরাক ম্যানেজ করেন কী করে?'

'দুধ বেচে মেজবাবু।'

'আচ্ছা চলি তাহলে—' বলে মেজমামা আমার হাতে টান মারলেন। উৎসাহ যেন মরে এসেছে। শ্যামল সাঁপুই বাড়ির রকে বসে কড়রমড়র করে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছিল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামল, তোমার ক'টা গোরু!'

'সে তো একবার আমি বলে দিয়েছি, আবার কেন?'

'কাকে বলেছ?'

'কেন, ওই যে সরকারের লোক এসেছিল, কী বললে—সেনসাস না কী হচ্ছে। পশুগণনা।'

'আমি গণনা করতে আসিনি। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দাদার জন্মদিনে তোমার গোরুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

শ্যামল সাঁপুই হেসেই অস্থির। ভাবলে আমরা পাগলা হয়ে গেছি। 'এক-আধটা গোরু! আমার সাত-সাতটা গোরু। সবকটাকে নিয়ে যাব? দুটো বাছুরও আছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সপরিবারে, সবান্ধবে যাবে।'

রাত দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা ডিসপেনসারি

বন্ধ করে ছোট ছাদে বসে বাতাস সেবন করছিলেন। আর গুনগুন করে গান গাইছিলেন—'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা—'

মেজমামা ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে বুকপকেট থেকে নোটখাতা বের করে, বিড়বিড় করে যোগ করতে শুরু করলেন, একশো তিন। বুঝলে বড়দা।'

'আমি যে তোর সঙ্গে যাব...অ্যাঁ, কী বললি?'

'হান্ড্রেড থ্রি-দিশি, বিলিতি মিলিয়ে। ধরে নাও শ-খানেক গোরু আসবে। ইয়া-ইয়া সব চেহারা। খোরাক শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।'

'ভালই তো, ভালই তো। পেটপুরে সব খাওয়াব।'

'খোরাক শুনবে? পারহেড পাঁচ কেজি ছোলা, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি, ছোলার চুনি, কুচো বিচিলি, ভেলি গুড়—আখের গুড় হলেই ভাল হয়। বারোশো ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'হ্যাঃ, কোথা থেকে শুনে এলি, এসব চালিয়াতির কথা! মানুষই দু'বেলা খেতে পায় না, গোরু খাবে ছোলা, ভিটামিন ট্যাবলেট! এরপর বলবি, ছাগলে রাবড়ি খাচ্ছে।'

'যাদের গোরু তারা বলছে। আমি গোরুর কী জানি বল? একজন বললে, আমার গোরু আধ মাঠ কচি দুব্বো খায়, তা না হলে কনস্টিপেশান হয়।'

'ওসব চালের কথা, রাজনীতি করছে রে মেজ। আমাদের জব্দ করতে চায়। যে যাই বলুক, আমরা আমাদের মেনু অনুসারে খাওয়াব।'

'তা হয় না বড়দা। মানুষ হলে হত। লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পাঁপরভাজা। পশুদের এক-এক শ্রেণীর এক-এক প্রকার খাদ্য। যার যা খাবার তাকে তো তা দিতে হবে। কুকুরকে আলোচাল দিলে খাবে? ছাগলকে তার নিজের মাংস দিলে ছোঁবে? অশান্তি হয়ে যাবে বড়দা।'

'তা হলে তাই হবে। ছোলা কত লাগবে?'

'ধরো, ছশো কেজি। ছশো কেজি খোল, ভুসি, ছোলার চুনি, একশো কেজি ভেলি। বাইশটা বড় ছাগল আর বিয়াল্লিশটা ছানা আসবে। কুকুর আসবে ষাট-সত্তর, বিলিতি আরও দশ-বারোটা। ছটা তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ান। বাকি ছটা স্পিৎস। দু'দল, না তিনদল। তিনদলের তিন রকম ব্যবস্থা। স্পিৎস খাবে কিমা। অ্যালসেশিয়ান খাবে খাবা-খাবা মাংস, লেড়ি খাবে হাড়গোড়, ছাঁটছুট। ছাগলের জন্যে চাই পুরো একটা কাঁঠালগাছ আর বটগাছ।'

বড়মামা বেশ যেন নার্ভাস হয়ে গেছেন, 'মেজ, খরচের কথা বাদ দে। সে যা হবার হবে। কিন্তু জায়গা লাগবে বিশাল।'

'ম্যানেজ করার জন্যে লোকও লাগবে। শ-খানেক কাঠের ডাবর চাই, গোরুর জন্যে।'

'আচ্ছা মেজ, আজকাল তো সব খাওয়াবার ভার ক্যাটারারকে দিয়ে দেয়?'

'সে মানুষ হলে হত! পশুদের জন্যে ক্যাটারার নেই, সাপ্লায়ার আছে।'

'কাল ভেটেরিনারি হসপিট্যালের ডাঃ সাহানাকে একবার ফোন করব। দেখি উনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

সাড়ে এগারোটার সময় সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা সকালের চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে বলেন, 'ডিফিট, গ্রেট ডিফিট।'

মেজমামা এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, 'আমি সারারাত ভেবে দেখলুম, ব্যাপারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো হয়ে যাবে। সামলানো যাবে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। বিশাল জায়গা চাই, বহু লোকজন চাই। আইডিয়াটা ভাল ছিল। কাজে লাগানো গেল না, এই যা দুঃখ।'

মাসিমা বললেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেচে। ক'দিন ধরে ভগবানকে আমি কম ডেকেছি! যাই, পুজোটা দিয়ে আসি, মানত করেছিলুম।'

মেজমামা বললেন, 'ঝট করে আর-একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে ফেলি। আপনার গৃহপালিত পশু নয়, সপরিবারে আপনারই নিমন্ত্রণ। ভাগ্নে?'

'আজ্ঞে।'

'ঝট করে দু'লাইন লিখে নাও।

সবিনয় নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ়, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ভবদীয়।'

বড়মামা খুঁতখুঁত করে বললেন, 'অ্যাঃ, ব্যাপারটা গেঁজে গেল রে মেজো।'

আজ পয়লা আষাঢ়।

ভোর পাঁচটা থেকে সানাই শুরু হয়েছে। ভোরের সুর বাজছে। বাইরের বিশাল মণ্ডপ ফুলে-ফুলময়। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ একেবারে ঝলমলে রোদ। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন। পুজোপাঠ, হোম-অর্চনা

শুরু হল বলে। বড়মামার স্নান হয়ে গেছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে উত্তরীয়। রূপ একেবারে খুলে গেছে। কাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে। সকলেই দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

মাসিমা পুজোর আয়োজন করছেন। ভোরবেলাতেই বাজার এসে গেছে। বড় বড় মাছ শুয়ে আছে রকের একপাশে। পুঁচকে একটা বেড়াল মাছের আকার দেখে ভয়ে থমকে পড়েছে, দেয়ালের একপাশে।

হালুইকর ব্রাহ্মণ হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরি, লটবহর নিয়ে এসে গেছেন। অ্যাসিসটেন্টরা উনুনে আগুন দিয়েছেন। বাগানের দিকের আকাশে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ইলেকট্রিকের লোক এসে টুনি ঝোলাতে শুরু করেছে। তিনজন ঝাড়ুদার খচরমচর করে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছে চারপাশে। আজ সব ছবির মতো হয়ে যাবে।

বেলার দিকে ফুলের তোড়া আসতে শুরু করল। হাসপাতাল থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। বড়মামার হাসি-হাসি মুখ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চন্দনের টিপ। দুপুরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাবেন। ছোট্ট একবাটি ঘি খাবেন চুক করে চুমুক দিয়ে। সানাই মাঝে-মাঝে থামছে, মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে। রান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে সুবাস ছড়াচ্ছে।

সন্ধে হতে-না-হতেই পুটুস-পুটুস করে আলোর মালা জ্বলে উঠল চারপাশে। তেমনি গুমোট গরম নেই। ভিজে-ভিজে বাতাস বইছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার সুবাস। একে একে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে প্যান্ডেল কানায় কানায় ভরে গেল। বড়মামা, মেজমামা অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। 'আসুন, আসুন, নমস্কার, নমস্কার' এই চলছে সন্ধে থেকে। কারুর হাতে চা, কারুর হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। আমি বিতরণ করে চলছি। 'পশুপ্রেমী বড়দা।' জাফরানি রঙের মলাট। গোটা গোটা অক্ষর। কেউ পড়ছেন। কেউ মুড়ে রাখছেন।

টেবিলে টেবিলে পাতা পড়ে গেল। পাশ দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খাবার ছুটছে। রাধাবল্লভী, ফিশফ্রাই। বিরিয়ানি গন্ধে পাগল করে দিচ্ছে। বড়মামা আর মেজমামা হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, 'এবার আপনারা অনুগ্রহ করে আহারে বসুন।'

সভা একেবারে পূর্ণ। কবি করুণাকিরণ মাঝের একটা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শুরুর আগে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই, "আজি তব জন্মদিনে, হে রাখাল/বাঁশি তব বাজে/জীবনের জয়গানে/থেমে থেমে/সেতার

তুমি/তোমারে চুমি/শতবর্ষ পার করে/হেসে হেসে/তুমি যবে যাবে র্গলোকে/অশ্রুজলে সিক্ত হবে/রিক্ত ধরণী।”

ফটাফট, ফটাফট হাততালি।

হঠাৎ কোণের দিকে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বাজখাঁই গলায় লন, ‘ওয়াক আউট। আপনারা সকলে প্রতিবাদে এখুনি এই সভা পরিত্যাগ ন।’

কেন? কেন?’ সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন।

কেন? আপনারা এই পুস্তিকাটা একবার পাতা উলটে দেখেছেন?’

কী আছে, কী আছে?’

এই যত কিছু আয়োজন, সবই আমাদের অপমানের কৌশল। এক জায়গায় া করে পাইকারি দরে জুতো মারার বড়লোকি চাল।’

কেন? কেন?’

একটা অংশ পড়ে শোনালেই বুঝতে পারবেন আপনারা। পড়ছি, শুনুন।

শিবজ্ঞানে, জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে না। গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি, এদের নিয়ে জীবন াতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদি আমরা খছি, এমন পশুপ্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের, অভিনব আয়োজন এই ভোজসভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল-পাল র সেবা করছে। আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।

অপমান, অপমান!’ সভা চিৎকার করে উঠল। মেজমামা চেঁচাচ্ছেন, ‘ছি ছি, বুঝবেন না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।’

বড়মামা বলছেন, ‘এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান তে পারি। লেখাটা ভুল হাতে পড়েছে।’

কে কার কথা শোনে! সব লণ্ডভণ্ড করে নিমন্ত্রিতরা বেরিয়ে গেলেন। সানাই নও বাজছে করুণ সুরে। রাধাবল্লভীর মহাশ্মশানে দুই মামা হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

ফানুস

সেবার কালীপূজায় আমি আর পিন্টু ঠিক করলুম, ঠিক সূর্যাস্তের সময় আমা
বাড়ির দোতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে রঙ-বেরঙের বিশাল একটা ফানুস ছে
সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো। পিন্টুর বাবাকে আমরা কাকাবাবু বলতা
কাকাবাবু সব জানতেন। তিনি কেমিস্ট ছিলেন। বাড়িতে একটা ছোট লেবরেটারি
ছিল। ছুটির দিন মাঝে মাঝে মন-মেজাজ ভাল থাকলে আমাদের ডেকে ডে
নানা কেরামতি দেখাতেন। আগের বছর আমাদের একটা হাউইয়ের ফর্মু
দিয়েছিলেন। ফর্মুলার কোন দোষ ছিল না। আসলে খোলটা আমরা ঠিক
তৈরি করতে পারিনি। পারলে হাউই আকাশের ব্রহ্মতালু ভেদ করত নিশ্চয়
খোলের দোষে রকেট আকাশে না উঠে বোতলশুদ্ধ ছাদে শুয়ে শুয়েই ফুল
কেটেছিল। কাকাবাবু বলেছিলেন, টেরিফিক ফোর্স হয়েছে হে, তবে সাধা
কাগজের খোল বলে কেতরে পড়েছে। যে কাগজে নোট তৈরি হয়, সে
পার্চমেন্ট কাগজে খোল তৈরি করতে পারলে—দেখতে কাণ্ডটা হতো কী!

ফানুসের খোল নিয়েও প্রথমে একটু সমস্যা হলো। বিশাল একটা খোল চ
এস্কিমোদের ঘরের মতো। ধোঁয়া ঢুকবে সেই খোলে তবেই না তিনি আকা
উঠবেন হেলে-দুলে। এ-সব ব্যাপারে চীনেরা ভারি এক্সপার্ট। তারা ড্রাগন ক
লণ্ঠন করে, হাতি করে। কাগজ দিয়ে তারা কী না করতে পারে! আমা
দৌড় ঠোঙা পর্যন্ত। চীনে গুরু পাই কোথায়, পাড়ায় একটিমাত্র চীনের জুতে
দোকান। হাফা-সায়েব আবার এ-সব জানেন না। তাঁর মা জানতেন, তিনি দু'ব
আগে মারা গেছেন।

ঠোঙা তৈরির বিদ্যে নিয়েই আমি আর পিন্টু বসলুম খোল বানাতে। ঘুি
কাগজ, এক বালতি আঠা আমাদের কাঁচা মাল। তৈরি হবে গোলগাল খো

পিন্টু বললে, মোহনবাবুর চেহারাটা মনে রাখ। মোহনবাবুর পা-দুটো ছেঁ
মাথাটা নিচু করে দিলে যে চেহারাটা হবে, আমাদের খোলটা হবে ঠিক সে
রকম। মোটা মোহনবাবুর জ্যামিতি নিয়ে পিন্টুদের বাড়ির বাইরের ঘরে
মেঝেতে থেবড়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের গবেষণা চলল।

পিন্টু বলল, আসলে আমাদের একটা গোল জালা বানাতে হবে।. গল

টা সরু, মোহনবাবু চিত হয়ে শুয়ে থাকলে তাঁর ভুঁড়িটা যে-রকম দেখায়, রকম দেখতে হবে।

সবই তো বোঝা গেল। হাতের কাছে চার দিস্তে ঘুড়ির কাগজ, কাঁচি, গাও রেডি, কাটাকুটি শুরু করলেই হয়। সাহসের অভাব।

পিন্টুর বললে, এক কাজ করি চল, মানদা মাসির কাছে একবার যাই। ঠোঙা রির কায়দাটা শিখতে পারলেই মোটামুটি যা-হয় কিছু একটা দাঁড়াবে।

মানদা মাসি সারাদিনে হাজার হাজার ছোট-বড় ঠোঙা তৈরি করে সংসার ান। মাঝে মাঝে তাঁর পেয়ারের ছাগল ঠোঙা খেয়ে ফেলে। ছাগলের নাম । যদিও তার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আছে কি না আমাদের সন্দেহ।

আমরা যখন মাসির বাড়ি গেলুম, বুধিকে নিয়ে মাসি তখন ভীষণ ব্যস্ত। বুধি বাটি আঠা সহযোগে একদিস্তে খবরের কাগজ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে চোখ ন্ট পড়ে আছে। ঘটনাটা ঘটিয়েছে দড়ি ছিঁড়ে, মাসি যখন পুকুরে, তখন।

মাসি বুধিকে বলছেন ওঠ, বাবা ওঠ, যোয়ানের আরকটুকু খেয়ে নে মা, ঠিক ম হয়ে যাবে। ও বুধি, বুধি!

ছাগলের চোখ এমনিই কি রকম ড্যাবা ড্যাবা মরা মানুষের মতো, তায় জ খেয়ে মনে হচ্ছে যেন বোল্ড-টাইপে ছাপা শ্রাদ্ধের চিঠি।

মাসির কাছে কাজ আদায় করতে এসেছি, মাসির কাজে সাহায্য করলে া যদি একটু ভেজে।

আমরাও বুধির সেবায় লেগে গেলুম। পিন্টু চোয়াল ধরে হাঁ করাবার চেষ্টা ছে। আমি আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে তোয়াজ করার চেষ্টা করছি। তার চামড়ায় কি আর সুড়সুড়ি লাগে. বুধির চোয়াল ফাঁক করে কার পিতার া! অথচ মাসিকে ছাগল ছাড়া না করলে আমাদের কাজ বন্ধ। বুধি হঠাৎ াক্ করে লাফিয়ে উঠে আমাদের সব কটাকে চার ঠ্যাঙের মোক্ষম লাথি ড়ে, আরকের বাটি উল্টে দিয়ে, মাসির শোবার ঘরে ঢুকে গেল।

মাসি ধুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে আমাদের হাত ধরে তুলতে তুলতে লেন, লাথির জোর দেখলি? তারপর একমুখ হেসে বললেন, আমার দুষ্টু য়। পিন্টুর কপালের কাছটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

মাসি বললেন, তোদের লাগলো নাকি?

আমরা দুজনেই কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, বড্ড লেগেছে মাসি, ফ্যাকচার গেছে।

আহা বাছা রে! কী করতে তোরা এইছিলিস?

তোমার কাছে শিখতে।

হায় কপাল! আমি কী জানি যে তোদের শেখাবো রে! না জানি লেখাপ
না জানি নাচগান। আমি যে তোদের মুখ্যু মাসি রে।

তুমি যা জানো, আমরা জানলে আজ বর্তে যেতুন।

ধুর পাগল। তোদের মাসি একটা অপদার্থ।

ও-সব বোলো না মাসি, আমরা কিন্তু রেগে যাচ্ছি। তুমি আমাদের ফানু
খোল তৈরি করে দেবে। ঘুড়ির কাগজ কিনেছি, আঠা তৈরি করেছি। তুমি ছ
আমাদের কে আছে মাসি!

গ্রামের একপাশে মানদা মাসির একলা আস্তানা, একটা ছোট্ট আটচা
একটা ছাগল, একটা পেয়ারা গাছ, ব্যস্ আর কিছু নেই। ত্রিভুবনে মাসির
আত্মীয়ও নেই। আমরা যেই বলেছি তুমি ছাড়া আমাদের কে আছে মা
মাসির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ওরে আমার সোনা রে—বলে পিন্টু
আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, নিয়ে আয় তোদের কাগজ। তা বাবা, অ
তো ঠোঙা তৈরির ইসপার্ট, আমি কি তোদের ফানুস মানুষ পারবো রে?

খুব পারবে মাসি। দেখতে হবে ঠিক মোহনবাবুর মতো।

পাজি ছেলে! আচ্ছা নিয়ে আয় তোদের কাগজ আর আঠা।

তৈরি হলো ফানুস। মন্দ হলো না। তবে ঠিক গোল না হয়ে একটু লম্ব
হয়ে গেল। বিশাল একটা ঠোঙার মতো।

কাকাবাবু বললেন, থাক গে যা হয়েছে। একটু বেঢপ হলো বটে,
ধোঁয়াটা ধরে রাখা নিয়ে কথা। তা হবে'খন।

খোলা দিকটায় একটা তারের গোল রিং লাগানো হলো। মাঝখানে আড়াআ
দুটো তারে পাটে পাটে জড়ানো হলো কেরোসিন তেলে ভেজানো কাপ
ফালি আর রজন।

পিন্টু বললে, যতটা পুরু করে পারিস জড়া। যত বেশি ধোঁয়া হবে
উঁচুতে উঠবে, উঁচু আরো উঁচু, একেবারে স্বর্গে চলে যাবে রে!

কল্পনা ফানুসের আগেই উড়ছে। লক্ষ্য একেবারে চাঁদে গিয়ে পৌঁছ
জিনিসটা বেজায় ভারী হয়ে গেল।—এত ভারী উড়বে তো রে?

কী যে বলিস! আগেকার দিনে ফানুসে মানুষ উড়তো।

তেলে ভেজানো একটা দশ হাত কাপড় উড়বে না?—পিন্টুর অকাট্য যু
কাকাবাবুও সমর্থন করলেন।

সন্ধে তখন হয় হয়। দীপাবলী, পশ্চিম আকাশ লালে লাল করে
ডুবছে। সমস্ত বাড়ির চাদে ছাদে দিনের আলো নেভার আগেই আলসেতে

মোমবাতি ফিট করার কাজ চলছে। এদিক-সেদিক থেকে ঠুসঠাস কয়েকটা পটকা ফাটার শব্দ হচ্ছে। নগেন একটা উড়োন তুবড়ি টেস্ট করল। প্রথম ফানুস উঠলো কামারপাড়ার দিক থেকে। কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুস হুস করে আকাশে উঠে গেল। নভেম্বরের মাঝামাঝি। দমকা উত্তরের হাওয়ায় মাতালের মতো টলতে টলতে ফানুস নিরুদ্দেশ।

আমাদের দলবল ছাদে উঠেছে। পিন্টুর হাতে লম্ফ, আমার হাতে প্যাকাটি। কাকাবাবু পাশে আছেন, অ্যাডভাইসার। আর আছেন পাঁচুদা, লম্বা মানুষ তিনি. দু'হাতে ফানুসটা মাথার ওপর তুলে ধরে থাকবেন। ধোঁয়া ঢুকে খোলটা ফুলে উঠবে। টান টান করে উড়ে যাবার টান ধরবে, তারপর আপনা থেকেই আকাশের জিনিস আকাশে উড়ে যাবে।

পাঁচুদা লম্বা মানুষ। দু-হাত তুলে ফানুসে ধোঁয়ার টান ধরাচ্ছেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। খোলটাই না পুড়ে যায়! কাকাবাবু বললেন, রজন বড্ড বেশি হয়ে গেছে রে। যাক, দেখা যাক কী হয়! ভগবানকে ডাক।

আশে-পাশের বাড়ির ছাদে কৌতূহলী মুখ। উড়বে ফানুস, উড়ছে ফানুস। রোগা মানুষ পাঁচুদা মোটা ফানুস ওড়াচ্ছেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে কতক্ষণ দাঁড়াবেন! হাত টন টন করছে। তার ওপর আগুনের আঁচ। মুখ-চোখ লাল। ফানুসটা একটু দুলে উঠতেই তিনি তোললাই মেরে ঠেলে দিলেন। প্রথমে বেশ হাত পাঁচেক উঠে, উত্তরের দমকা হাওয়ায় ছাদের সীমানা পেরিয়ে গেল। তারপরই শুরু হলো তার আসল খেল। সামনেই একটা একতলা বাড়ি। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড টলতে টলতে সেই বাড়ি টপকে গেল। তারপরই একটি পোড়ো দোতলা বাড়ি। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা চলছে, কেউই মেরামত করে না। ভাঙ্গা ছাদে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ছিল। শীতের মুখে শুকিয়ে ঝনঝন করছে। ফানুসটার ইচ্ছে সেইখানেই শুয়ে পড়ে।

কাকাবাবু বললেন, সর্বনাশ করেছে! ঘাসে আগুন লেগে গেলে লঙ্কাকাণ্ড হবে যে! তোরা সব উইল ফোর্স প্রয়োগ কর। আমরা চোখ বুজিয়ে, জয় মা কালী, জয় মা কালী—জপতে শুরু করলুম। একটু যেন কাজ হলো। ফানুসটা পাখির মতো বসতে গিয়েও ঝিকি মেরে হাতখানেক উঠে শুকনো ঘাসে আগুনের তাত লাগিয়ে চিলেকোঠা পেরিয়ে গেল। আমরা ভয়ে কাঠ! ফানুসের একি বাঁদরামি, অনেকটা মানুষের মতো ব্যবহার। পোড়ো বাড়িটার পর খেলার মাঠ। মাঠ দেখে যেন ফানুসের খেলতে ইচ্ছে করল। ওপরে না উঠে, একপাশে কেতরে ফানুস নামতে শুরু করল। এরপর আমরা আর কিছু দেখতে পেলুম না, বাড়ির আড়ালে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে তার শয়তানি চলছে।

চারদিক অন্ধকার। সার সার আলো জ্বলে উঠছে বাড়িতে বাড়িতে। ঠুস ঠাস, ধুম ধাম—পটকা ফাটছে। মাইকে মাইকে গানের শোরগোল। পাঁচুদা বলছেন, যাক বাবা, মাঠে গিয়ে পড়েছে তবু রক্ষে! আর ঠিক সেই সময় মাঠের দিকে বাড়ির আড়ালে ধপ করে একটা আগুন লাফিয়ে উঠলো। মাঠের ওপাশে চিৎকার উঠলো—আগুন, আগুন! আমরা ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে বসে রইলুম। পুলিশ-কেস হতে পারে, জেল হতে পারে, ধোলাই হতে পারে। অল্প কিছু সময় পরেই দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল।

রাত দশটা নাগাদ ছাগলের গলার দড়ি ধরে বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে মানদা মাসি আমাদের বাড়িতে এলেন। ফানুস মাঠ পেরিয়ে তাঁর শুকনো খড়ের চালে ল্যান্ড করেছিল। তাঁর জিনিস তাঁরই কাছে ফিরে এসেছিল রাগে আগুন হয়ে।

যে ফানুস উড়লো না, সে ফানুসের দাম সাতশো টাকা। মানদা মাসির নতুন খড়ে-ছাওয়া বাড়ি করিয়ে দিলেন কাকাবাবু। আমাদের বললেন, ঘাবড়াও মাত্। আসছে বার আমি খোল তৈরি করব। এক্সপেরিমেন্ট ইজ লাইফ!

ডানাকাটা পাখি

বয়স্ক কণ্ঠ : ও বাব্বা, কুকুর আছে যে, মরেছে। অলেস্টারটা তাহলে খুলে ফেলাই ভাল। কুকুর আবার অলেস্টার সহ্য করতে পারে না। সেবার দেরাদুনের রাস্তায় কি কেলেঙ্কারি হয়েছিল। তিনটে তাগড়া কুকুর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। মাঙ্কিক্যাপটা কী করব? খুলে ফেলব, না থাকবে! কটা বাজল দেখি! দুটো বেজে পাঁচ—। সে কি রে বাবা! এই তো সবে ভোর হল। ট্রেনে বসে বসেই তো সূর্যোদয় দেখলুম। এরই মধ্যে দুটো পাঁচ।

[দরজা খোলার শব্দ। জোরে কুকুরের ডাক]

শান্ত হও। শান্ত হও বৎস। অত উত্তেজনা ভাল নয়।

নারী কণ্ঠ : কাকে চাই?

বঃ কণ্ঠ : তুমি কে?

নাঃ কণ্ঠ : আমি কাজ করি।

বঃ কণ্ঠ : আই সি, এমপ্লয়ি! ইউনিয়ান কর?

নাঃ কণ্ঠ : মুখ্যু মানুষ। ইংরেজি জানি না বাবা।

বঃ কণ্ঠ : ধম্মঘট কর?

নাঃ কণ্ঠ : আজ্ঞে না। আপনি কি পুলিশের লোক?

বঃ কণ্ঠ : আজ্ঞে না। আমি মিলিটারি ম্যান। মনোরমা কোথায়?

নাঃ কণ্ঠ : মা বাথরুমে।

বঃ কণ্ঠ : মার স্বামী কোথায়?

নাঃ কণ্ঠ : বাজারে।

বঃ কণ্ঠ : লেড়কা-লেড়কিরা কোথায়?

নাঃ কণ্ঠ : বিছানায়।

বঃ কণ্ঠ : বিছানায়? কান পাকাড়কে আভি উতার দেও। দুটো পাঁচ বেজে গেল। আভিতক লেটকে পড়ে থাকা হায়। মামার বাড়ি পা গিয়া।

নাঃ কণ্ঠ ঃ দুটো পাঁচ কি বলছেন গো বাবু? এই তো সবে আটটা বাজল।

মনোরমা ঃ কে গো শঙ্করীর মা?

শঙ্করীর মা ঃ বুড়ো মত একটা লোক। মাথায় হনুমান টুপি। বলছেন মিলিটারি।

মনোরমা ঃ ওমা, দাদা তুমি! কখন এলে?

দাদা ঃ দুটো পাঁচে—। রাত কি দিন বলতে পারব না, ঘড়িতে লেখা থাকে না।

মনোরমা ঃ এই তো সবে আটটা বাজল গো দাদা। বাজনা শুনে বাথরুমে গেলুম। ভেতরে এসো, ভেতরে এসো।

দাদা ঃ নো নেভার। কুকুর থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। দে আর ডেঞ্জারাস। কামড়ালেই পেটে ইঞ্জেকশান।

মনোরমা ঃ দাদা, এই তুমি মিলিটারি ম্যান! কুকুরের ভয়ে কাবু! সারাজীবন তাহলে কী লড়াই করলে?

দাদা ঃ মেয়েদের মত বোকা বোকা কথা বলিসনি তো। আমি কি তোর বাড়িতে এতদিন পরে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলুম? কী যে বসিল মনা?

মনোরমা ঃ তুমি নির্ভয়ে ভেতরে এস। কুকুর বাঁধা আছে।

দাদা ঃ কি রকম বাঁধা? খুলে বেরিয়ে আসবে না তো? ডাক শুনে মনে হচ্ছে মানুষ-খেকো কুকুর।

মনোরমা ঃ মোটা চেন দিয়ে জম্পেস করে বাঁধা আছে!

দাদা ঃ ভেরি ওয়েল। আমাদের আর্মিতে কী বলে জানিস? সাবধানের মার নেই।

মনোরমা ঃ আমাদের শাস্ত্র কী বলে জানো? মারের সাবধান নেই। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।

দাদা ঃ সদরে চৌকাঠ করিসনি কেন? বাইরে থেকে সাপ-খোপ ঢুকতে পারে!

মনোরমা ঃ আজকালকার হাল ফ্যাশানের বাড়িতে চৌকাঠ থাকে না দাদা

দাদা ঃ বড় ভয়ঙ্কর কথা ! জীবন নিয়ে খেলা।

মনোরমা ঃ স্যুটকেসটা হাত থেকে নামাও। কী আশ্চর্য, তুমি কি দাঁড়িয়ে থাকবে সারাদিন।

দাদা ঃ বসব কিরে! ফার্স্ট আমার একটা বাথরুম চাই. এক বালতি গরম জল চাই। এক শিশি disinfectant চাই। একটা ভাল সাবান চাই, একটা স্পঞ্জ চাই এবং একঘণ্টা সময় চাই। তারপর তুই আমাকে বসার অনুরোধ করবি। হ্যাঁ বিফোর দ্যাট এক গেলাস ভেরি ওয়ার্ম—ভেরি ওয়ার্ম চা চাই।

মনোরমা ঃ চা আমি এখুনি সাপ্লাই করছি। বাথরুম তোমার চোখের সামনে। তোমার যা চাই সব ওখানে আছে।

দাদা ঃ এইবার আমার গোটাকতক প্রশ্ন আছে—।

মনোরমা ঃ করে ফেলো।

দাদা ঃ তুই দরজা না খুলে তোর কাজের লোক কেন দরজা খুলল! তার মানে আমার আসার জন্যে তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। কেন ছিলে না? Why? ক্যা হাম অচানক আ গিয়া? অ্যাম আই আনওয়ান্টেড? রিপ্লাই। জবাব লাগাও।

মনোরমা ঃ ও মা! তুমি যে আজই আসবে জানব কী করে দাদা?

দাদা ঃ হোয়াই? তোকে আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। দিইনি?

মনোরমা ঃ হ্যাঁ দিয়েছো, তবে চিঠি নয়, একটা প্রেসক্রিপশান। ওপরে ছাপমারা দেরাদুন মিলিটারি হসপিট্যাল। সেইটুকুই পড়া যায়। বাকিটা ডাক্তারেই পড়তে পারে। মানুষের কম্ম নয়।

দাদা ঃ সে কিরে? চিঠিটা তাহলে কাকে পাঠালুম! সর্বনাশ করেছে, সেটা তাহলে প্রেসক্রিপশান ভেবে ছুটির দরখাস্তর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি। আমি চললুম।

মনোরমা ঃ সে কী, কোথায় চললে?

দাদা ঃ দেরাদুনে। দরখাস্ত থেকে চিঠিটা খুলে প্রেসক্রিপশানটা লাগিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে আমার কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে।

(দরজা খোলার শব্দ)

মনোরমা-স্বামী ঃ কী ব্যাপার, শশাঙ্কদা যে। কখন এলেন?

শশাঙ্কদা ঃ তোমাদের ঘড়ি অনুসারে আটটার সময়। আমার ঘড়ি অনুসারে দুটো বেজে পাঁচে। আচ্ছা তাহলে চলি।

মনোরমা-স্বামী ঃ চলি মানে? কোথায় যাবেন?

শশাঙ্ক ঃ দেরাদুনে। সব গোলমাল করে ফেলেছি ভাই। ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে যে প্রেসক্রিপশানটা অ্যাটাচ করার কথা ছিল সেটা মনোকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর মনোকে লেখা চিঠিটা দরখাস্তের সঙ্গে পিন আপ করে কর্নেল মোরোর টেবিলে রেখে এসেছি।

মনোরমা-স্বামী ঃ তা কী করে হয়? আপনি তো ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এসেছেন? তা নাহলে এলেন কী করে!

শশাঙ্ক ঃ হ্যাঁ তাও তো ঠিক (হাসি)। ওরা তো আমাকে বললে—একমাস ছুটি মঞ্জুর করা হল। সে চিঠিটা তো আমার সঙ্গেই রয়েছে। ভাগ্যিস বললে উদয়ন। তা না হলে আবার আমাকে কলকাতা থেকে দেরাদুন ছুটতে হত। গড সেভ দি কিং। আচ্ছা তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দে মনোরমা। তোর ছেলেমেয়েরা এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে আছে কেন?

উদয়ন ঃ টি ভি। টি ভি হেড-এক। কাল টি ভি-তে ফিল্ম ছিল। সেই ছবিতেই কাত।

শশাঙ্ক ঃ সে কি উদয়ন? তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বলে টি ভি ঢোকালে? পড়ুয়াদের সর্বনাশ!

উদয়ন ঃ আমি ঢোকাইনি দাদা। আপনার বোন আমদানি করেছে।

শশাঙ্ক ঃ **না না মনোরমা, ওসব আমি অ্যালাউ করব না। আজই ওটাকে আমি** অকেজো করে দোবো। মেজর শশাঙ্ক ওসব বরদাস্ত করবে না।

মনোরমা ঃ দাদা। বরং কন্ট্রোল করে দিও।

শশাঙ্ক ঃ আমি বাথরুমে ঢুকছি। ও দুটোকে ঠেলে তোল। তারপর আমি এসে দেখছি। এ বাড়িতে আর্মি ডিসিপ্লিন চালু করতে হবে। এত ঢিলে-ঢালা চলবে না বাপু।

মনোরমার ছেলে বোধয়ন ঃ কে এসেছেন মা?

মনোরমা ঃ তোমার মামা এসেছেন। বড় মামা। সেই যাঁর গল্প তোমাদের করতুম। মিলিটারি মামা। ছ-ফুট লম্বা, ইয়া বড় বড় গোঁফ। তোমাদের ওপর ভীষণ রেগে গেছেন।

সোমা ঃ দাদা, দাদা দেখবি আয় কি বিরাট জুতো!

মনোরমা ঃ জুতো দেখা বেরোবে। মানুষটা বাথরুম থেকে বেরোক, তারপর তোমাদের মজা বেরোবে। বেলা নটা অবদি পড়ে পড়ে ঘুম।

বোধয়ন ঃ সোমা, মামার সুটকেসটা দেখেছিস? তোকে শুইয়ে রাখা যায় ওর ভেতর।

মনোরমা ঃ তোমরা রেডি হয়ে খাবার টেবিলে চলে যাও। মামা এসে তোমাদের ধরবেন।

সোমা ঃ কি ধরবেন মা? পড়া?

বোধয়ন ঃ পড়া ধরবেন কেন রে বোকা। উনি কি মাস্টারমশাই? তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবেন। হ্যান্ডশেক করবেন।

শশাঙ্ক ঃ অ্যাবাউট টার্ন। হল না, হল না।

মনোরমা ঃ কী করে হবে দাদা ? তুমি যা জোরে চিৎকার করলে!

শশাঙ্ক ঃ অ্যাবাউট টার্ন কি আস্তে ফিস ফিস করে বলে? ইংরেজিতে বলে শাউট ইওর অর্ডারস। তাও তো আমি গলা অনেক খাটো করে বলেছি।

মনোরমা ঃ কই, তোমরা নমস্কার কর। প্রণাম কর।

শশাঙ্ক ঃ না না প্রণাম নয়। হাত মেলাও, শেক হ্যান্ডস। বাঃ তোর ছেলেটার হাতের গ্রিপ তো বেশ ভাল। এ হাতে রাইফেল বেশ ভাল জমবে। কী নাম রেখেছিস?

মনোরমা ঃ বোধয়ন (কাশি), মেয়ের নাম সোমা।

শশাঙ্ক ঃ বোধয়ন। ইংরাজিতে নাম লিখতে গিয়ে চেত্তা খেয়ে পড়ে যাবে যে রে। এঃ। ছেলেটাকে নামের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিস রে। হাঁপানির রুগী তো এ নাম ধরে ডাকতেও পারবে না।

মনোরমা ঃ আধুনিক নাম এইরকমই হয় দাদা। ওর বাবা নাম রাখার বই দেখে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছে। ডাকনাম বুড়ো।

শশাঙ্ক ঃ বাঃ এই নামটা বেশ হ্যান্ডি।

মনোরমা ঃ নাও চলো। ব্রেকফাস্ট তৈরি।

শশাঙ্ক ঃ ব্রেকফাস্ট? দাঁড়া দাঁড়া, তার আগে আমাদের অনেক কাজ বাকি। প্রথমে চেক আপ। সোম আর বুধ এদিকে এস। ফল ইন।

সোমা ঃ ফল ইন মানে কী মামা ?

শশাঙ্ক ঃ তোমরা দুজনে পাশাপাশি আমার সামনে সোজা হয়ে পা জোড়া করে দাঁড়াও। মনা তুইও দাঁড়াতে পারিস। উদয়ন কোথায়? সেও দাঁড়াতে পারে। ডাক তাকে। এই একমাসে তোদের স্বভাব আমি পাল্টে দোবো। বিলকুল চেঞ্জ করে দোবো। সবকটাকে আমি কর্নেল বিশ্বাস বানিয়ে ছেড়ে দোবো।

বোধয়ন ঃ কর্নেল বিশ্বাস কে মামা ?

শশাঙ্ক ঃ বাঙালি বীর। বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন।

সোমা ঃ মল্লযুদ্ধ কী মামা?

শশাঙ্ক ঃ কুস্তি। কুস্তি লড়েলিন।

মনোরমা ঃ যাঃ তুমি সব ভুল বলছ। কর্নেল বিশ্বাস ছিলেন ভূপর্যটক।

শশাঙ্ক ঃ এইরে, তাই নাকি? তাহলে বাঘ মেরেছিল কোন বাঙালি? তুই ঠিক জানিস?

মনোরমা ঃ কি জানি বাবা। আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

শশাঙ্ক ঃ ঠিক আছে। সন্দেহ হচ্ছে যখন ওটা ছেড়ে দাও। আরও বাঙালি আছে। আশানন্দ ঢেঁকিকে ধর। জেনারেল চৌধুরীকে ধর। নেতাজীকে ধর। স্বামীজীকে ধর। উদয়নটা আবার গেল কোথায়?

মনোরমা ঃ সে আবার বাজারে গেছে।

শশাঙ্ক ঃ ওর ভুঁড়িটাকেও কমিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এই বয়েসে অত বড় পেট! আরে ছি ছি। তুই একটু নজর রাখিস না মনো। আচ্ছা এইবার চেক আপ। দেখি দাঁত দেখি। তোমরা সকলে ঈ কর। মনা কর। আরে দাঁত খিঁচো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট লাইক দ্যাট। মনোরমা। তোর দাঁতের অবস্থা ভেরি ব্যাড। ভেরি ভেরি ব্যাড। ওয়ার্স্ট। তুই দাঁত থাকতেও দাঁতের মর্যাদা বুঝিসনি। এই দাঁত থেকেই বাত আসবে।

মনোরমা ঃ আসবে কি দাদা এসে গেছে।

শাশাঙ্ক ঃ ছি ছি, তুই আমার বোন হয়ে আমাদের বংশের মুখ ডোবালি। বাবা আমাদের আটাত্তর বছর বয়েসেও দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আস্ত একটা আখ খেতেন। কিসের জোরে? দাঁতনের জোরে। নিম দাঁতন।

মনোরমা ঃ এখানে দাঁতন পাচ্ছি কোথায়?

শশাঙ্ক ঃ বুড়ো, তোমার দাঁত ভাল পরিষ্কার হয়নি। তোমার দাঁতও মার লাইনে যাচ্ছে। বি কেয়ারফুল। বেশি মিষ্টি খাচ্ছ। আজ থেকে নো সুইটস। খাবার পরই দাঁত মাজার অভ্যাস করবে। মনে রাখবে ওয়ার্লডে হাতি তার দাঁতের জন্যেই বিখ্যাত। মিলিটারিতে বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক মানে হাতির দাঁত। সোমা তোমার দাঁত এখনও ভাল আছে। বেস্ট অফ দি লট।

উদয়ন ঃ একি তোমরা সব দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শশাঙ্ক ঃ দেখি তোমার দাঁত। শো মি ইওর টিথ।

উদয়ন ঃ দাদা আমার সে গুড়ে বালি। দুপাটিই ফল্‌স।

শশাঙ্ক ঃ ও তুমি তাহলে ফোকলা দিগম্বর। বয়েজ, লেট আস গো।

মনোরমা ঃ এখন কোথায় যাবে?

শশাঙ্ক : খোলা জায়গায়। সামান্য ব্যায়াম। ব্যায়াম ছাড়া কারুর আহারের অধিকার থাকে না। উদয়ন তোমার ল্যাঙোট আছে তো?

উদয়ন : ল্যাঙোট?

শশাঙ্ক : হ্যাঁ হ্যাঁ লেঙ্গোটি।

উদয়ন : ল্যাঙোট কী হবে দাদা?

শশাঙ্ক : তোমার ভুঁড়ি কমাব। তোমাকেও ব্যায়াম করতে হবে। দুদিনে তোমার শরীরের বাড়তি মেদ কমিয়ে দোবো। ওই কি একটা শরীর। গোলগাপ্পা। ।

উদয়ন : এই বয়েসে আমি করব একসাইজ! অ্যাম আই ম্যাড—?

শশাঙ্ক : সেই নীতিবাক্যটি স্মরণ কর উদয়ন, আপনি আচরি ধর্ম। নিজেকে ঠিক না করলে তুমি এদের ঠিক করবে কী ভাবে! যাও যাও ল্যাঙোট না থাকে, জাঙিয়া পরে এস।

মনোরমা : দাদা সাহস করে একটা কথা বলব?

শশাঙ্ক : বল।

মনোরমা : আজ ওসব থাক। তুমিও ট্রেনে এলে এতটা পথ, আজ রেস্ট নাও। কাল থেকে সব হবে।

শশাঙ্ক : কাল? কাল কাল করে কালক্ষেপে পৃথিবীর কত মহৎ প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে? জীবন থেকে একটা দিন চলে গেলে তুই ফিরিয়ে দিতে পারবি? নো কাল। আজ থেকেই শুরু হবে।

মনোরমা : এসব ভোরবেলা করতে হয় দাদা। আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শশাঙ্ক : ভোর! তোদের ভোরই তো হয় সকাল নটায়? পড়েই এলি সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। জীবনে সূর্যোদয় আর দেখতে হল না। (হাসি) হাও ফানি! হাও ফানি!

মনোরমা : ঠিক আছে দাদা। কাল থেকে ভোর ভোরেই হবে।

শশাঙ্ক : অলরাইট। তোদের কথায় আর একটা দিনও ডাস্টবিনে গেল। কী আর করা যাবে বল। অভ্যাস। হ্যাবিট। সহজে কি তাড়ানো যায়? Habit সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল। বয়েজ, ফল আউট।

রাধয়ন-সোমা : হো ও ও......

শশাঙ্ক : হোয়াট ইজ দিস? চিৎকার করছ কেন। হঠাৎ এই উল্লাসের কারণ?

মনোরমা : ওরা মাঝে মাঝেই এইরকম চিৎকার করে দাদা। ছোটো তো: ছোটোরা একটু চেঁচাবেই।

শশাঙ্ক : তা বলে যখন-তখন চেঁচাবে? আমি চেঁচাবার অর্ডার দিয়েছি? আমি কি বলেছি ফল-আউট। আমি হলে এই ইন্‌ডিসিপ্লিনের জন্যে ব্রেকফাস্ট বন্ধ হয়ে যেত। ইস্-স্-স্। টেবিল ক্লথটা কি অপরিষ্কার, জায়গায় জায়গায় হলুদের ছোপ। কে যেন হাত মুছেছে। মোস্ট ইনডিসেন্ট।

উদয়ন : আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন দাদা। যে কোন সংসারেই ওরকম একটু আধটু দাগ পাবেন। ওসব উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শশাঙ্ক : টাইম টেবল আছে?

মনোরমা : টাইম টেবল কী হবে দাদা?

শশাঙ্ক : আজই চলে যাব। তোদের সঙ্গে আমার মিলবে না রে। অশান্তি হয়ে যাবে।

মনোরমা : তুমি একটু ধৈর্য ধরে দেখোই না। কাল থেকে সব তোমার মনের মত হয়ে যাবে।

শশাঙ্ক : ওকি, ওকি? ওই ফুলো ফুলো জিনিসগুলো কী আসছে!

উদয়ন : লুচি। লুচি আপনি দেখেননি?

শশাঙ্ক : অ্যাঁ! লুচি? তোমরা লুচি খাও! বিষ। এ কাইন্ড অফ পয়েজন গুড লর্ড! শিশু হত্যার পরিকল্পনা!

বোধয়ন : আমি লুচি আর আলুভাজা খেতে ভীষণ ভালবাসি।

সোমা : আমি চাটনি আর চানাচুর।

উদয়ন : আমি কাবাব আর পরোটা।

মনোরমা : আমি মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস।

শশাঙ্ক : তোদের ইকমিক কুকার আছে? এই একমাস নিজের রান্না আমি নিজে করে নোবো। খাদ্যহীন খাদ্য আমি খেতে পারব না। এসব লুচি-ফুচি সরিয়ে নে। আমাকে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এক কাপ চা দে।

সোমা : লুচি খেলে কী হয় মামা?

শশাঙ্ক : স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছিস?

সোমা : হ্যাঁ।

াঙ্ক : তিনি বলে গেছেন বাঙালি লুচি আর পরোটা খেয়ে খেয়েই পরকালটা খাবে। গান্ধীজী বলে গেছেন চিনি হল হোয়াইট পয়েজন। এসব কুখাদ্য । খেতে খেতে এত বড় একটা লিভার হবে। অজীর্ণ অম্বল, ইয়া ভুঁড়ি ঢ্যাবঢ্যাবে অকর্মণ্য শরীর। বাত, ন্যাবা অম্লশূল, পিত্তশূল।

রমা : লুচি ছুটির দিনেই হয় দাদা। অন্যদিন পাঁউরুটি, মাখন, জেলি।

াঙ্ক : ফল ঢোকে বাড়িতে? না! সে সবের পাট নেই। সকালে ফল হল সোনা। একটা করে আপেল, কমলা, কলা, পেয়ারা। এক গেলাস দুধ—। বয়েলড ভেজিটেবলস, হাফ-বয়েলড ডিম, মধু, খেজুর, সোয়াবিন, কিসমিস। না ওসব মুখে রুচবে না।

ামা : দুধ রুগীর খাদ্য।

য়েন : সোয়াবিন রিয়েল অখাদ্য।

য়েন : খাওয়াটা দাদা আপরুচি। অত পথ্য অপথ্য খাদ্যগুণ মেনে খেতে গেলে ওষুধ খাওয়াই ভাল।

শাঙ্ক : ইয়েস, এই হল শিক্ষিত মানুষের ধরন। জ্ঞান পাপী। তাল কানা। মুখ্যুর মুখ্যু। শেম শেম।

য়েন : যাই। আয়। আয়।

গত : বুঝলে কড়কড়ে বিলিতি তাস। ছেড়ে দিলে সবকটা সড়াক করে পিছলে যাবে। কি পালিশ!

য়েন : ওরা কোথায়?

গত : সব আসছে। সব আসছে—

য়েন : বস্. আমি আসছি—

শাঙ্ক : কী ব্যাপার? কারা এল?

রমা : তাসপার্টি. এইবার বেলা দুটো পর্যন্ত হই-চই চলবে।

নামা : মাঝে মাঝে দাঙ্গাও বেধে যায়।

য়েন : তাস আর দাবাতে একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবেই। তা না হলে ঠিক জমে না।

শাঙ্ক : আই সি।

রমা : তুমি তাস খেলতে বসছ কিন্তু আজ দুটোর মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোতে হবে। আমার সিনেমার টিকিট কাটা আছে।

উদয়ন ঃ সিনেমা সিনেমা আর সিনেমা। টি ভি-তে সিনেমা, সি
সিনেমা।

বোধয়ন ঃ তুমি বেশ আছ মা। রবিবার হলেই তোমার সিনেমা।

সোমা ঃ চল দাদা, আমরাও আজ যাব।

বোধয়ন ঃ দাঁড়া না, আর একটু বড় হই!

মনোরমা ঃ (শাসনের গলায়) ছোটরা ছোটদের মত থাকবি। বড়দের কা
সমালোচনা করতে আসবি না।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

বোধয়ন ঃ বাবা তুমি রেডিওর ব্যাটারি এনেছো?

উদয়ন ঃ এই যাঃ ভুলে গেছি রে। দু-দুবার বাজার গেলুম। ইস্ এ
মনে ছিল না।

বোধয়ন ঃ বাঃ কি করে রিলে শুনব। আমি তাহলে সারাদিন আজ পাশ
বাড়িতে থাকব।

মনোরমা ঃ না! পরের বাড়িতে রিলে শুনতে যেতে হবে না।

বোধয়ন ঃ তাহলে ব্যাটারি আনিয়ে দাও।

মনোরমা ঃ ক্রিকেটের কী বুঝিস তুই। কাল ইস্কুল আছে। আজ সব
বসে বসে তৈরি কর। একদিন রিলে না শুনলে মহাভারত অ
হয়ে যাবে না।

বোধয়ন ঃ তোমাকেও তাহলে সিনেমা দেখতে যেতে দোবো না।

মনোরমা ঃ (ধমকের সুরে) বুড়ো।

বোধয়ন ঃ (একই রকম সুরে) কী!

মনোরমা ঃ বাপের আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

উদয়ন ঃ এর মধ্যে আবার বাপকে ধরে টানাটানি কেন? ঠিক আছে, অ
শঙ্করীর মাকে দিয়ে ব্যাটারি আনিয়ে দিচ্ছি।

মনোরমা ঃ (ব্যাজার গলায়) হ্যাঁ তাই দাও। তবু ছেলেকে একটু শা
করবে না।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

সোমা ঃ নাও সকালেই ঝগড়া শুরু হল। আঃ শান্তি নেই। দাদা তুই
কর না বাপু।

বোধয়ন ঃ প্যাকামো করিসনি সোমা। মার আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

সোমা ঃ বাঁদর নয়রে বোকা, বাঁদরী।

শশাঙ্ক ঃ আই সি!

বোধয়ন ঃ বাবা, আজ তুমি মুরগি এনেছো?

উদয়ন ঃ না রে আজ পাঁঠা—

বোধয়ন ঃ এঃ রোববারটাই মাটি করে দিলে।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ তোমাদের ভীষণ নবাবী অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এই খাই না, সেই খাই না।

উদয়ন ঃ কী যে বল না? ওদের তো এখন খাবারই বয়েস। তাজা লিভার, কী বলেন দাদা?

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ কি দাদা? তখন থেকে তুমি আই সি, আই সি করে যাচ্ছ।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

সোমা ঃ মা, আই সি মানে তো আমি দেখি, তাই না?

বোধয়ন ঃ হ্যাঁ রে সোমা। মামা ওই একটা ইংরেজিই জানেন।

উদয়ন ঃ তুমি তাহলে বাইরের ঘরে চার-পাঁচ কাপ চা পাঠিয়ে দিও।

(চেয়ার সরানোর শব্দ)

শশাঙ্ক ঃ আমি তাহলে বাগনের দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে একটু বসি। ভাল বই-টই কিছু আছে?

বোধয়ন ঃ ডিটেকটিভ বই পড়বেন মামা, থ্রিলার কমিকস্!

শশাঙ্ক ঃ কেন, অন্য কোন বই নেই? রামায়ণ আছে রে?

মনোরমা ঃ না দাদা।

বোধয়ন ঃ আমার কাছে ছোটদের ইংরেজি রামায়ণ আছে। পড়বেন?

শশাঙ্ক ঃ মহাভারত আছে রে?

মনোরমা ঃ না দাদা—

শশাঙ্ক ঃ গীতা আছে?

মনোরমা ঃ একটা পকেট সাইজ আছে।

শশাঙ্ক ঃ ভাল কোন জীবনী আছে?

সোমা ঃ ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়বেন মামা?

শশাঙ্ক ঃ আই সি। তাহলে আজকের কাগজটাই দে।

বোধয়ন ঃ মামা আমি আগে খেলার পাতাটা একটু দেখেনি, প্লিজ!

শশাঙ্ক ঃ বেশ! তোমার দেখা হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে এস।

বোধয়ন ঃ আয় আয় শ্যামল আয়, পার্থ কোথায় রে?

শ্যামল ঃ ওই তো আসছে। ওর বাবা ওকে একটা বাইক কিনে দিয়েছে।

বোধয়ন ঃ আয় না ভেতরে আয়।

শ্যামল ঃ কি চাপিয়েছিস রেকর্ড প্লেয়ারে! আমার তো নাচতে ইচ্ছে করছে।

বোধয়ন ঃ নাচ না! এটা তো নাচেরই মিউজিক।

পার্থ ঃ বোধয়ন—তোর কাছে কাটায় লাগাবার কোনও ওষুধ আছে রে! তিনবার আছাড় খেলুম।

বোধয়ন ঃ ভেতরে আয় না। দিচ্ছি লাগিয়ে।

পার্থ ঃ কী বাজাচ্ছিস? একটা সিনেমার গান লাগা না।

বোধয়ন ঃ লাগাচ্ছি, লাগাচ্ছি তুই বস না—

পার্থ ঃ বেশিক্ষণ বসব না রে। সেলুনে চুল কাটতে যাব। দাদুটা ভীষণ ফ্যাচ ফ্যাচ করছে। বুড়োটা বড় চুল দেখতে পারে না।

বোধয়ন ঃ আমার মিলিটারি মামা এসেছে রে। মাথার চুল দেখলে তোদের হাসি পাবে। এইটুকু এইটুকু করে ছাঁটা। তেমনি মেজাজ। কাল থেকে আমাদের পিটি করাবে। ভোরবেলা বিছানা থেকে টেনে তুলবে! কোনদিন আমার চুলগুলোও কপচে দেবে রে।

শ্যামল ঃ তোর খুব বিপদ রে বোধয়ন।

বোধয়ন ঃ তেমনি মিলিটারি মেজাজ। ইয়া লম্বা। ইয়া গোঁফ!

পার্থ ঃ ছোটদের জীবনে কোন সুখ নেই রে। তোর যেমন মামা, আমার তেমনি দাদু। শ্যামল তোর কে রে?

শ্যামল ঃ আমার সব ক্লিয়ার! আমি তো মামার বাড়িতেই পড়ে আছি। আমার বাবা তো মারা গেছেন ভাই। আমাকে কে আর শাসন করবে বল? মা কেবল মাঝে মাঝে দুঃখু করে বলে, ভাল করে লেখাপড়া কর খোকা।

পার্থ ঃ তুই তো লেখাপড়ায় ভালই রে ভাই। অঙ্কে তুই তো একশোর মধ্যে একশো পাস!

শ্যামল ঃ আমি যে তেমনি ইংরেজিতে কাঁচা। তোরা সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িস, আমাকে কে পড়াবে বল। তোদের সকলের টিউটর আছে, আমার কে আছে বল!

শশাঙ্ক ঃ তোমার ভগবান আর বিশ্বাস আছেন শ্যামল।

বোধয়ন ঃ মামা আপনি? এই তো দেখলুম আপনি রোদে বসে আছেন।

শশাঙ্ক ঃ তুমি আমার পা দুটো বোধহয় দেখনি। মানে যে পায়ে মানুষ দেহটাকে খাড়া রাখে, চলে বেড়ায়। আমি তো উদ্ভিদ নই, যে এক জায়গায় গজিয়ে থাকবো। (শ্যামল বোধয়নের মামাকে গিয়ে প্রণাম করে) আরে থাক্ থাক্। তুমি দীর্ঘজীবী হও শ্যামল। তোমার এখনও সাবেক অভ্যেসটা আছে দেখছি। আধুনিক ছেলেরা তো কেউ মাথা নিচু করে না। তারা তো জন্মেই মিলিটারি।

শ্যামল ঃ আমার মা যে বলে দিয়েছেন গুরুজনদের প্রণাম করে মাথা পেতে আশীর্বাদ নেবে, তাতে তোমার ভাল হবে। রোজ সকালে আর ঘুমোবার আগে ভগবানকে ডাকবে, বাবাকে মনে মনে চিন্তা করবে। তিনি যেখানেই থাকুন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

(শ্যামলের কথা শুনে বোধয়ন ও পার্থ হাসবে)

শশাঙ্ক ঃ তোমরা দুজনে হাসছ কেন?

পার্থ ঃ ও কি রকম পাকা পাকা কথা বলছে। শ্যামল, তুই সেই কবিতাটাও আবৃত্তি কর। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

শশাঙ্ক ঃ তোমরা বুঝি ভগবান-টগবান মান না!

পার্থ ঃ আমার দাদা বলেন ও সব কুসংস্কার। ভগবান আবার কী? কারুর কাছে মাথা নিচু করবি না। সবসময় মাথা উঁচু করে চলবি। কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়।

শশাঙ্ক ঃ তোমার দাদা কী করেন?

বোধয়ন ঃ পলিটিক্স করেন!

শশাঙ্ক ঃ আই সি! তা তোমাদের সকালবেলা পড়াশোনা নেই?

পার্থ ঃ রবিবার আবার পড়া কী। ছুটির বার।

শশাঙ্ক ঃ রবিবার তাহলে কী করো?

পার্থ ঃ (মজা করে) বাবা গেছেন মাছ ধরতে। মা গেছেন মামার বাড়ি। আমরা এখন রিলে শুনব। হই হই করব!

শশাঙ্ক ঃ কেন, কত ভাল ভাল বই আছে। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, এসব পড়তে ভাল লাগে না?

পার্থ ঃ দুস্। [illegible] বাজে। ভাল লাগে না মোটেই।

শ্যামল : জানেন, আমি পড়ি। জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, ভূগোল পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি বড় হলে সুইজারল্যাণ্ডে যাব।

পার্থ : তুই গোবরডাঙ্গায় যাবি।

শশাঙ্ক : কেন ও যেতে পারে না?

বোধয়ন : কী করে যাবে! ও তো সাধারণ স্কুলে পড়ে। ভাল চাকরি-বাকরি পাবে না। স্কুল মাস্টারি করবে।

শশাঙ্ক : তাই নাকি? কে বলেছে!

বোধয়ন : বাবা বলেছে।

শশাঙ্ক : আই সি। তা শ্যামল তোমার ওই রিলে শোনার বাতিক নেই? সারাদিন কানের কাছে রেডিও খুলে বসে থাকা?

শ্যামল : আমার ও সব ভাল লাগে না মামা। আমার বাবা বলতেন, সবসময় নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখবি। কাজ না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমোবি। হুজুগে মাতবি না।

পার্থ : সেই কথাটাও বলে দে। আইড্‌ল ব্রেন ডেভিলস্‌ ওয়ার্কশপ। মামা, ও কিন্তু ভাল ক্রিকেট খেলে। ব্যাট ধরলে আউট করা যায় না। বল করলে সামনে দাঁড়ান যায় না।

শ্যামল : না মামা, ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে। আমাকে কেউ খেলতে শেখায়নি।

শশাঙ্ক : তবে তুমি ভাল খেল কী করে?

শ্যামল : আমার কি রকম একটা রোখ চেপে যায়। মনে হয় কিছুতেই হারব না।

শশাঙ্ক : গুড্‌, ভেরি গুড্‌। তোমার হবে ভাগনে। তুমি জীবনে অনেক বড় হবে।

শ্যামল : আমি এখন আসি। বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় কাচতে হবে।

শশাঙ্ক : তুমি বুঝি নিজেই নিজের জামাকাপড় কাচ, বাঃ! সুন্দর অভ্যাস। বোধয়ন তুমিও তোমাদের টেবিল ক্লথটা কেচে ফেল না।

বোধয়ন : না না, ওটা তো লন্ড্রিতে যাবে।

শশাঙ্ক : তাহলে চল না চারিদিকে ভীষণ ঝুল হয়েছে, ঝেড়ে ফেলা যাক্‌।

বোধয়ন : ও তো শঙ্করীর মার কাজ।

শাঙ্ক ঃ তাহলে চল বই গুছাই। চারিদিক বড় এলোমেলো হয়ে আছে !

য়ন ঃ আমাদের তো ওই রকমই থাকে মামা।

শাঙ্ক ঃ আই সি! তাহলে তোমরা মজা করে গানই শোন। কই কাগজটা তো আমাকে দিয়ে এলে না!

য়ন ঃ ভুলেই গেছি মামা। ওই যে সোফার ওপর রয়েছে।

শাঙ্ক ঃ ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। নিষ্ঠার বড়ই অভাব।

[মামা চলে গেলেন]

পার্থ ঃ সত্যিই তোর মিলিটারি মামা। কি মেজাজ রে বাবা! ক-দিন থাকবেন?

দয়ন ঃ শুনছি একমাস।

পার্থ ঃ এই একমাস তোদের বাড়ি আর আসব না।

[দৃশ্য পরিবর্তন। উদয়ন বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছে]

দয়ন ঃ টু-হার্টস। তখন থেকে হাতে কি যে তাস আসছে। আজ গ্রহ লেগেছে। নাও কল দাও।

[মামার প্রবেশ]

শাঙ্ক ঃ কি হে এখনও তোমাদের চলছে !

দয়ন ঃ আরে দাদা যে, আসুন, আসুন।

শাঙ্ক ঃ অনেক বেলা হল। এইবার রাখ না।

দয়ন ঃ এই তো একটাই রবিবার দাদা। রোজই তো নাকেমুখে গুঁজে সকাল নটার সময় দৌড়োই।

শাঙ্ক ঃ রবিবারটা তো আর একটু অন্যভাবেও খরচ করা যায় উদয়ন? যেমন ধর সপরিবারে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে গেলে। একটু আউটিং হল সকলের।

দয়ন ঃ এ আপনি কি বলছেন? থিওরেটিক্যাল কথাবার্তা।

নর বন্ধু ঃ এ যেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ শুনছি। সারা সপ্তাহ বাস ঠেঙিয়ে কারুর ইচ্ছে করে মশাই, রোববার লটবহর নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে নাচতে ! ওই বছরে একবার চিড়িয়াখানা। আর মাঝে মধ্যে বিয়ে-টিয়ের নেমন্তন্ন। আরে মশাই, আর বছর খানেক পরে ওরা তো নিজেরাই হিল্লি-দিল্লি করবে।

শশাঙ্ক ঃ বেশ বাইরে না গেলেও বাড়িতে থেকেও তো ছেলে-মে
একটু সঙ্গ দেওয়া যায়। সারা সপ্তাহ দেখতে পার না, এই
দিন ওদের সঙ্গেই বই-টই নিয়ে একটু বসতে পার তো!

উদয়ন ঃ কেন? ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, ভাল শিক্ষক রেখে
আমি বই নিয়ে বসে কী করব?

শশাঙ্ক ঃ পড়ার বই ছাড়াও তো অনেক ভাল বই আছে উদয়ন। আজ
ভাল ভাল সচিত্র শিশুপাঠ্য ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ কা
সাধারণ জ্ঞানের বই বেরিয়েছে। সেই সব বই নিয়েও তো
বসা যায়, নানা দেশের গল্প বলা যায়। পড়ার একটা
ধরিয়ে দেওয়া যায়। যায় না?

উদঃ বন্ধু ঃ নাও, নাও, টু স্পেডস্।

উদয়ন ঃ আমার অত সময় কোথায় দাদা? নো কল।

শশাঙ্ক ঃ তা ঠিক। সময় কোথায়। সত্যিই তো সময় কোথায়!

[দৃশ্য পরিবর্তন—রাস্তার দৃশ্য]

(ঢং ঢং করে চারটা বা

শশাঙ্ক ঃ বাঃ এদের বাড়ির কাছের এই রাস্তাটা বেশ ভাল। পড়ন্ত বে
রোদ পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে। যাই একটু বেড়িয়ে আসি

শ্যামল ঃ মামা, কোথায় যাচ্ছেন?

শশাঙ্ক ঃ কে, শ্যামল? কোথায় গিয়েছিলে?

শ্যামল ঃ কেরোসিন তেল আনতে। বিশাল লাইন। দুটোর সময় ল
দিয়ে এই পেলুম।

শশাঙ্ক ঃ যাই একটু বেড়িয়ে আসি। তোমাদের এই রাস্তাটা ভারি সুন

শ্যামল ঃ হ্যাঁ মামা। এটা সোজা গঙ্গার দিকে চলে গেছে। একটু দাঁড়া
আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। টিনটা বাড়িতে ছুটে দি
আসি। বেশি দেরি হবে না। ওই তো আমাদের বাড়ি।

শশাঙ্ক ঃ যাও, যাও, আমি দাঁড়াচ্ছি। [শ্যামল চলে গেল]
ছেলেটি ভারি মিশুকে। বোধয়নকে বললুম চল না বেড়ি
আসি। কোন উৎসাহই দেখাল না। কী নিয়ে মেতে আছে ত
বুঝলাম না—নাঃ ছেলেটাকে ওরা নষ্ট করে ফেলল। আরে বা
ছেলে মানুষ করা কি অত সহজ! ত্যাগ চাই, নিষ্ঠা চাই।

শ্যামল ঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যামলের প্রবেশ) চলুন মামা !

শশাঙ্ক ঃ তুমি যে হাঁপাচ্ছ !

শ্যামল ঃ খুব জোর দৌড়েছি তো পন পন করে। ছোলা খাবেন মামা?

শশাঙ্ক ঃ কোত্থেকে পেলে ?

শ্যামল ঃ মা আমার জন্যে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। নিয়ে এসেছি।

শশাঙ্ক ঃ দাও, দাও, ভিজে ছোলা অমৃত সমান।

শ্যামল ঃ ওই দেখুন। গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে— রোদ পড়ে কি রকম চক্‌মক্ করছে দেখুন মামা।

শশাঙ্ক ঃ একি শ্যামল, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কাঁদছ কেন বাবা? এসো এই ঘাটের পৈঠেটায় কিছুক্ষণ বসি। তোমার হাতের ছোলাগুলো সব রাস্তায় পড়ে গেল। এস বস। হঠাৎ কী হল তোমার?

শ্যামল ঃ হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল এই রকম এক বিকেলে বাবা চলে গিয়েছিলেন হঠাৎ। ওই যে শ্মশান। ওই যে ধোঁয়া উঠছে। সেই দিন গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে আছি—চিতার ছাই নিয়ে, আর দেখছি টলটলে জলে শেষ বেলার রোদ খেলা করছে। ছাইগুলো ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে গেল। জানেন মামা, বাবা আমাকে শ্যাম বলে ডাকতেন। মৃত্যুর আগের দিন রাতে আমাকে হঠাৎ কাছে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, শ্যাম জীবনে কখনও ভয় পাবি না। ভয়ই হল মৃত্যু!

শশাঙ্ক ঃ ঠিক বলেছেন। আসল কথাটাই তোমাকে বলে গেছেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদে বারে বারে ওই একটি কথাই আছে। অভী! ভয়শূন্য হও। পৃথিবীতে যে কজন মানুষ বড় হয়েছেন তাদের সকলেরই ছিল দুর্জয় সাহস। তোমাকেও বড় হতে হবে শ্যামল। দেশে অনেক দিন তেমন সাহসী লোক জন্মাননি।

শ্যামল ঃ কী করলে বড় হওয়া যায় মামা?

শশাঙ্ক ঃ মহাপুরুষের জীবনী পড়ে নিজের জন্যে একটা আদর্শ বেছে নাও। নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। মিশিয়ে ফেলো না। সব সময় মনে রাখবে, তুমি এখানে এসেছো কিছু একটা করে যাবার জন্যে। স্বামীজী বলতেন, একটা দাগ রেখে যা। আমাদের বেঁচে থাকার সময়টা বড় কম শ্যামল, ওই দেখ সূর্য ডুবলেই দিন শেষ। দিনের কাজ তাই দিনে দিনেই করে ফেলতে হবে। কাল করা যাবে বলে কিছু ফেলে রেখো না।

শ্যামল ঃ আমার মা বলেছেন, তুই পড় খোকা। যতদূর পড়া যায় তুই ততদূর পড়ে যা। আমি গয়না বাঁধা দিয়ে, লোকের বাড়ি কাজ করে টাকার ব্যবস্থা করব। আমার মার বড় কষ্ট। শীতকালে হাঁপানিটা বেড়ে যায়। ভোরবেলা উঠে রাঁধতে হয়। সকলের মা কেমন সুখে আছে, আমার মা'রই যত কষ্ট !

শশাঙ্ক ঃ তাই তো তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি বড় হবই। মাকে বলবে একটু ধৈর্য ধর মা, আমি আসছি। তখন তোমার কত সুখ। শ্যামল, আমাদের বড় মাও ভীষণ কষ্টে আছেন।

শ্যামল ঃ বড় মা?

শশাঙ্ক ঃ আমাদের দেশমাতা।

শ্যামল ঃ মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বেশ সন্ন্যাসী হয়ে যাই। গেরুয়া পরে হাতে মস্ত একটা লাঠি নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। ওই দেখুন ওপারে সূর্য নেমে পড়েছে। মন্দিরের চুড়োটা কেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কি মজা !

শশাঙ্ক ঃ তুমি বাইরে সন্ন্যাসী হবে কেন। মনে সন্ন্যাসী হও, ত্যাগী হও, লোভশূন্য হও, ভালবাসতে শেখ। সংসারে থেকেই তো তোমাকে সংসারের সমাজের কাজ করতে হবে। তোমাকে রাতেও চলতে হবে, দিনেও চলতে হবে।

শ্যামল ঃ মামা ভগবান কি আছেন?

শশাঙ্ক ঃ নিশ্চয়ই আছেন ! সব ভালর মধ্যে, 'সু'-এর মধ্যেই ভগবান। তোমার মধ্যে আছেন। আমার মধ্যে আছেন। সকলের মধ্যে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন ! তাঁকে জাগাতে হবে। ভাল কাজের মধ্যে, ভাল চিন্তার মধ্যে তিনি জেগে ওঠেন। তোমাকে আমি যাবার সময় কিছু ভাল বই দিয়ে যাব। পড়বে। দেখবে পৃথিবীটা কত বিশাল!

শ্যামল ঃ আরতি হচ্ছে। যাবেন মামা—মন্দিরে যাবেন?

শশাঙ্ক ঃ চল চল। আজকের সন্ধেটা ভারি সুন্দর। তুমি থাকাতে আরো সুন্দর হয়েছে।

[দৃশ্য পরিবর্তন—বাড়ির বাইরে]

মনোরমা ঃ কি গো দাদা। তুমি এখানে একা চুপ করে বসে আছ?

শশাঙ্ক ঃ তোদের এই বারান্দাটা বেশ ভাল। মাঝে মাঝে মানুষের একটু নির্জনে থাকা ভাল, মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মনোরমা ঃ ভেতরে চল। খাবার দেওয়া হয়েছে।

শশাঙ্ক ঃ চল। ক'টা বাজল?

মনোরমা ঃ সাড়ে ন'টা বোধ হয়।

(কুকুরের ডাক)

[শশাঙ্কর প্রবেশ—বাড়ির ভেতরে]

উদয়ন ঃ আসুন দাদা। আপনি যেন কেমন মিইয়ে পড়েছেন। বলুন, আপনাদের আর্মির গল্প একটু বলুন।

সোমা ঃ জান মা, মামার বোধহয় রাগ হয়েছে।

মনোরমা ঃ রাগ হবে কেন? তোরা রাগাবার মত কিছু করেছিস?

সোমা ঃ দাদার সঙ্গে একবার খালি ঝগড়া করেছি।

মনোরমা ঃ কী নিয়ে ?

সোমা ঃ ওই শয়তানটা আমার পেনসিল নিয়ে নিয়েছে।

মনোরমা ঃ আবার শয়তান বলছ !

বোধয়ন ঃ কান ধরে তুলে দাও না মা !

মনোরমা ঃ তোমরা একদম অসভ্যতা করবে না। ভীষণ মাথা ধরেছে আমার। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

উদয়ন ঃ মাথার আর কী দোষ। সিনেমা দেখলেই তো তোমার মাথা ধরে। চিরকালের রোগ।

মনোরমা ঃ রবিবার হলেই তো তোমার তাস ! অবেলায় খাওয়া, রাতে পেটভার, অম্বল, সোমবার সকালে মেজাজ সপ্তমে। ওটাও তোমার চিরকালের রোগ।

সোমা ঃ মা, দাদাকে সাবধান কর। পা দিয়ে তখন থেকে আমার পায়ে খোঁচা মারছে।

মনোরমা ঃ (উত্তেজিতভাবে) এই তোরা উঠে যা তো। দুজনেই বেরো। আমাদের একটু শান্তিতে খেতে দে।

উদয়ন ঃ দাদা ! একটু গল্প-টল্প বলুন। ওয়ারের গল্প।

শশাঙ্ক ঃ এই তো ওয়ার। এখানেই হচ্ছে। শোনার চেয়ে দেখাই তো ভাল।

উদয়ন ঃ একে ওয়ার বলে না। এ হল স্কারমিশ, অনবরতই হচ্ছে।

শশাঙ্ক ঃ এইভাবেই তো যোদ্ধা তৈরি হয়। আমি উঠি।

মনোরমা ঃ সেকি! তুমি তো কিছুই খেলে না।

শশাঙ্ক ঃ আমি সন্ধেবেলা একগাদা ভিজে ছোলা খেয়েছি।

উদয়ন ঃ ছোলা? পেলেন কোথায়?

শশাঙ্ক ঃ ভালবেসে একটি ছেলে আমাকে খাইয়েছে, তার নাম শ্যামল।

উদয়ন ঃ ও, শ্যামল। নাইস্ বয়। আমার ছেলেটা যদি শ্যামলের মত হত!

শশাঙ্ক ঃ (হেসে) হ্যাড আই বিন দি উইংস অফ এ ডাভ। আমার যদি পাখির মত দুটো ডানা থাকত। তাহলে উড়তে পারতুম। গুড নাইট!!

শশাঙ্ক ঃ (গান গাইছে)—

যদি কুমড়োর মত ডালে ধরে রত

পান্তুয়া শত শত

ওরে যদি কুমড়োর মত ডালে ধরে রত

(হাসি)

সব এই সি তো আয়ে গা—তাই না উদয়ন। সব এই সি হো যায় গা। তুমি সারাদিন তাস পিটবে। তোমার স্ত্রী যাবে সিনেমায়। তোমার ছেলেমেয়েরা একা একা বাড়িতে হুল্লোড় করবে। ছেলে মানুষ হচ্ছে। আবার ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে আপনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ভোগ বিলাসিতা প্রাচুর্য সব আছে, তবু এই শূন্য উদ্যান। ঠিক আছে, বুঝবে বুঝবে, কত ধানে কত চাল !

[দৃশ্য পরিবর্তন]

শশাঙ্ক ঃ শুয়ে পড়ি, গুড নাইট। আহা এক আকাশ তারা। আরে, আজ আবার একফালি চাঁদ উঠেছে।

★ ★ ★ ★

মনোরমা ঃ (চিৎকার) শঙ্করীর মা, শঙ্করীর মা।

শঙ্করীর মা ঃ যাই দিদি। কী বলছেন।

মনোরমা ঃ সবকটাকে ঘুম থেকে টেনে টেনে তোল তো। দাদা উঠেছে! দেখো তো ও পাশের বারান্দায়। ডাকা-হাঁকা মানুষ, সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন?

শঙ্করীর মা ঃ (দূর থেকে) বারান্দায় নেই গো দিদি।

মনোরমা ঃ ঘরের দরজা ঠেলে দেখ তো।

শঙ্করীর মা ঃ দেখেছি। ঘর খালি গো দিদি—

মনোরমা ঃ সে কি ? গেল কোথায়। বাথরুমেও তো নেই। চা হয়ে গেল। তুমি একবার সদরটা দেখ তো।

উদয়ন ঃ হল কি ! দাদা মিসিং ? এই নাও ! চিঠিটা পড়।

মনোরমা ঃ কার চিঠি—

উদয়ন ঃ তোমার দাদার। খাবার টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল।

মনোরমা ঃ চিঠি কেন ? দাদা কোথায় ?

উদয়ন ঃ পড়ছি, শোন। মনু, যেখান থেকে এসেছিলুম, সেখানেই ফিরে চললুম। যাবার পথে খুশিদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার চেষ্টা করব। জানি না থাকা যাবে কি না ! আমরা পুরোনো আমলের মানুষ। আধুনিক কালটাকে বুঝতে পারি না বলেই বোধহয় সহ্য করতে পারি না। ভেবেছিলুম ভাগ্নের মধ্যে মামাকে দেখতে পাব। দেখলুম ভবিষ্যৎহীন একটি মানুষকে। তোমাদেরও মনে হল জেগে ঘুমোচ্ছ। আমাকে খুব অসহ্য মনে হবার আগেই সরে পড়লুম। ঘরের টেবিলের উপর শ্যামলের জন্যে কয়েকটা বই আছে। ডেকে দিয়ে দিও। এনেছিলুম আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীর জন্যে। ওদের কাছে এ জিনিসের কোন দাম নেই। আমাকে ভাল না বাসলেও তোমাদের জন্যে ভালবাসা রইল ! শুনলে তো চিঠিটা ? ফানি ম্যান ! নাটকীয় প্রবেশ, নাটকীয় প্রস্থান। সাবেক কালের মাস্টার মশাইদের মত মেজাজ।

মনোরমা ঃ যাকে বোঝা যায় না সেই তো আমাদের কাছে মজার লোক। ফানি ম্যান।

নতুন ফসল

'খাচ্ছে দাচ্ছে আর বড় বড় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। কেবল কথা আর কথা। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।'

'কাদের কথা বলছেন স্যার?'

অধ্যাপক বটকৃষ্ণ বসু খুব বেজার মুখে চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশে কাগজপত্র ছড়ানো। অধ্যাপক বসু একজন গবেষক। আমরা তাঁর ছাত্র। সহকারীও বলা যেতে পারে। আমরা নিজেরা কিছু করি না। করার স্বাধীনতাও নেই। যা করতে বলা হয় তাই করি। যখন কিছু করার থাকে না তখন অধ্যাপক বসুর সামনে বসে তাঁর আক্ষেপ শুনি। পৃথিবীর তাবৎ বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার। যেমন এই এখন হচ্ছে। বিকেলের চা-পর্ব শেষ হয়েছে। একটু আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের ল্যাবরেটারি সংলগ্ন জমিতে কাজে ব্যস্ত ছিলুম। এখনও হাতে পায়ে কাদা লেগে আছে। মাথার চুলে গাছের পাতা আটকে আছে। হাত-পা পরিষ্কার করা হয়নি। চা শেষ করে আবার জমিতে নামতে হবে। যতক্ষণ না সূর্য ডুবছে ততক্ষণ আমাদের কাজ চলবে। গবেষণায় আমরা সফল হতে পারব কি না জানি না। যদি সফল হতে পারি তা হলে কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই সাফল্য সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

অধ্যাপক বসু একটা ছুরি হাতে উঠে দাঁড়ালেন, 'কাদের কথা বলছি? সেই সব অপদার্থ বিজ্ঞানীদের কথা, যারা শুধু পৃথিবীতে সেমিনার আর বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই করছে না। কটা বাজল?'

'আজ্ঞে চারটে।'

'ফাইন। এখনও ফুল টু আওয়ার্স কাজ করার সময় আছে।'

আমাদের দুই সহকারীকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক বসু আবার জমিতে এসে নামলেন। বিঘে খানেক জায়গার ওপর আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সবজি নিয়ে। প্রথম যেদিন আমরা কাজে যোগ দিতে এলুম সেদিন অধ্যাপক বসু আমাদের যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই রকম, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন এসেছে। বনমানুষ মানুষ হয়েছে। অসভ্য মানুষ ক্রমশ সভ্য হয়েছে। মোমবাতি থেকে ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। লাসার

স্টিম আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘোড়ায় টানা ট্রামের জায়গায় ঠ্যাং উঁচু ইলেকট্রিক ট্রাম এসেছে। স্টিম ইঞ্জিনের জায়গায় ইলেকট্রিক লোকো এসেছে। দু-চাকার ফোর্ডের আমলের মোটরগাড়ির জায়গায় আধুনিক আমলের হাওয়া গাড়ি এসেছে। মানুষ বেলুন ছেড়ে জেট বিমানে উঠেছে। রকেট ছুটছে গ্রহান্তরে। টোটকা আর ভুতুড়ে ওষুধের জায়গায় পেনিসিলিন এসেছে। গাদা বন্দুকের জায়গায় স্টেনগান, ব্রেনগান, মেশিনগান এসেছে। গাইডেড মিসাইল এসেছে। বিজ্ঞানের সব রাস্তা ধরেই মানুষ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা দিকে বিজ্ঞানের কোনও দৃষ্টিই নেই। বিবর্তনের ধারাও সেখানে মিইয়ে গেছে। যে বিবর্তনে বাঁদর মানুষ হয়েছে, পৃথিবীতে জেব্রা, জিরাফ এসেছে, যে বিবর্তনে ডায়নাসর, টেরোড্যাকটিল পৃথিবীতে এসেছে চলে গেছে সেই বিবর্তন শাকসবজির জগৎকে ভুলে বসে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে আলু আলুই আছে। ঢেঁড়স ঢেঁড়সই থেকে গেছে, ঝিঙে ঝিঙে হয়ে গ্যাঁট মেরে বসে আছে কতকাল ! লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, করলা, চিচিঙ্গা, পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, বিট, শালগম, যা ছিল তাই আছে, যেমন ছিল তেমনি আছে ! সবজির জগতে কোনও পরিবর্তন আসেনি, কোনও পরিবর্তন আনার চেষ্টাও হয়নি। সেই একঘেয়ে সবজি বছরের পর বছর আমরা খেয়ে চলেছি। খেতে বাধ্য হচ্ছি। ক্যাটকেটে ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা। পাতে দেখলেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। ভেণ্ডির তরকারি। দেখলেই পরিবেশনকারীকে ঠেঙাতে ইচ্ছে করে। ঝিঙে! যেমন তার চেহারা, তেমনি তার স্বাদ। পোস্তর সঙ্গে পড়লে তবে মুখে তোলা যায়। অন্য আর কিছু জোটে না বলে আমরা খেতে বাধ্য হই। সবজি না খেলে ভিটামিনের অভাবে মারা পড়ার ভয়ে খেতে হয়। তা না হলে সাধ করে কেউ পেঁপের ঝোল, কুমড়োর ঘ্যাঁট, বিট গাজর মুলো খেত না। কাবাব, কিমাকারি, ফিশফ্রাই, প্রনকাটলেট, রেজালা, রোগনজুস, রেশমীকাবাব খেয়ে মনের আনন্দে থাকত। মাছ, মাংস, ডিম খান না এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয়। তাঁদের মুখের আর মনের কি অবস্থা! মানুষের গো-যন্ত্রণা।

বৈজ্ঞানিক বসুর বক্তৃতা শুনে সেদিন আমাদের চোখ খুলে গেল। সত্যিই তো। সবজির জগতে কোনও পরিবর্তনই আসেনি। সেই আলু, সেই পটল, সেই ঢেঁড়স, সেই বেগুন। আমাদের তা হলে কী করতে হবে! নতুন নতুন সবজি তৈরি করতে হবে। একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে নতুন নতুন আনাজ আনতে হবে। যা পৃথিবীর মানুষ আগে কখনও দেখেনি।

নানা ধরনের গাছে আমাদের বাগান ভরে গেছে। খোন্তাখুন্তি, কোদাল

গাঁইতি, সার, ওষুধ এই নিয়ে সকাল থেকে সন্ধে আমাদের হিমশিম অবস্থা। এ-সব কাজে সবার আগে যা থাকা চাই তা হল ধৈর্য আর কল্পনা।

বৈজ্ঞানিক বসু, আমাদের স্যারের কল্পনার খুব জোর। আগামী পাঁচ বছরে আমরা যে-সব নতুন ফসল উৎপাদন করব তার একটা তালিকা সব সময় চোখের সামনে ঝুলছে। উচ্ছে আর পটল এক করে একটা নতুন আনাজ হবে, নাম উপটল। স্বাদ কেমন হবে জানা নেই তবে অনুমান করা গেছে। সামান্য তিক্ত। উচ্ছের মতো অতটা নয়। কুমড়োর তরকারিতে আলু দিতেই হয়। কুমড়োও মাটিতে ফলে আলুও তাই। দুটোকে এক করে নতুন একটা আনাজ—কুমড়ালু। ঝিঙের সঙ্গে চিচিঙ্গে মিলিয়ে ঝিচিং। শিমের সঙ্গে কড়াইশুঁটি এক করে সিশুঁটি। পালম আর পুঁই দুটোই ভিটামিনে ভরপুর শাক। দুটোকে এক করে পাপুঁই। শশা আর করলা এক করে হবে শরলা। মাংসে পেঁয়াজ আর রসুন আলাদা আলাদা দিতে হয়। না দিলে চলে না। দুটোকে এক করে আমরা উৎপাদন করব পেঁসুন। লাউ আর পেঁপে এক করে হবে লাপেঁ। নাম শুনেই মনে হচ্ছে ফরাসি কোনও আনাজ। খেতে নিশ্চয়ই বিলিতি বিলিতি হবে। প্রফেসারের ধারণা গাছটা নিশ্চয়ই লতানে হবে। গাজর আর বিট এক করে হবে গাবিট। বাঁধা আর ফুল এক করে বাঁফুল কপি। উঃ কী কাণ্ড যে হবে, ভাবা যায় না!

তেঁতুলগাছে ডাক্তার

বিধানবাবুর গলায় ট্যাংরামাছের কাঁটা আটকে গেল। বড়মামা যখন গেলেন তখন হাঁ করে ভদ্রলোক দাওয়ায় বসে আছেন। স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছেন প্রাণপণে। বড়মামা গিয়ে ধমক দিয়েই দু'জনকে সরিয়ে দিলেন।

বিধানবাবুর নারকেল-তেলের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। তেমনি মেজাজ। সকলকেই ধমকে কথা বলেন। একমাত্র বড়মামাকেই ভয় করেন। বিধানবাবু বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন। বড়মামা টর্চ ফেললেন। যেন কুয়োর মধ্যে আলো নেমে গেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বেতের মোড়ায় বসে বললেন, 'মানুষের কী ভাগ্য! সেলুনওলা সুকুমার লটারিতে সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়ে গেল।'

বিধানবাবুর চোখ ছানাবড়ার মতো। বড়মামার কথা শুনে আঁক করে একবার আওয়াজ করে পর পর তিনবার ঢোক গিললেন সাপে ব্যাঙ গিললে যেমন হয়, গলার কাছে তিনবার ঢেউ খেলে গেল।

বড়মামা বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'সাড়ে চার লাখ! ওরে বাবারে!'

'এখন কেমন লাগছে?'

'নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ডাক্তার, আমার পোড়া বরাতে একটা পাঁচটাকাও উঠল না!'

'গলার কাঁটার কী খবর?'

'কাঁটা? কী কাঁটা?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাজ শেষ। গলার কাঁটা তিন ঢোকে সরে গেছে।

সেই বিধানবাবু আন্দামান থেকে বড়মামাকে একটা সুন্দর কোকো কাঠের ছড়ি এনে দিয়েছেন।

হঠাৎ বড়মামার আজ কী খেয়াল হল, আমাকে বললেন, 'ছড়িটা নামা।'

আলনায় ঝুলছিল একা একা। নামিয়ে আনলুম। বড়মামার কুকুর লাকি টেস্ট করতে চাইল। বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমাকে ধমকাতে লাগল।

'আজ ছড়ি নিয়ে মর্নিং ওয়াক হবে?'

'ইয়েস।'

'কেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে?'

'আজ্ঞে না। এ কোমর সে কোমর নয়। আজ একটু স্টাইলে বেড়াব। সায়েবদের মত, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে।'

চুড়িদার পাজামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবি। হাতে ছড়ি। সাঁই সাঁই করে হাঁটছেন বড়মামা। পথের ধারের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। হাঁটার মত হাঁটা। পেছন পেছন আমি প্রায় ছুটছি। বেশিরভাগ কুকুর ভয়ে সরে যাচ্ছে। দু'একটা অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ-গোঁ করছে।

আজকে বড়মামার চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম। জ্বল-জ্বল করছে। এই সময় অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেড়াতে বেড়াতেই ডাক্তারি করতে হয়। কারুর হার্ট মাছের মতন খাবি খায়, কারুর হাই সুগার। ঘুরতে-ফিরতে চিকিৎসা। করলার রস খান। নুন বন্ধ করুন। তেল-ঘি ছেড়ে দিন।

আজ আর রুগীরা বড়মামাকে ধরতেই পারছেন না। তিনি বুলেটের মত ঠিকরে বেড়াচ্ছেন।

গাছের ডালে হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠল। অসময়ের কোকিল। চক্কর মারতে মারতে বড়মামা থেমে পড়লেন।

'আহা-শুনছিস?'

'কোকিল। অসময়ের কোকিল।'

'কী মিঠে তান'

বটতলার বেদিতে আসন নিলেন। মুখে একটা অন্যভাব।

'পাখি প্রকৃতির জীব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাক ছাড়া।'

'ঠিক। কাক পাখির মধ্যে পড়ে না। যেমন তিমি মাছের মধ্যে পড়ে না।'

'যদিও তিমি মাছ বলে।'

'তিমি কেন মাছ নয়?'

'ডিম হয় না, বাচ্চা হয়।'

'একশোর মধ্যে একশো। কিছু একটা করতে হবে।'

'ইট কী গুলতি মারা চলবে না।'

'রাইট! খাঁচায় বন্দী করা চলবে না।'

'আপনার কথা কে শুনবে বড়মামা?'

'শোনাতে হবেরে পাগলা। পৃথিবীর সব কাজ ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রথমে চাই প্রচার। তারপর চাই সংগঠন। চাই জনমত।'

'আপনার লোকবল নেই।'

'ঠিক। আমার ঢাল নেই তরোয়াল-রাইফেল নেই। কিন্তু বৎস আমার মনোবল আছে। সেই বলে আমি পৃথিবীর সমস্ত খাঁচার পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দেব!'

'পৃথিবী যে অনেক বড় বড়মামা!'

'সো হোয়াট! আমি ছোট করে নোব। নে ওঠ, আমার ভেতরটা ছটফট করছে খাঁচার পাখির মত।'

'চায়ের জন্যে?'

'নারে মুখ্য। ছটফট করছে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অ্যাকশন! অ্যাকশন!'

ফেরার পথে ছড়ি বড়মামার কাঁধে। ভীষণ উত্তেজিত। লম্বা-লম্বা পা ফেলছেন যেন রণপা পরে হাঁটছেন। এক জায়গায় একগাদা মুরগি ছাইগাদায় খাবার খুঁজছে! ফুলকো ফুলকো একঝাঁক বাচ্চা।

'বড়মামা মুরগি কী পাখির মধ্যে পড়ে?'

'না। জেনে রাখ, পাখির সংজ্ঞা হল, যাহা আকাশে ওড়ে তাহাই পাখি। যেমন পরান-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় অবিরত ছটফট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, কেবল কী খাই, কী খাই করে। আর যেই পড়তে বসব অমনি বই-এর পাতা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায়।'

'ও হল তোমার মন। আমি বলছি প্রাণের কথা। আমাদের দেহে দুটো পাখি। এক হল প্রাণ পাখি। খুব দামি, বড়দরের পাখি। আর ছোটদরের পাখি হল মন পাখি। অনেকটা বদরি, মুনিয়া কি টুনটুনির মত। ভীষণ ছটফটে। এ সব বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছি। বাগানে বকুলতলার বাঁধানো বেদিতে বড়মামা ধপাস করে বসে পড়লেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জোরে জোরে হাঁটলুম কেন?'

'তা তো জানি না।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন! তারপর চোখ খুলে বললেন—'পাখি!

'পাখি তো হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে? কিছুই হয়নি। এইবার হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে। চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ অ্যাট হোম।'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখে আয় তো মেজ কোথায়?'

সারা বাড়ি একবার চক্কর মেরে এলুম। মেজমামা বাথরুমে। তারস্বরে চিৎকার চলেছে, যদা যদা হি ধর্মস্য...বেদিতে বড়মামা। আমাকে দেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়...কোথায়?' বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'বাথরুমে যদা যদা হি...'

'তার মানে ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা।'

'কখন ঢুকেছেন তা তো জানি না।'

'ধ্যার বোকা। যদা যদা তো ধরতাই। নে, ওঠ পা টিপে টিপে।'

'কোথায় বড়মামা?'

'প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। মামানুসরঃ।'

গীতা, আর নিজের প্রতিভা মিলে তৈরি, মামাকে অনুসরণ মামানুসরঃ।

পেছন পেছন দোতলার বারান্দা। দক্ষিণে মেজমামার ঘর। পা টিপে টিপে চলেছি আমরা চোরের মত। বেশ ভয় ভয় করছে। মেজমামার ঘরের সামনে বিশাল খাঁচা মুনিয়া আর বদরিতে মিলে গোটা দশেক হবে। কিচিরমিচির করছে। বড়মামা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন।

'তোর সেই গল্পটা মনে আছে?'

'কোন্‌টা?'

'হাজী মহম্মদ মহসীন।'

'হ্যাঁ, নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তারপর বিধবার ছেলেকে মিষ্টি ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।'

আজ আমিও তাই করব। আমি আর এক মহসীন। জগৎবাসীকে, ওহে তোমরা পাখি মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দাও বলার আগে আমি এদের মুক্ত করে দোব

'বড়মামা, ও কাজ করবেন না। মেজমামার পাখি, মাসিমার আদরে মানুষ মাসিমা আপনাকে শেষ করে দেবেন।'

'রাখ তোর মাসিমা। জগাই-মাধাই কলসির কানা মেরে শ্রীচৈতন্যকে থামাতে পেরেছিল? পারেনি মানিক। ধর্মের জয়।'

খাঁচার দরজা খুলে বড়মামা নাটক করার মত করে বললেন, 'যাও বিহঙ্গ। অনন্ত নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

অত সুন্দর করে বললেন, কিন্তু একটিও বিহঙ্গ খাঁচার দরজা গলে বেরিয়ে এল না।

বড়মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'সব ব্যাটাকে বাতে ধরেছে !'

'বড়মামা, দরজা বন্ধ করে দিন। যে কোনো মুহূর্তে মাসিমা এসে পড়বেন। আর মেজমামা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ হবে।'

আমার কোনো কথাতেই বড়মামার কান নেই। পাখিদের বললেন, 'যাও বিহঙ্গ মুক্ত আকাশে মেল স্বাধীন ডানা।'

তেমনি পাখি। বোকার মত খাঁচাতেই নাচতে লাগল। খোলা দরজা নজরেই আসছে না।

বড়মামা বললেন, 'ঠিক আমাদের অবস্থা। স্বাধীন করে দিলেও স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছে না। অপ্রস্তুত মন।'

'ছেড়ে দিন বড়মামা।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দোবই।'

খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে পাখি বের করে আকাশে ওড়াতে লাগলেন। এক একটাকে নীল আকাশের দিকে ছুড়ছেন আর বলছেন, 'যাও যাও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।'

প্রথম পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করে নিচের উঠোনে পড়ে গেল। একটা বসে ছাদের কার্নিশে। কেউই বেশিদূর উড়তে পারেনি। একটু উড়েই যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। শেষ পাখিটাকে বড়মামা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ। এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালি পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বদ্ধ জীবনই বেশি ভালবাসে।' পাখি আঙুলে এক একবার ঠোকর মারছে, আর বড়মামা রেগেমেগে জ্ঞানের কথা বলছেন। কোনোরকমে বের করেছেন খাঁচা থেকে, আকাশে ওড়াতে যাবেন, এমন সময় মাসিমা। হাতে চায়ের কাপ।

'এই নাও তোমার চা। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। একি, একি, কী করছ?' পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বড়মামা যেন স্কুলে আবৃত্তি কম্পিটিশনে কবিতা পড়ছেন—

'স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।'

পাখি এক চক্কর উড়ে সাঁ করে মেজমামার ঘরে। মাসিমা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মেজদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!' মেজমামার শুরু আর শেষ এক। 'যদা যদা হি' চলছিল, থেমে গেল। বেরিয়ে এলেন। পিঠে ধবধবে সাদা ভিজে তোয়ালে। চুলে মুক্তোর দানার মত কয়েক বিন্দু জল। সারা গায়ে বিলিতি সাবানের ভুরভুরে গন্ধ।

মাসিমা হাঁউপাঁউ করে বললেন, 'যদা যদা করছ, ওদিকে ধর্মের কী গ্লানি দেখ। সব পাখি গন।'

'তার মানে?'

'ইনি সব ধরে ধরে উড়িয়ে দিলেন।'

'সে আবার কী? এতকাল টাকা ওড়াচ্ছিলেন। টাকা থেকে পাখিতে চলে এলেন! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তুমি ওড়ালে না উড়ে গেল? এই তো আমি দানাপানি দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলুম।'

বড়মামা বীরের মত হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন উড়বে, সাধের ময়না।'

'তুমি কি আরম্ভ করেছ। সব পাখি উড়িয়ে দিলে?'

'আমি ত্রাতা। সব বন্দী পাখির স্বাধীনতা আমি ফিরিয়ে দেবো।'

'তুমি উন্মাদ।'

'শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই তাই ভেবেছিল প্রথমে।'

মেজমামার ঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ হল। বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি কী একটা মুখে করে ঘর থেকে বেরিয়েই নেচে নেচে বড়মামার ঘরের দিকে চলে

গেল। মাসিমা একঝলক দেখেই, 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল,' বলে পেছন পেছন ছুটলেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্যপারটা কী আবার আমার চটি? তিন জোড়া চিবিয়ে শেষ করেছে।'

মাসিমা ছুটন্ত অবস্থায় বললেন, 'চটি নয়, চটি নয়, পাখি।'

'অ্যাঁ, পাখি!' মেজমামাও ছুটলেন। 'কুকুর আবার বেড়াল হল কবে থেকে?'

বড়মামার বীরভাব কেটে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁরে সত্যিই লাকি পাখি ধরেছে?'

'না বড়মামা, লাকি পাখি ধরেছে।'

'তুই দেখলি?'

'হ্যাঁ।'

'ইডিয়েট।'

'কে বড়মামা? আমি?'

'না, তুই না, আমি। আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়। চল্ চল দেখি পাখিটাকে বাঁচানো যায় কি না।'

বড়মামার ঘরে খাটের তলায় লাকি। মুখে পাখি। মাসিমা আর মেজমামা উঁকি মেরে দেখছেন। তলা থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। ডানার ঝটপটানি। ঘরে ঢুকেই বড়মামা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন 'লাকি!!' দরজা-জানলা কেঁপে উঠল। 'বেরিয়ে এসো। কাম আউট।'

লাকি বেরিয়ে এল গুটি গুটি। মুখে সেই পাখি। কী সুন্দর কচি কলাপাতার মত গায়ের রঙ। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললুম। অমন সুন্দর একটা পাখি চোখের সামনে মারা যাবে? আমার কান্না শুনে লাকি ঘাঁউ করে উঠল। লাকি কান্না সহ্য করতে পারে না। ভীষণ বিরক্ত হয়। ডাকামাত্রই পাখিটা মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। ঝটপটিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল, পারল না। ঠিকরে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কোণে।

পাখির চারপাশে গোল হয়ে আমরা। ছোট্ট পাখি নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে ছোট্ট বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। এবার মাসিমাও কেঁদে ফেললেন। মেজমামাও ফোঁস ফোঁস করছেন। এমনকি লাকিও কেঁদে ফেলেছে। ওর কান্নার শব্দ আমি বুঝি খাবার না পেলে হ্যাংলা ঠিক এইরকম কুঁ-কুঁ করে কাঁদে।

বড়মামা ধরা ধরা গলায় বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল করে ফেলেছি আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।

মাসিমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুমি আর কী করবে বড়দা? তুমি তো আর ভগবান নও। ওর গলায় ফুটো করে দিয়েছে।'

'ভগবানের কাছে শক্তি ধার করে আমি ওর ফুটো মেরামত করব। তোরা পরে আমাকে গালাগাল দিস। এখন শুধু প্রার্থনা কর!'

বড়মামার ডাক্তারি শুরু হল। বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় তুলোর বিছানা। বিছানায় পাখি। দুপাশে ডানা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডানার তলায় নরম তুলতুলে শরীরে সরু ছুঁচ দিয়ে পুট করে একটা ইনজেকশন দিলেন। ছোট্ট ফুটো দুটোর মুখে কী একটা লাগালেন। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

বড়মামা বললেন, 'কুসী, বিছানায় আমার মশারিটা ফেল। পাখি এখন বিশ্রাম করবে। লম্বা ঘুম। লাকি তুমি বাইরে যাও।'

বারান্দায় সভা বসেছে।

বড়মামা বললেন, 'মেজ, খাঁচায় কটা পাখি ছিল?'

'এখন আর তা জেনে লাভ কী?'

'রাগারাগি নয়। হাতে হাত মেলাও ব্রাদার! সব কটাকে ধরতে হবে। ধরে খাঁচায় পুরতে হবে। নইলে তোমার অপদার্থ পাখিরা বেড়ালের পেটে যাবে।'

'দায়ী তুমি।'

'অবশ্যই। বিচার পরে হবে। আগে কাজ। চল পাখি ধরতে বেরোই। সেই ছোট খাঁচাটা কোথায়?'

'পাখি ধরবে তুমি? পাখি ধরা অত সহজ?'

'বেশ আমি আমার দলবলকে ডাকছি।'

উঠে গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন, 'ও তোমার হাসপাতালের চেলাচামুণ্ডার কাজ নয়।'

'হাসপাতালে করছি না বৎস। ফোন করছি অনামিকা সংঘে। যে ক্লাবের আমি প্রেসিডেন্ট। এখুনি দু-ডজন ছেলে আসবে। শুরু হবে চিরুনি অভিযান।' মেজমামা উঠে চলে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'বুঝলে, চ্যালেঞ্জ করে গেল। ঠিক হ্যায় মেজো। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নিলুম। ডু-অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি জমজমাট। বিভিন্ন মাপের, মেজাজের, বয়সের দু-ডজন সৈনিক বড়মামার ভাষায়। মাসিমার ভাষায় ভূতপ্রেত! মহাদেবের চেলা।

নেতা অতনু বললে, 'পাখি ধরতে হবে। কী পাখি ? ডাকপাখি ? বক ? হরিয়াল? তাহলে গোটা দুই বন্দুক নিয়ে আসি।'

বড়মামার হাত উঠল বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে। 'অতনু, আমি ধরতে বলছি, মারতে বলিনি। ভাল করে শুনে নাও। খাঁচার পাখি। আমাদের পোষা পাখি।'

'পোষা বলছেন কী করে? পোষা পাখি পালায় না।'

'পালাবে কেন? আমি ধরে ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার ধরবেন কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে।'

'বেশ, আপনার ইচ্ছে। তা কী জাতীয় পাখি?'

'বদরি, মুনিয়া।'

'কোথায় তারা আছে?'

'আশেপাশেই আছে। কারুর বাড়ির ছাদে। গাছের ডালে। ঘুলঘুলিতে।'

'অসম্ভব। আমরা ধরব কী করে?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, তবে না তুমি অতনু।'

'বেশ। চব্বিশটা খাঁচা কেনার দাম দিন।'

'এগারোটা পাখির জন্য চব্বিশটা খাঁচা, তোমার মাথা...'

'না মাথা খারাপ নয়। চব্বিশটা ছেলে চব্বিশটা দিকে যাবে। পাখি একটা হলেও চব্বিশটা খাঁচা লাগত। হিসাব মেলাতে হলে আরো তেরটা পাখি কিনে উড়িয়ে দিন। ওয়ান পাখি পার খাঁচা। মাছের জন্য যেমন ছিপ, পাখির জন্যে তেমনি খাঁচা।'

'অনেক পড়ে যাচ্ছে অতনু।'

'তা তো যাবেই সুধাংশুদা। খাঁচার পাখিকে খাঁচায় ফেরাতে চান। সেরকম বুঝলে নতুন পাখি কিনুন।'

'না না। সে তো পরের পাখি। আমরা চাই ঘরের পাখি।'

'তাহলে শ-তিনেক টাকা ছাড়ুন। যত দেরি করবেন, তত দেরি হয়ে যাবে!'

বড়মামার কম্পাউন্ডার সুধন্যকাকু পাশে বসেছিলেন। বয়স্ক মানুষ। এক মাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল। তিনি বললেন, 'খাঁচা কী হবে? বড় ঠোঙাতেই কাজ হয়ে যাবে। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট এই বাজারে। আর তা না হলে প্লাস্টিকের থলে।'

'কী যে বলেন!' অতনু বিরক্ত হল। একি আপনার ওষুধের পুরিয়া? যে কাজের যা। কথায় বলে খাঁচার পাখি। পাখির খাঁচা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া ফিরবে না।'

অনেক বচসার পর তিনশো টাকা নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেল। সুধন্যকাকু মাসিমাকে বললেন, 'এঃ বড়বাবু বাজে পাল্লায় পড়ে গেলেন। একেই বলে খাল কেটে কুমীর আনা!'

মেজমামা ঠিকই বলেছিলেন। জল অনেক দূর গড়াল। খাঁচা কেনার টাকা নিয়ে পাখি ধরার দল হাওয়া হয়ে গেল। বড়মামা সন্ধানে বেরিয়ে বেপাত্তা।

একটা বাজল, দুটো বাজল। মাসিমা ঘরবার করছেন। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। রোগীরা অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। সুধন্যকাকু সাইকেলে সারা পাড়া চক্কর মেরে এসে, এক গেলাস গ্লুকোজ-গোলা জল খেয়ে খালি ডিসপেনসারিতে রোগীদের পেট টেপা বেঞ্চে চিৎপাত। চারটে বাজল। সাড়ে চারটের সময় মেজমামা কলেজ থেকে এসে গেলেন। মশারির ভেতর আহত পাখি মশগুল হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মেঝেতে লাকি ধনুকের মত পড়ে আছে. ছাদের ঠাকুরঘরে দুটো মুনিয়া ঢুকেছিল। মাসিমা আবার খাঁচায় ভরে দিয়েছেন।

মেজমামা বললেন, 'এই বড়দার জন্য আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন একটা দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো একটা কাণ্ড ঘটায়নি। একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।'

সুগ্রীব মানে আমি। আমার কী দোষ? কী বলব। তর্ক করে লাভ নেই। মেজমামা বললেন, 'চল হে, বড়বাবুকে খুঁজে আনি। পাখির শোকে সন্ন্যাসী।'

মেজমামার হাতে টর্চ। একটু পরেই সন্ধে হবে। আর হবে লোডশেডিং। ভূতুড়ে অন্ধকার। আলো আসতে রাত দশটা তো বটেই।

উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্যায়লাপাড়া, ধামাপাড়া, ঘোরা হয়ে গেল। খেলার মাঠ থেকে ছেলেরা চলে গেল। পথঘাট নির্জন হয়ে আসছে। মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজতে শুরু করেছে। বৃদ্ধরা রক ছেড়ে উঠে গেছেন। কোথাও পাত্তা নেই। না বড়মামার, না পাখিধরা দলের।

মেজমামা রেগে বললেন, 'ওরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছে।'

'কেন মেজমামা?'

'যে জায়গার পাখি, সেই জায়গা থেকে ধরে আনতে গেছে। মনে নেই, সেই একবার চা কিনতে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল? প্ল্যান করেছিল গোমুখ থেকে গঙ্গাজল আনবে। তোমার বড়মামা সব পারে। ডেনজারাস লোক।'

কথায় কথায় আমরা সাঁই বাগানের কাছে এসে গেছি। বহুকালের পুরনো বাগান। ভেতরে একটা দিঘি আছে। এক সময় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে গেছে। বেওয়ারিশ বাগান। দিনের বেলা দিঘিতে সব নাইতে আসে। কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধের দিকে বড় কেউ একটা আসে না। ভয় পায়। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভল।

মেজমামা বললেন, 'এই সেই সাঁইবাগান। এক সময় কি ছিল আজ কী হয়েছে!'

কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের ঝোপঝাড় দুলে উঠল। সাদামত কী একটা জিনিস ঝোপঝাড় ভেঙে তীরবেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে! ভয়ে মেজমামার কোমর জড়িয়ে ধরেছি, 'মেজমামা বাইসন!'

বড়মামা শিখিয়েছিলেন ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। সে শিক্ষা ভুলিনি।

ধড়াস করে একটা শব্দ হল। মানুষের গলা। চোখ খুললাম। রাস্তায় মুখ থুবড়ে কে একজন পড়ে আছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সন্ধের ঝাপসা আলোয় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মেজমামা টর্চ ফেললেন। চেনা গেল আমাদের রামুদা। গঙ্গার ধারের বটতলায় ইটালিয়ান সেলুন যার। মাঝে মাঝে আমাদের চুল ছাঁটেন।

মেজমামা ডাকলেন, 'রামু, রামু!'

রামুদা বললেন, 'ওরে বাবারে। আর করব না। আমায় ধরো না।' টর্চের আলো না সরিয়ে মেজমামা বললেন, 'কে ধরবে?'

'ভূত!'

'আমরা মানুষ। মুকুজ্যে বাড়ির শান্তি।'

রামুদা পিট পিট করে তাকালেন।

'কোথায় তোমার ভূত?'

রামুদা উঠে বসলেন, 'ওই যে ওখানে তেঁতুলগাছে।'

'কী করতে গিয়েছিলে ওখানে?'

'ছাগল খুঁজতে।'

'ভূত দেখেছ?'

'না গলা শুনলুম। শুধু গাছের ওপর থেকে বললে, 'ব্যাটা রামু আমাকে নামা।'

'তোমার নাম ধরে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ—স্পষ্ট—তিনবার।'

'ব্যাটা বলেছে?'

'হ্যাঁ মেজবাবু, ব্যাটা বলেছে। আর আমি বাঁচব না। ভূতে ডাকলে আর বাঁচে না মানুষ।'

'তোমার মাথা! চলো দেখি কোন্ গাছ?'

'মেজবাবু, আমি আর নাই বা গেলুম। গরিব মানুষ।'

'চলো! আমার গলায় পইতে আছে। ভূতে কিছু করতে পারবে না।'

'অঘোর কত্তা। বুড়ো পয়সা দিত না বলে ভোঁতা খুর দিয়ে দাড়ি চেঁচে খুব ফটকিরি বুইলে দিতুম। সেই অঘোর কত্তা তেঁতুলগাছে বাসা বেঁধেছে।'

'তোমার মুণ্ডু। ভূত কি পাখি? চলো আমার সঙ্গে।' পাঁচিল টপকে বাগানে। 'আজ আর আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না, মৃত্যুই লেখা আছে কপালে।' শীতের ভোরে গঙ্গা স্নান করা গলায় রামুদা রামনাম করছে।

তেঁতুলতলায় আসতেই মগডাল নড়ে উঠল। বড়মামার ট্রেনিং, চোখ বুজিয়ে ফেলেছি, ঘাড় মটকাক—আমি দেখছি না!

'গাছের ওপর থেকে ক্ষীণগলায় কে বললে, 'কে আছো?'

'মেজমামা হেঁকে বললেন, 'কে? বড়দা?'

গাছ্ বললে, 'কে? মেজো?'

'ওখানে কী করছ তুমি?'

'পাখি ধরতে ডালে উঠেছি ভাই। আর নামতে পারছিনে!'

'বেশ করেছ। ওইখানেই থেকে যাও। পাকলে আপনিই খসে পড়বে।'

'ভাইরে! একি রাগারাগির সময়? আমাকে নামা ভাই।'

'নামা ভাই!' মেজমামা রেগে উঠলেন, 'নামাবো কী করে? নিজে নিজে নেমে এস।'

'সে আমি পারবো না। পারলে অনেক আগেই নেমে পড়তুম।'

'আমরা কীভাবে নামাবো? এ কী সহজ কাজ?'

'ফ্রায়ার ব্রিগেডে খবর দে ভাই। আর পারছি না। সারাটা দুপুর শালিকে ঠুকরে ঠুকরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছে। এখন মশা আর লাল পিঁপড়েতে ছিঁড়ছে! এইবার সত্যি সত্যি আমি ধুম করে পড়ে যাব।'

ফোন করার পনের মিনিটের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। দমকল আসছে। পেছন পেছন ছুটে আসছে সারা পাড়া—'আগুন লেগেছে! আগুন!'

দমকলের অফিসার গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই পাগল?'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'পাগল নয়, বড়মামা।' মেজমামা আমার মুখ চেপে ধরলেন। বললেন, 'তেঁতুলগাছের মাথায় চড়ে বসে আছে।'

'এ মশাই সেই পাগলাটা। কাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় চড়ে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা আমাদের নাচিয়ে মেরেছে।' মেজমামা বললেন, 'এ সে নয়, অন্য আরেকটা!'

'সে আমরা দেখলেই চিনতে পারব।'

দমকল ছুটলো সাঁইবাগানের দিকে। পেছন পেছন ছুটছে সারা পাড়ার লোক। বাচ্চারা চেল্লাচ্ছে, 'দমকল আসছে, দমকল।'

বড়মামা নামলেন। পাড়ার লোক চিনতে পেরেছে, 'আরে এ যে আমাদের ডাক্তারবাবু গো!' হই হই ব্যাপার। সার্চলাইটের আলোয় সাঁইবাগানে উৎসব লেগে গেছে। ঘুম ভাঙা হনুমানেরা হুপহাপ করছে। পিঁপড়ের কামড়ে আর লজ্জায় লাল বড়মামা বাড়ি ঢুকেই বললেন, 'এ তোদের ষড়যন্ত্র।'

মেজমামা বললেন, 'তার মানে? এই ভজঘট করে নামানোটা ষড়যন্ত্র হল?'

'অবশ্যই হল। তোরা ঘণ্টা বাজাতে দিলি কেন? কেন তোরা নীরবে নিঃশব্দে আমাকে নামালি না? সারা পাড়ার লোক কেন জানবে আমি গাছের মাথায় আটকে গিয়েছিলুম? জানিস আমাকে প্র্যাকটিস করে খেতে হয়।'

পরের দিন সকালে আরও মজা—কে যেন খবরটা সংবাদপত্রে ছেপে দিয়েছে—

'তেঁতুলগাছে ডাক্তার'

শাপে বর হল। বড়মামার পসার বেড়ে গেল। চেম্বারে রোগী ধরে না। তবে উল্টো পসার। কেউ নিজেকে দেখাতে আসেননি। সবাই ডাক্তারকে দেখতে এসেছেন।

একদা এক বাঘের গলায়

মেজমামা আর মাসিমা পেছনের আসনে। আমি সামনে বড়মামার পাশে। গাড়ি চলেছে। বড়মামার হাত বেশ তৈরি হয়ে গেছে। এই সেদিন গাড়ি থেকে 'এল' প্লেটটা খোলার অনুমতি মিলেছে।

'বাঃ, তোমার হাত তো বেশ তৈরি হয়ে গেছে হে।'

মেজমামা পেছন থেকে নাকিসুরে বললেন। সুর নাকি হবার কারণ আছে। মেজমামা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একা একা। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, 'কাম শার্প। ব্রাদার ইল।' বড়মামা ছুটলেন, সঙ্গে গেলেন কম্পাউন্ডার সুধন্যদা। পরের পরের দিন ফিরে এলেন মেজমামাকে নিয়ে। খুব কাহিল অবস্থা মেজমামার। কোমরভাঙা দ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মুখে লেগে আছে করুণ বীরের হাসি। কারুর বারণ না শুনে সমুদ্রে চান করতে নেমেছিলেন। ঢেউ এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। ডুবেই যেতেন। চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু পিনাকী রুদ্র সেই সময় পুরীতেই ছিলেন। সমুদ্রে চান করছিলেন সুইমিং কস্ট্যুম পরে। মেজমামার নড়া ধরে ডাঙায় তুলে এনেছিলেন। তুলতে তুলতেই নোনাজল খেয়ে মেজমামার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মত হয়ে গিয়েছিল। সেই নোনাজলের চুবুনিতে সুর নাকি হয়ে গেছে। বড়মামা বলেছেন, 'সারতেও পারে, না-ও সারতে পারে।'

মেজমামা বললেন, 'আহা, হাত আর দুটো পা তোমার বেড়ে সুরে বলছে, যেন কনসার্ট।'

মাসিমা বললেন, 'অ্যাতো আস্তে চালাচ্ছ কেন? এর চেয়ে বেশি স্পিড দেওয়া যায় না?'

মেজমামা বললেন, 'গাড়িটা বৃদ্ধ হয়েছে তো, তাই ধীরে চলছে। সেকেন্ডহ্যাণ্ড গাড়ি চলছে যে এই না কত! না, না, ধড়ফড় করে দরকার নেই, তুমি ধীরেই চলো। খরগোশও গন্তব্যে পৌঁছোবে, কচ্ছপও গন্তব্যে পৌঁছবে। একদিন আগে আর পরে।'

আড়চোখে বড়মামার দিকে তাকালুম। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'খরগোশ পৌঁছোতে পারেনি, কচ্ছপই পৌঁছেছিল। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দি রেস।'

মাসিমা বললেন, 'পেছন থেকে অন্য সব গাড়ি হুশ হুশ করে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় আমাদের দিকে তাকাতে তাকতে যাচ্ছে। হাসছে। আমার ভীষণ অপমান লাগছে।'

'তুমি চোখ বুজে থাকো। চোখ খুলো না। চিড়িয়াখানা এলে আমি বলে দোব।' মেজমামা মুচকি হেসে বললেন।

'দাদা, তোমার ভয় করছে বুঝি?' মাসিমা ভালমানুষের মতো বড়মামাকে প্রশ্ন করলেন।

বড়মামা বললেন, 'একটা অ্যাকসিডেন্ট হোক, এই বোধহয় চাইছিস কুসী?'

মেজমামা বললেন, 'সে ভয় নেই বড়দা। তুমি তো একপাশ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছ। তোমার মার নেই। অ্যাকসিডেন্ট হবে কী করে? একে বলে ওয়াকিং-স্পিডে গাড়ি চালানো।'

বড়মামা শাঁত করে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ পাশে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, গাড়ির জলতেষ্টা পেয়েছে?'

বড়মামা হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে নেমে যান। পেছনে বসে বসে আরাম করে কাছা ধরে টানা চলবে না, চলবে না। যেখানে একতা নেই, সেখানে গতিও নেই। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। সেই পতনই এইবার হবে, দয়া করে আপনারা দুজনে নেমে যান।'

মেজমামা বললেন, 'কী হবে রে কুসী। বড়বাবু যে খেপে গেছে।'

'তুমি কান ধরে ক্ষমা চাও মেজদা। বলো, আর করব না। অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আমি একা কেন? যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুইও কিছু কম যাস না। তুইও ক্ষমা চা।'

'আমার সঙ্গে বড়দার অন্য সম্পর্ক, স্নেহের সম্পর্ক। তুমি মেজদা চিরটা কাল সুযোগ পেলেই বড়দাকে খোঁচা মারো।'

বড়মামা বললেন, 'তোমরা কেউই কম যাও না। মিটমিটে শয়তান। গাড়িটা কেনার আগে তুই কুসী সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলিস। ঠ্যালাগাড়ি, ছ্যাকরাগাড়ি, যার পাঁঠা সেই বুঝুক, এই সব অনেক চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়েছিলে। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষ্মণ। মেজ তখন তালে তাল বাজিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। সব এক-একটি ধানি-লঙ্কা।'

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। তোমার দয়ার শরীর। সাক্ষাৎ মহাদেব। বাবা ভোলানাথ মাইনাস জটাজুট। ক্ষমা করে দাও প্রভু!'

'না, সম্ভব নয়। এ তো ক্ষমা চাওয়া নয়, এ এক ধরনের ব্যঙ্গ।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি আর-একবার আমাদের চান্স দিয়ে দ্যাখো বড়দা, এবার আমরা একেবারে চুপচাপ থাকব।'

'চুপ করে থাকলেই হবে! ভেতরে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপ পুষে রাখবে, বাইরেটা সব

সাজানো-গোছানো, চকচকে, চমৎকার। ওতে আমি আর ভুলছি না ভাই। তোমরা নেমে ট্যাকসি-ম্যাকসি ধরে বাড়ি চলে যাও। আমি আর আমার ভাগনে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।'

'কেন, তোমার ঈশ্বর!'

'আঃ, চুপ করো মেজদা। তোমার স্বভাবটা বড় বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্ষমা চাইলে যে-মানুষ ক্ষমা করতে জানে না, সে কেমন মানুষ?'

বড়মামা বললেন, 'বনমানুষ! তোমরা হলে সব শহর-মানুষ, আমি একটা শিম্পাঞ্জি।'

'শুধু শুধু তোমরা কেন ঝগড়া করছ বলো তো। দিন-দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে? বড়দা, তুমি স্টার্ট দেবে কি-না বলো, এবার কিন্তু আমি নিজ-মূর্তি ধরব। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ভাল হবে?'

আড়চোখে মাসিমার দিকে তাকিয়ে বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। চিউয়িংগাম খাবার মতো মুখ নড়ছে। তার মানে কিছু একটা বলতে চান। না বলতে পেরে চিবিয়ে গিলে ফেলছেন। এবার সব চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মেজমামা হুঁ হুঁ করে গানের সুর ভাঁজছেন। গানটা আমার চেনা। বিশেষ সুবিধের গান নয়। বাণীটা বড়মামার চেনা হলে গাড়ি আবার থেমে পড়ত।

মেজমামার হুঁ হুঁ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভাব এসে গেছে। বড়মামা মেজমামাকে চাপা দেবার জন্যে কার-স্টিরিওর দিকে হাত বাড়ালেন। মেজমামা গান থামিয়ে বললেন, 'তুমি কি টেপ চালাচ্ছ? তাহলে কীর্তন নয়, ইংরিজি কিছু চালাও।'

মাসিমা বললেন, 'রবীন্দ্রসংগীত নেই?'

আমি বললুম, 'বড়মামা, আধুনিক আছে?'

বড়মামা হাত টেনে নিতে নিতে বললেন, 'আমার কাছে কিছুই নেই।'

মেজমামা বললেন, 'অ, ওটা তাহলে তোমার ডামি-স্টিরিও। খোলস আছে, ভেতরে মাল নেই, ফর শো। কত কায়দাই জানো তুমি! তোমার গাড়িতে ইঞ্জিন আছে তো?'

মাসিমা বিরক্তির গলায় বললেন, 'আঃ, মেজদা, কেন বকবক করছ। এই একটু আগে চুক্তি হল, চুপচাপ বসে থাকবে, ফ্যাচর ফ্যাচর করবে না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?'

বড়মামা বললেন, 'স্বভাব কুসী, স্বভাব। স্বভাব সহজে পালটানো যায় না। দোয়েল কি কোয়েলের মতো ডাকতে পারবে? ছাগল কি ভেড়ার মত গুঁতোতে পারবে? গোড়া কি হাতির মতো স্থির ধীর হতে পারবে?'

'শুনছিস কুসী, শুনছিস? গাড়িধারী বড়লোকের বোলচাল শুনছিস?'

মাসিমা বললেন, 'বড়দা, তুমি গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই। অষ্টপ্রহর গজকচ্ছপের লড়াই আমার অসহ্য লাগে।'

মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা এই আমি চুপ করছি। স্পিকটি নট। তবে আমিও বলে রাখছি, গাড়ি আমি কিনবই। নতুন গাড়ি, ধ্যাদ্ধেড়ে সেকেন্ডহ্যান্ড নয়। তখন কিন্তু আমি এই গাড়িতে পা দোব না। এর ত্রিসীমানায় আসব না। সাধলেও না।'

'যখন কিনবে তখন দেখা যাবে, আগেই এত আস্ফালন ভাল নয়। তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, আমার জানা আছে। তোমার পাসবই তো আমার কাছে।'

'ধার করব।'

'কে তোমাকে ধার দেবে?'

'ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক দেবে।'

বড়মামা হঠাৎ বললেন, 'কে গ্যারান্টার হবে?'

'কেন, তুমি। তুমি হবে। তুমি ছাড়া আমার কে আছে?'

বড়মামা হাহা করে হেসে উঠলেন, 'এই জন্যেই তোকে আমি এত স্নেহ করি। বুদ্ধিশুদ্ধি তোর একদম পাকেনি। বুড়োখোকা।'

মাসিমা বললেন, 'আমি বুঝি তোমার কেউ নই?'

মেজমামা বললেন, 'কেন অভিমান করছিস, তুই ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার।'

ঠ্যাং ঠ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং ঘণ্টা বাজিয়ে উলটো দিক থেকে একটা দমকল আসছে। বড়মামা বাঁ পাশে সরতে সরতে বললেন, 'সেরেছে, দমকল যে রে বাবা!'

মেজমামা বললেন, 'ভয় পেও না বড়দা, দমকল আগুন নিবিয়ে ফিরছে। যতই ঘণ্টা বাজাক সে, তাড়া নেই। স্টিয়ারিং সোজা রাখো।'

বড়মামা শব্দ করে হেসে, গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তায় তুললেন। ডানদিক দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা দৈত্য-লরি বেরিয়ে গেল। বড়মামা চমকে বাঁ পাশে আমার দিকে কাত হয়ে পড়লেন। মেজমামা পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'জয় ঠাকুর, প্রাণে বাঁচলে হয়।'

মাসিমা বললেন, 'ভয় পেও না, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।'

বড়মামা বললেন, 'ঘাবড়াও মাত। তোমরা শুধু লরিগুলোকে একটু কনট্রোলে রাখো।'

মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'কীভাবে?'

'পেছনে যারা আছ, তারা পেছনে তাকিয়ে থাকো। লরি এলেই আমাকে জানাবে।'

'তোমার মাথার ওপর একটা আয়না আছে। কী জন্যে আছে?'

'আয়না দেখে বোঝা যায় না, আসছে না যাচ্ছে। গুলিয়ে যায়।'

গাড়ি চলেছে গুড়গুড় করে। আর কতদূর! ভীষণ ভয় করছে। বড়মামা গাড়ি চালাচ্ছেন, না কোদাল চালাচ্ছেন, বোঝা শক্ত।

॥ ২ ॥

বড়মামা গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তাটা তেমন চওড়া না হলেও পাকা। নতুন পিচ পড়েছে। দু'পাশে বিশাল দুই কারখানার জেলখানার মতো পাঁচিল। বাঁ পাশের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড। আমরা যেদিকে চলেছি সেই দিকে তীর-চিহ্ন। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ফুলবাগানের ঝিল। উদয়াস্ত মাছ ধরার ব্যবস্থা। পাশের জন্যে যোগাযোগের ঠিকানা, বোকুবাবু, ছোকোন ঘোষের চায়ের দোকান, কুলতলি। দশটা-পাঁচটা। পাশের হার, দশ টাকা।

স্টিয়ারিং নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে, বড়মামার নজরে সাইনবোর্ডটা পড়ে গেল। গাড়ি আড় হয়ে ঢুকছিল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বাঁ দিকে হেলে, আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, বড়মামা বললেন, 'পড় তো, পড় তো। কী লেখা আছে পড় তো!'

গাড়ির পেছন দিকে দুম করে কী একটা ধাক্কা মারল। সামান্য একটু দুলে উঠলুম আমরা। দুমদাম করে নানা রকমের জিনিস পড়ে যাবার শব্দ হল। শুধু পড়ল না, পড়ে গড়াতে শুরু করল। মাছ ধরা নোটিস আর পড়া হল না। সব কটা মাথা ঘুরে গেল পেছন দিকে। একটা সাইকেল-রিকশা। পেছনের কাচে ভাসছে রিকশা-চালকের মুখ। আরোহী আসছিলেন একগাদা বিভিন্ন মাপের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো নিয়ে। ধাক্কার ঝাঁকুনিতে সব ছিটকে পড়েছে। গড়গড়িয়ে কিছু চলে গেছে নর্দমায়। কালো জলের ওপর ভাসছে সাদা চকচকে কৌটো।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নেমে পড়লেন। গাড়ির গায়ে চোট লেগেছে, আর রক্ষা আছে? গাড়ি হল বড়মামার প্রাণ। বড়মামা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলুম। পেছন দিকে তাকিয়ে মাসিমা আর মেজমামা বসে রইলেন।

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে পেছনের বাম্পারটা দেখে বললেন, 'এটা কী হল?'

রিকশাচালক বললে, 'আমার কী দোষ, আপনি হঠাৎ থামলেন কেন?'

'সামনের গাড়ি থামলে পিছনের গাড়িকেও থামতে হয়। গাড়ি চালাবার ব্যাকরণ না শিখেই সিটে উঠে বসেছ?'

'আপনিও ব্যাকরণ তেমন জানেন বলে মনে হচ্ছে না। জানলে এমন দুম করে মোড়ের মাথায় থেমে পড়তেন না।'

রিকশার আরোহী নামার জন্যে হাঁচড়পাঁচড় করছেন। পারছেন না অ্যালুমিনিয়ামের হাজার হাজার কৌটো নড়চড়া বন্ধ করে দিয়েছে। দেখে মনে

হচ্ছে কৌটো-মানব। মুখটি শুধু জেগে আছে। কৌটো-মানব বললেন, 'আপনার আর কী হয়েছে! রিকশার ধাক্কায় মোট-গাড়ির কিছু হয় না। ক্ষতি হল আমার। নর্দমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমার এত দামের কৌটো খানায় ভাসছে।'

বড়মামা ঢুলুঢুলু চোখে খানার দিকে তাকালেন। কারুর ক্ষতি হলে বড়মামার বুক মুচড়ে ওঠে। মেজমামা নেমে এসেছেন। অবাক হয়ে আরোহীকে দেখছেন। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, 'কী করে আপনি অমন হলেন?'

'কী রকম?'

'অমন কৌটোময়, কৌটোসমৃদ্ধ! কে আগে উঠেছে? আপনি আগে, না কৌটো আগে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল? দেখলেই তো বোঝা যায়। আগে আমি, তারপর কৌটো।'

'কী করে নামবেন?'

'হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন। সে এক সমস্যা মশাই। আমাকে না নামালে, আমার ক্ষমতা নেই নামার।'

'কেউ যদি না নামায়, সারা জীবন ওইভাবে বসে থাকতে হবে? আপনার তো মশাই আচ্ছা লোভ!'

'লোভের কী দেখলেন?'

'কৌটোর লোভ অবশ্য আমারও আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক কম। আপনি একেবারে গোটা একটা কৌটো-কারখানা কিনে এনেছেন।'

উঁহু, উঁহু, বর্তমান কাল নয়, অতীত কাল হবে। কিনেছিলুম, এখন চলেছি ফেরত দিতে।'

'এত কৌটো সব আবার কিনে ফেরত দেবেন? বড় দুঃখ হচ্ছে।'

'দুঃখ! একটা কৌটোরও আপনি ঢাকনা খুলতে পারবেন না। যদি পারেন, আমার কান কেটে ফেলে দোব।'

'সে কী? কোথা থেকে কিনেছিলেন?'

'কে এক মশাই, ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, কুলতলিতে দুঃস্থ মহিলা সমিতি খুলেছেন, এ হল সেই সমিতির কারখানায় তৈরি ডিফেকটিভ মাল। মহিলা সমিতির নামে চালাতে চেয়েছিল। কৌটোর ধর্ম কী?'

'আজ্ঞে টানলেই ঢাকনা খুলবে।'

'এ সব হল বিধর্মী কৌটো।'

'ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে আপনার সামনে দণ্ডায়মান।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি? আপনিই সেই পরোপকারী ডাক্তারবাবু?'

বড়মামা লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার।'

'আমাকে নমস্কার করে আর লজ্জা দেবেন না, আপনাকেই আমার শত কোটি প্রণাম করা উচিত। কী জিনিস বানিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মানুষের প্রাণ ভরে রাখলে, যমেও ছুঁতে পারবে না। দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। রিকশাটাকে ছেড়েই দি। মাল সব গাড়ির পেছনে ভরে দেওয়া যাক। নর্দমায় যে কটা ভাসছে, নিজেই গুনে নিন। আমার এদিককার হিসেব ঠিক আছে।'

মোটাসোটা চৌকো ধরনের ভদ্রলোক কৌটোর স্তূপ ঠেলে রিকশা থেকে নেমে এলেন। মালকোঁচা মারা ধুতি। গায়ে শার্ট। বুক-পকেটে অ্যাতো কাগজপত্র ঠেসেছেন, ফেটে বেরিয়ে না যায়। গায়ের রঙ মিশকালো। দু'পাটি ঝকঝকে সাদা নিম-দাঁতন করা দাঁত। হাসিটা সেই কারণেই বড় স্পষ্ট।

বড়মামার গাড়ির বুটে একে একে সব ঢুকে গেল! ভদ্রলোক পেছনের আসনে জাঁকিয়ে বসলেন। এমনভাবে বসেছেন, যেন নিজের গাড়ি। মেজমামা মাঝখানে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে মাসিমা আর মেজমামার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার নাম শ্রীআশুতোষ দাস। মল্লারচকে আমার মিষ্টির দোকান। এই রিসেন্টলি বেলের মোরব্বার কারবারে নেমেছি। ভেরি গুড মার্কেট। মিডল ইস্ট, জাপান, হংকং, হনলুলু, কামস্কাটকা, ফ্রান্স্, আমেরিকা, জার্মানি, কোথায় না, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এ দাস্স বেঙ্গলকুইন ইন থিক সিরাপ।'

কথা শেষ করে হাত খুললেন। মেজমামার মুখের চেহারা পাল্টে গেল ভদ্রলোকের মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে। বেশ শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছে, অথচ মিষ্টির কারবারি! বড়মামার গাড়ি চলেছে ফুরফুর করে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে মনে হবে বড়দাদু ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খাচ্ছেন।

মেজমামা শুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়ের শিক্ষাদীক্ষা?'

আশুবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যৎসামান্য। বায়ো কেমিস্ট্রিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করার পর কিছুকাল একটা ফার্মে চাকরি। ভাল লাগল না দাসত্ব। কী করি, কী করি? পিতার মৃত্যুর পর বসে পড়লুম দোকানে। ইনস্টিট্যুট অব কেটারিং টেকনোলজি থেকে একটা ডিপ্লোমা বাগিয়ে আনলুম। শিক্ষার কি শেষ আছে। মিষ্টির জগতকেও যে কত কী দেবার আছে!'

'মিষ্টির জগৎকে কী আর দেবেন? সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, রাজভোগ লেডিকেনি, সীতাভোগ, মিহিদানা, চমচম, দধি, পয়োধি। নতুন আর কী দেবার আছে?'

'আছে, আছে মুকুজ্যেমশাই। সব বিভাগেই রিসার্চের প্রয়োজন আছে। দুব্বোঘাসের কচুরি খেয়েছেন?

'দুব্বোঘাসের কচুরি? জীবনে শুনিনি।'

'দয়া করে আমার দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। দুব্বোর মতো খাদ্যগুণে ভরপুর জিনিস আর দুটো নেই। গোরুরা জানে। সেই দুব্বোকে আমি বাঙালির নোলায় ফেলেছি।'

'নোলা শব্দটা পাল্টানো যায় না আশুবাবু?'

'কেন বলুন তো? নোলা কি খুব খারাপ শব্দ। নোলা শব্দটা মনে হয় ইংরেজি নলেজ শব্দ থেকে 'এসেছে।'

'প্লিজ, আপনি আর ভাষাতত্ত্ব নাড়াচড়া করবেন না। মিষ্টান্ন-তত্ত্বেই আপনার নলেজকে ধরে রাখুন। আজেবাজে কথা শুনলে আমার ভীষণ ইরিটেশান হয়। সারা গা লাল-লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে ওঠে।

'অ্যাঁ, সে কী? অ্যালারজি! ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক দাগ ওষুধ খেয়ে নিলেই তো সেরে যায়!'

'খেয়ে দেখেছি। কিস্যু হয় না।'

'কিসে সারে তা হলে?'

'গোটা-দুই চড় কষাতে পারলেই সেরে যায়।'

'তা হলে থাক, ভাষাতত্ত্ব না আলোচনা করাই ভাল। গায়ে লাল-লাল চাকা-চাকা হয়েছে।'

'না, এখনও তেমন হয়নি।'

'জয় গুরু!'

'হ্যাঁ, জয় গুরু। আপনার ওই খাবার নিয়ে রিসার্চের কথা বলুন। শুনতে বেশ ভাল লাগছে।'

'খেতে আরও ভাল লাগবে। কচুরিপানা দিয়ে একটা আইটেম বানিয়েছি। ক্ষীরকচুরি, অসাধারণ জিনিস। এক সপ্তাহ খেলে তিন কেজি ওজন বাড়বে। বাড়বেই বাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'ওজন কমাবার কিছু নেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাগজের সন্দেশ।'

'সে আবার কী'?

'উঃ, সে এক অসাধারণ জিনিস। ছানার কোনো ব্যাপার নেই। কাগজের মণ্ড চিনি দিয়ে ভাল করে পাক করে ছাঁচে ফেলে সন্দেশ। একটা খেয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চালিয়ে দিন। ধীরে ধীরে পেট ফুলতে শুরু করবে। এক সময় জয়ঢাক। বুক আর পেট এক হয়ে যাবে। কম-সে-কম দু'দিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'বাঃ, বেশ ভাল জিনিস বানিয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে আমাদের দেশের উপযোগী। এই আক্রা-গণ্ডা বাজারে সংসার চালাতে প্রাণান্ত। যে বাড়িতে দশ-বিশটা মুখ কেবল হাঁ-হুঁ করছে, সেখানে একটি করে এই সন্দেশ আর এক গেলাস কলের জল। দু' দিং সব ঠাণ্ডা।'

'খেতে কেমন হয়েছে?'

'অতি সুস্বাদু। একটা খেলে আর একটা খেতে ইচ্ছে করবে, তবে দুটো ন খাওয়াই ভাল।'

'এক-একটার দাম কত?'

'মাত্রা এক টাকা।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর সেই হাসিই হ সর্বনাশের কারণ। স্টিয়ারিং বাঁ দিকে বেমক্কা মোচড় খেল। গাড়ির সামনের ব দিকের চাকা গোঁত করে পড়ে গেল পথের পাশের খানায়। স্টার্ট বন্ধ হে গেল। বেশ বড় রকমের ম্যাজিক দেখাবার পর ম্যাজিশিয়ান দুটো হাত যেভা আকাশের দিকে তোলেন, বড়মামা সেই ভাবে হাত দুটো ওপরের দিকে তু চুপ করে বসে রইলেন।

আশুবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'কী হ স্যার?'

বড়মামা হালকা সুরে বললেন, 'অধঃপতন, পদস্খলনও বলা চলে।'

মাসিমা বললেন, 'এবার তা হলে কী হবে?'

বড়মামা বললেন, 'কিছুই না। কী আবার হবে! স্টার্ট তো অটোমেটিক ব হয়ে গেছে। আমার গাড়ি কত ভদ্র দেখেছিস কুসী! যেই দেখলে ভুল প পড়েছে, অমনি চলা বন্ধ হয়ে গেল। একেই বলে জেন্টলম্যান।'

মেজমামা বললেন, 'তোমার লেকচার বন্ধ করে গাড়িটা ব্যাক করে তোলা চেষ্টা করো।'

'অতই যদি সোজা হত ব্রাদার! এ তো আর মানুষ নয়, এ হল গাড়ি। পত আছে, উত্থান নেই।'

'তুমি এখন তা হলে কী করবে?'

'তোমাদের সকলকে নামাব। তারপর ঠেলে তোলাব।'

'আমরা একটা সভা করতে যাচ্ছি। আমি হলুম গিয়ে সেই সভার সভাপতি সভাপতি গাড়ি ঠেলবে?'

'কেন, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না! তুমিই না থেকে থেকে বলো, সেল্ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ । নাও, মেজাজ খারাপ না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো

আশুবাবুকে নিয়ে নেমে পড়ো। কিছুই না, একটু পেছন দিকে ঠেলে দিলেই রাস্তায় উঠে পড়বে।'

'আর তুমি কী করবে?'

'আমাকে তো স্টিয়ারিং-এ বসতেই হবে ভাই। আমি যে কাণ্ডারি।'

'এমন জানলে তোমার গাড়িতে কে উঠত বড়দা। তোমার মতো এমন ব্যাড ড্রাইভার কী করে লাইসেন্স পেল কে জানে! ঘুষের খেলা।'

'আমি খুব একটা খারাপ ড্রাইভার নই ব্রাদার। আশুবাবুর হাজারখানেক কৌটো গাড়িকে বেটাল করেছে। গাড়ি কাত হওয়ামাত্রই গড়িয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে। দোষ আমার নয়, দোষ গাড়ির নয়, দোষ হল কৌটোর। আর দোষ হল তাদের, যারা পথের পাশে গাড়ি ধরার জন্যে নর্দমা পেতে রাখে।'

পেছনের আসন থেকে মেজমামা, আশুবাবু নেমে পড়লেন। মেজমামা মানে গজগজ করে চলেছেন। আশুবাবুর মুখে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। এমন মুখ দেখলে তবেই মনে হয়, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও ঠেলব বড়দা?'

'না, তোকে আর ঠেলতে হবে না, তুই নেমে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা কর্। তোর ভুমিকা হল, ডিরেক্টার অব অপারেশান।'

সামনের আসন থেকে আমিও নেমে পড়লুম। আমাকেও তো একটা কিছু করতে হয়। সামনের দিক থেকে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে পেছোতে হবে। একটা পাশ নর্দমায় কেতরে গেছে। ডানপাশ উঁচু হয়ে আছে। মেজমামা দেখেশুনে বললেন, 'অসম্ভব ব্যাপার। ইমপসিব্‌ল্। সামনে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ঠেলব কী করে?'

আশুবাবু বললেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সবই সম্ভব। ইচ্ছে থাকলেই উপায় বেরোবে।'

'আমার ইচ্ছেও নেই, উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি তাহলে একাই ঠেলেন। অনেক রকম মিষ্টির ফিরিস্তি তো শোনালেন, সে সব নিজেও নিশ্চয় খেয়েছেন। ভেতরে অনেক হর্স-পাওয়ার জমা হয়েছে। আজ তার পরীক্ষা হয়ে যাক।'

আশুবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হোক। আমি এক হাতে পেছনের বাম্পার ধরে টেনে তুলে দোব। একটা গাড়ির ওজন আর কত হবে? বিশ-বাইশ মণ!'

'আমি আমার ওজন জানি মশাই। গাড়ির ওজন জানা নেই।'

'ওই বিশ-বাইশ মণই হবে।'

আশুবাবু ঘুরে পেছন দিকে চলে গেলেন। আজ আশুবাবুর কপালে গভীর

দুঃখ লেখা আছে। ব্যায়ামবীরের কাজ কি সাধারণ মানুষে পারে? হেরে ভূত হবে যাবেন। আর মেজমামা তালি বাজাবেন।

আশুবাবু প্রথমে মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন, 'জয় মহাবীরজি কি জয়!'

চোখ খুলে বললেন, 'আপনারা সেই মন্ত্রটা সমস্বরে, তালে তালে, সুর করে পড়তে পারবেন?'

মেজমামা বললেন, 'কোন্‌টা?'

'ওই যে, সেই শক্তিসঞ্চারী মন্ত্র, ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।

'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'খোকাবাবু, তুমি পারবে?'

খোকাবাবু বলায় ভীষণ রাগ হলেও বললুম, 'হ্যাঁ, পারব!'

'দেন স্টার্ট।'

ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।

আশুবাবুর ডান হাত বাম্পারে, বাঁ হাত কোমরে। ধীরে ধীরে টানছেন। গাড়ি দুলছে। 'আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।' ভদ্রলোকের মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

হঠাৎ কী হল কে জানে! বড়মামার গাড়ি ঘোঁত ঘোঁত করে দু'বার শব্দ করে উঠল। সামনের চাকা দুটো ফর্‌র ফর্‌র করে দুবার ঘুরে গেল অকারণে একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। চরকির মতো নর্দমার থকথকে কাদা ছিটকে উঠে মেজমামাকে স্প্রে-পেন্ট করে দিলে। সাদা জামা-কাপড় আর সাদা রইল না। হরিণের মতো চাকা-চাকা কালো দাগ সারা শরীরে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ফর্সা মুখে খাড়া উঁচু নাক। চোখে ব্রহ্মতেজ। পারলে গাড়িটাকে ভস্ম করে দেন। ওদিকে গাড়িটা ঝিকি মেরে হাতখানেক পেছিয়ে গেছে আচমকা আশুবাবু উল্টে পড়ে আছেন মাটিতে। করুণ সুরে বলছেন, 'আর করব না, কক্ষনো করব না, দোহাই মহাবীর, মাপ করো মহাবীর।' মাসিমা গাড়ির আড়ালে ছিলেন বলে বেঁচে গেছেন ছেটকানো কাদার হাত থেকে। মাসিমা ছুটে গিয়ে আশুবাবুকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুললেন। গাড়ি অবশ্য দু'ধাপ পেছিয়ে থেমে পড়েছে। নর্দমা থেকে চাকাও উঠে পড়েছে।

'জয় মহাবীরের জয়' বলতে বলতে আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার প্রণাম করলেন। মেজমামা ধীরে ধীরে বড়মামার দিকে এগোতে লাগলেন। দাঁত কিড়িমিড়ি করছে।

'এটা কী হল বড়দা?'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে অসসাধারণ দেখাচ্ছে রে! অনেকটা ডালমেশিয়ানের মতো, সাদার ওপর কালোর স্পট।'

'তোমার রসিকতা রাখো। এটা কী করলে তুমি?'

'আমি কেন করব রে বোকা। করেছে আমার গাড়ি।'

সাইকেলে রাগী-রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক আসছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'কী, হল কী? ভিড়িয়ে দিয়েছে বুঝি! বেশ ভাল করে চাবকে দিন মশাই। হাতে স্টিয়ারিং পড়লে, কাপ্তেনদের আর জ্ঞান থাকে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে না না, এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। মাথা গরম করবেন না।'

'অ, তাই নাকি, সেমসাইড হয়ে গেছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ভাই আর মেজ ভাইয়ে হচ্ছে। এখুনি মিটমাট হয়ে যাবে।'

'অ, ভাইয়ে ভাইয়ে হচ্ছে। সহজে মিটমাট হয়ে যাবে ভেবেছেন? কোথায় আছেন আপনি? কোর্ট অবধি গড়াবে। বছরের পর বছর চলবে। ভিটেতে পাঁচিল পড়বে। গাড়ির নাটবল্টু, খুলে খুলে ভাগাভাগি হবে। আছেন কোথায় মশাই? শোনেননি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

মেজমামা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ধ্যার মশাই। বাজে কথা না বলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। বাঙালির স্বভাবই হল সব ব্যাপারে নাক গলানো।'

ভদ্রলোক তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন, 'কী হল? কথাটা কী হল? খুব মেজাজ লিচ্ছেন মনে হচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে খুব বড়ছোট কথা হচ্ছে? জানেন আমি কে?'

মেজমামা রাগের মাথায় বলে ফেললেন, 'জানি জানি, লাটসাহেবের নাতি।'

'মুখ সামলে। খুব সাবধান।'

'আরে মশাই যান, সব করবেন আপনি!'

'দেখবেন তা হলে?'

'হ্যাঁ দেখব।'

বড়মামা নেমে এলেন, 'কী হচ্ছে কী? তিল থেকে তাল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিল মানে? এটা তাল। তালকে আমি তাল-তাল করে ছাড়ব।'

আশুবাবু দু'ধাপ এগিয়ে এসে বললেন, 'নাঃ আর সহ্য হচ্ছে না। এবার একটা হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে আশুবাবুকে থামিয়ে বললেন, 'মুখটা খুব চেন-চেনা মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, চেনাই তো! তোমার নাম সরোজ মাইতি না!

আজ থেকে বছর-তিনেক আগে মাঝরাতে তোমার অ্যাপেনডিক্স ফাটো-ফাটো হয়েছিল, মনে পড়ে? তোমার মা এসে কেঁদে পড়েছিলেন। সেই রাতেই তোমাকে অপারেশান করেছিলুম। অপারেশান না করলে মরে ভূত হয়ে যেতে এত দিনে! অপারেশানের ফি-টা অবশ্য এখনও বাকি আছে! তোমার বোলচাল তো বেশ ফুটেছে কার্তিক!'

লোকটি কেমন যেন থমমত খেয়ে গেল। মুখে আর কথা সরছে না। নাকি সুরে বললে, 'কে, ডাক্তারবাবু? চিনতে পারিনি স্যার। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন তো, চেহারাটা কেমন যেন পালটে গেছে। ক্ষমা করবেন স্যার। বড় কষ্টে আছি।'

'কষ্টে কেন?'

'ব্যবসাটা লাটে উঠে গেল স্যার।'

'কী ব্যবসা ছিল তোমার?'

'আজ্ঞে, তেলেভাজার দোকান।'

'তেলেভাজা! আহা, বড় ভাল জিনিস! একেবারে উঠে গেল! একটুও নেই?'

'আজ্ঞে না। এমনকি উনুনটাও ভেঙে গেছে।'

'উনুনটা ভাঙলে কী করে?'

'পাওনাদারে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'দোকানঘরটা আছে?'

'তা আছে। তালাবন্ধ পড়ে আছে।'

'কী কী তেলেভাজা হত? আলুর চপ হত?'

'ওইটাই আমার স্পেশাল আইটেম ছিল স্যার। বনগাঁ, বসিরহাট থেকেও খদ্দের আসত গাড়ি চেপে কার্তিকের লড়াইয়ের চপ খেতে!'

'লড়াইয়ের চপ! বলো কী? লড়াইয়ের চপ! কত টাকা হলে আবার দোকানটা চালু করা যায়?'

মাসিমা বড়মামার হাত খামচে ধরলেন। বড়মামা ঝটকা মেরে মাসিমার হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছিস কেন কুসী? খিদে পেয়েছে?'

মাসিমা ফিসফিস করে বললেন, 'আবার টাকা পয়সার মধ্যে ঢুকছ কেন বড়দা?'

কার্তিকবাবু শুনতে পেয়েছেন ঠিক, বললেন, 'ওঁর যে দয়ার শরীর দিদি। দু'হাতে যেমন রোজগার করছেন, দু'হাতে তেমনি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়েও যাচ্ছেন। জানেন যে, যত্ই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে মূর্খ, সেটা টাকা নয়, বিদ্যে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

'মূর্খ আপনি।'

'আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এ দেখি ধরলে চিঁ চিঁ করে। ছেড়ে দিলে তুড়ি লাফ মারে!'

বড়মামা বললেন, 'আহা, বেচারার মাথার ঠিক নেই। হ্যাঁ, কত টাকা হলে দোকান আবার চালু করা যায়?'

'সে অনেক টাকা বড়বাবু। অত টাকা কি আপনি দিতে পারবেন? আপনি দিতে চাইলেও এঁরা কি দিতে দেবেন? হাত চেপে ধরবেন।'

ইলেকট্রিক শক খেলে যেমন হয়, বড়মামা চমকে উঠলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার টাকা, আমি তোমাকে দোব, কে তাতে বাধা দেবে! হু আর দে! তুমি, আমি আর আমাদের তেলেভাজার দোকান। বলো কত টাকা?'

'আজ্ঞে তা প্রায় হাজার-তিনেক টাকা। হাজার খানেকের মতো দেনা আছে. একটা বড় কড়াই কিনতে হবে। উনুনটাকে ফের বানাতে হবে। তারপর তেল, ব্যাসন, আলু, বেগুন।'

'বেগুন? বেগুন কী হবে? তুমি তো বানাবে আলুর চপ!'

'আজ্ঞে স্যার, বেগুনি ছাড়া তেলেভাজার দোকান জমে না।'

'না, না, বেগুন-ফেগুন চলবে না। বেগুনে আমার অ্যালার্জি আছে।'

'আপনার অ্যালার্জি থাকলে কী হবে স্যার। চিরকাল লোকে চেয়ে আসছে, আলুর চপ, বেগুনি।'

আশুবাবু বললেন, 'লাইক ব্রেড অ্যান্ড বাটার, মিল্ক অ্যান্ড হানি, রোজ অ্যান্ড থর্ন, সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে বললেন, 'বাস, বাস হয়েছে, হয়েছে। বেগুনি হলে আমি একটি ফার্দিংও দোব না। আমি হলুম গিয়ে এক কথার মানুষ। বেগুনের গুণ নেই।'

'তা হলে স্যার পটুলি কি কুমড়ি?'

'হ্যাঁ, তা চলতে পারে। এমনকি ফুলুরিও অ্যালাউড।'

আশুবাবু বললেন, 'ফুলুরি খুব টেস্টফুল, তবে কিনা উচ্চারণটা বড় গোলমেলে। মাঝে মাঝে ফুরুলি বেরিয়ে যায়। যেমন বাতাসাটা মাঝে মাঝেই বাসাতা হয়ে যায়। যেমন পুঁটি মাছ। সেদিন বাজারে গিয়ে কিছুতেই আর মুখ দিয়ে বেরোল না, কেবলই বলি পুঁচি মাট। যেমন ফুলে ঢোল। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ঢুলে ফোল! যেমন হাউসফুল আর হাউল ফুস। কী যে সব ডেনজারাস ডেনজারাস মুশকিলের ব্যাপার।'

মেজমামা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলেন। এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধ্যাত তেরি কা। পাগলের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল। চল্ কুসী, আমরা চলে যাই।'

'আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। শুনলে না, একটু আগেই বলেছে, হু আর দে।'

'ঠিক ঠিক। আমরা হলুম গিয়ে ঠ্যালার লোক। নর্দমায় গাড়ি পড়লে ঠেলে তুলে দিতে হবে।'

বড়মামা একগাল হেসে দু'জনের দিকে তাকালেন। 'কেন রাগ করছিস পাগলা? ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড। দেখলি না সকলের চেষ্টায় গাড়ি কেমন গাড্ডা থেকে উঠে পড়ল। গাড়ির শিক্ষা আমাদের জীবনের শিক্ষা। ঐকতান মাস্টার, ঐকতান। অনৈকতানে বাঙালি জাতটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

'তোমার লজ্জা করে না বড়দা, এই কাদামাখা অবস্থায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো! লোকে কী ভাবছে?'

'লোকভয়! এখনও এই বয়সে তোর লোকভয়! অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের লেখাটা আর একবার পড়িস। জীবনে জ্ঞানের আলো ফেল পাগলা, জ্ঞানের আলো ফেল। নে, গাড়িতে উঠে পড়। ওখানে গিয়ে তোর জামাকাপড় পালটে দোব। তোরটা আমি পরব, আমারটা তুই পরবি।'

'আহা! কী কথাই বললে! তুমি আমার চেয়ে আধহাত লম্বা। তোমার পাঞ্জাবি তো আমার গায়ে লটরপটর করবে।'

'হাতার বাড়তি অংশটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেব। লোকে বলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আমি বলি হাতে কাঁচি হাতা লটরপটর। নে, উঠে পড়। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। টাইম ইজ মানি।'

'তোমাকে দেখে তা মনে হয় না বড়দা। তোমার কাছে টাইম ইজ গানি।'

'তার মানে? গানি মানে কী?'

'গানি হল চট। তোমার কাছে সময় হল চটের মতোই মূল্যহীন।'

'ওরে পাগলা, চটের দাম জানিস? জানলে আর মানির সঙ্গে গানি মেলাতিস না। চট সায়েবদের দেশে চালান যায়।'

বড়মামা বীরের মতো স্টিয়ারিং-এ বসলেন। আমরা সুড়সুড় করে যে যার আসনে। মাসিমা সিঁটিয়ে বসেছেন মেজমামার স্পর্শ বাঁচিয়ে।

মেজমামা বললেন, 'তুই অমন সিঁটিয়ে আছিস কেন কুসী?'

'তুমি নর্দমা ছুঁয়েছ মেজদা। গায়ে গঙ্গাজল না ছিটোলে শুদ্ধ হবে না।'

'অ, তাই নাকি? অদ্ভুত বিচার!'

'ছোঁয়াছুঁয়ি মানতে হয় মেজদা। তুমি এখন অপবিত্র।'

'আমি না তোর মেজদা!'

'হতে পারো মেজদা তবে অপবিত্র মেজদা।'

বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছেন। ঘুরর্ ঘুরর্ আওয়াজ হচ্ছে, গাড়ি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, স্টার্ট কিন্তু ধরছে না। বড়মামা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন।

আশুবাবু বললেন, 'কী হল, গড়বড় করছে মনে হচ্ছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেল্‌ফটা কাজ করছে না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপয়া আছে।'

পেছনের আসন থেকে তিনজনে সমস্বরে বললেন, 'কে কে, কে অপয়া?'

'সেইটাই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আমি অপয়া নই তো?'

মাসিমা বললেন, 'অপয়াদের চেনার কোনো উপায় আছে? চেহারা দিয়ে বোঝা যায়?'

আশুবাবু বললেন, 'যেমন ধরুন, আমি দৈর্ঘ্যে সামান্য খাটো, প্রস্থে একটু বিশাল, মুখটা কেমন?'

মেজমামা বললেন, 'গোল আলুর মতো। একটু লালচে রঙ।'

'লালচে? বলেন কী, লালচে? তা হলে রক্ত। শরীরে রক্ত বেড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আনন্দের কিছু নেই। এই বয়েসে বেশি রক্ত ভাল নয়। হাই প্রেশারে মরবেন। মাথার মাঝখানে টাক আছে?'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ আছে। চিকচিক করছে।'

'আমি কি তাহলে অপয়া?'

'সকালে আপনার নাম করলে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়? শুনেছেন কিছু?'

'আজ্ঞে না, তেমন অভিযোগ তো কানে আসেনি।'

'আচ্ছা, আপনি একবার নেমে দাঁড়ান তো, দেখি স্টার্ট নেয় কি না!'

আশুবাবু নেমে দাঁড়ালেন। বড়মামার কেরামতি শুরু হল সেল্‌ফ নিয়ে। কোথায় কী। গাড়ি স্টার্ট নিল না। আশুবাবু বড়মামার পাশে সরে এসে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, আমি কি তাহলে অপয়া?'

বড়মামা বললেন, 'মনে হচ্ছে না।'

তাহলে উঠে বসি ডাক্তারবাবু?'

'আর উঠে কী হবে। এবার ঠেলতে হবে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। কতটাই বা পথ। বড় জোর এক মাইল!'

মেজমামা বললেন, 'আমি ঠেলতে পারব না। আমার ক্ষমতা নেই!'

'ছিঃ মেজ। সবে মিলে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। একটু হাত

লাগাও ভাই। মানুষ তো চিরকালই গাড়ি চেপে এল, গাড়ির যদি একদিন মানুষ চাপার শখ হয় তাতে মেজাজ খারাপ করলে চলে? একদিনের তো মামলা রে ভাই। ইংরেজ হলে হাসিমুখে নেমে আসত, আমায় কিছু বলতে হত না।'

'আমি বাঙালি, ইংরেজ নই।'

'তা বললে চলে? সব সময় ইংরেজির খই ফুটছে মুখে। নাও, নেমে পড়ো। দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করা যাক। অনেক দেরি হয়ে গেল রে পাগলা।'

'পাগলা বলে যতই আদর করো, গাড়ি আমি ঠেলছি না। দিস ইজ টু মাচ।'

'এই তো ইংরিজি এসেছে, তার মানে ইংরেজ ভর করেছে। নাও, নেমে পড়ো। ঠেলতে শুরু করলেই দেখবে কী মজা! গাড়ি-ঠেলার যে কত আনন্দ! তখন থামতে বললেও আর থামতে ইচ্ছে কববে না। ঠেলে দ্যাখ, বয়েস তিরিশ বছর কমে যাবে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি বড়দা, জীবনে আর কোনোদিন তোমার গাড়িতে মরে গেলেও পা দোব না!'

'ছিঃ, প্রতিজ্ঞা করতে নেই মেজ। বাঙালির প্রতিজ্ঞা জানিস তো মেজ, এই করে এই ভাঙো কাচের বাসনের মতো। তিনদিন পরেই তোমার গাড়ির দরকার হবে ভাই। মনে নেই, হাওড়ায় যাবে। প্রফেসার চিদাম্বরম আসছেন সকাল আটটা দশ মিনিটে। নাও, নেমে পড়ো। একটু ব্যায়ামও হবে। শরীরটা দিন-দিন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে।'

দু'পাশের দরজা খুলে পেছনের আসন থেকে তিনজন নেমে পড়লেন। তেলেভাজার দোকান ফেলে সরোজবাবু এগিয়ে এলেন, 'আমিও একটু হাত লাগাই স্যার!'

মেজমামা খ্যাঁক করে উঠলেন, 'তুমি হাত না লাগালেও টাকা পাবে। এখন বুঝছি অপয়া কে? কাল সকালে উঠেই তোমার নাম করে দেখব, কপালে অন্ন জোটে কি না!'

'ঠিক ধরেছেন স্যার। এতক্ষণ বলিনি কিছু, চুপচাপ ছিলুম। সবাই আমাকে অপয়া বলে। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

বড়মামা সামনের আসন থেকে বললেন, 'তুমি তাহলে ত্রিসীমানায় আর দয়া করে থেকো না। সরে পড়ো। আর সকালের দিকে দয়া করে বাড়িতে যেও না।'

সরোজ মাইতি সাইকেল নিয়ে সবে পড়লেন। ধীর গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আশুবাবু আর মেজমামা প্রাণপণে ঠেলছেন। মাসিমা আসছেন পায়ে পায়ে ইন্দিরা গান্ধীর মতো গম্ভীর চালে। বড়মামা গান ধরেছেন ঃ

মুক্তির মন্দির সোপান-তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।

আমি বনেটে টুকুস-টুকুস করে তাল বাজাচ্ছি। বেশ জমে গেছে ব্যাপারটা।

॥ ৩ ॥

বিরাট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। কুলতলি দুঃস্থ মহিলা সমিতি। হলদের ওপর কালো অক্ষরে লেখা। তলায় ছোট ছোট করে লেখা, প্রতিষ্ঠাতা ঃ ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। ফুল দিয়ে সাজানো গেট। মোটা মোটা গাঁদার মালা ঝুলছে। একপাশে একটা বাছুর. আর একপাশে একটা ছাগল মনের সুখে কি যেন চিবিয়ে যাচ্ছে। মাইকে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে. যা দেবী সর্বভূতেষু। কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাড়ক্যাড় শব্দ হচ্ছে। গেটের ভেতরে মাঠে একদল মহিলা লালপাড় শাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকের হাতে শাঁখ।

বেশ স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক গাড়ি দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসে গেছেন, এসে গেছেন। স্টার্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে বড়মামাকে জানালেন, 'এইখানে স্যার, এইখানে স্যার। পার্ক করুন।'

সামনে থেকে বোঝার উপায় নেই, গাড়ি নিজের জোরে আসছে, না, আসছে ঠেলার জোরে। গলদঘর্ম দুটি মানুষ লেগে আছে পেছনে।

বড়মামা চিৎকার করছেন, 'স্টপ, স্টপ, নো মোর, নো মোর।'

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, 'ব্রেক মারুন, ব্রেক মারুন।'

মেজমামাদের ঠেলার নেশায় পেয়ে গেছে। মাথা নিচু। ঠেলছেন তো ঠেলছেন। গেট ছেঁচড়ে, মালাফালা ছিঁড়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তবু থামার নাম নেই। মহিলারা দৌড়ে সমিতির রকে। শাঁখ কিন্তু থামেনি. সমানে বেজে চলেছে। আরও জোরে। যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে।

মাসিমা বলছেন, 'ও মেজদা, থামো থামো।'

মেজমামা বললেন. 'আমি কি আর ঠেলছি, আমি তো শুরু থেকেই থেমে আছি। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। ঠেলছেন আশুবাবু।'

মাসিমা বললেন. 'আশুবাবুকে থামতে বলো।'

'নিজে ইচ্ছেয় আর থামেন কী করে! উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকছে। আর গাড়ি না থামলে আমি সোজা হই কী করে। মুখ থুবড়ে পড়ে যাব যে!'

সমিতির উঁচু রকে গাড়ি গিয়ে ঠেকল। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল. 'যাঃ, রকটা বোধহয় ভেঙে গেল!' ভাঙল না, একটা কোণ শুধু থেঁতলে গেল। গাড়ি থেমেছে। মেজমামা সোজা হলেন। আশুবাবু গাড়ির গায়ে ঢলে পড়লেন। গভীর ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে। বড়মামা হাসিমুখে নেমে এলেন, এই যে আমার মেজভাই। অধ্যাপক শান্তি মুখোপাধ্যায়। আপনাদের স্প্রে-পেন্ট করা সভাপতি। আশুবাবু কোথায় গেলেন? আমাদের এক নম্বর পেট্রন। কোথায় তিনি?'

'তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'সে কী, বিছানা পেলেন কোথায়?'

'বিছানার দরকার হয়নি। গাড়ির পেছনে শুয়ে পড়েছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিশ্রম হয়েছে। একটু বিশ্রাম করে নিন।'

আশুবাবু ঠিক এই সময় স্বপ্ন দেখে ডুকরে উঠলেন, 'মা, মা, আমি কোথায়?'

মাসিমা বললেন, 'খুব হয়েছে, এবার উঠে পড়ুন।'

'অ্যাঁ, ভোর হয়ে গেছ! চা হয়ে গেছে!' ভদ্রলোক তড়বড় করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

'আরে মশাই, ওদিকে চললেন কোথায়?'

'যাই, দাঁতটা মেজে আসি।'

বড়মামা হাত চেপে ধরলেন, 'ধ্যাত মশাই, চোখ মেলে দেখুন কোথায় আছেন।'

কথা শেষ হতে না-হতেই শাঁখ বেজে উঠল।

ফট-ফট করে গোটা দশ-বারো পটকা ফাটল। আশুবাবু বললেন, 'কী রে বাবা, কালীপুজো শুরু হয়ে গেল নাকি?'

রকের একধারে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বড় বড় চেয়ার। লম্বা একটা টেবিল। সাদা টেবিল ক্লথ। বড় দুটো ফুলদানি। নানা রঙের ফুল। পেছনে সাদা কাপড় ঝুলছে। তার ওপর বাসন্তী-রঙে সমিতির নাম। তার তলায় লেখা, প্রথম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। বড়মামা বলতে লাগলেন, 'আহা কী আয়োজন! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। সুহাস একেবারে সুযোগ্য সেক্রেটারি...।'

বাকি কথা আর শোনা গেল না। মাইক ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে উঠল 'হ্যালো, হ্যালো টেস্টিং। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।'

সুহাসবাবু বড়মামার কানে কানে কী বললেন। বড়মামা বললেন, 'কোথায় সে, কোথায় সে?'

'আজ্ঞে পেছন দিকের ঘরে বসে আছেন।'

'চলো, চলো, কী বিপদ, কী বিপদ!'

পেছন দিকের ঘরে এক মহিলাকে ঘিরে আরও অনেক মহিলা বসে আছেন। সকলেই বলছেন, 'একটু খোলার চেষ্টা করো। নিচেরটা নিচের দিকে ওপরেরটা ওপরের দিকে জোরে ঠেলো না। অমন করে বসে থাকলে চলে!'

মাসিমা দু'পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে?'

'দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।'

'মৃগী আছে বুঝি?'

সুহাস বললেন, 'আজ্ঞে মৃগী নয় দিদিমণি। ক্যান্ডি-ফ্লস টেস্ট করতে গিয়ে দাঁতকপাটি লেগে গেছে।'

'সে আবার কী? ক্যান্ডি-ফ্লস জিনিসটা কী?'

'দেখবেন? আমাদেরই তৈরি।' কাচের বয়াম থেকে ভদ্রলোক পাতলা কাগজে মোড়া চৌকোমতো কী একটা বের করে মাসিমার হাতে দিলেন।

'এ তো লজেন্স দেখছি।'

আশুবাবু বললেন, 'এখানে সবই দেখছি না-খোলার কেস। কৌটোর ঢাকনা খোলে না, দাঁত থেকে দাঁত খোলে না।'

'আপনি চুপ করুন।' মেজমামা ধমকে উঠলেন।

বড়মামা হাঁটু মুড়ে মহিলার পাশে বসেছেন। চামচ এসেছে নানা মাপের। সাহায্য করার জন্যে তিন-চারজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বড়, ছোট সব চামচই ব্যর্থ হল। দাঁতকপাটি খোলা গেল না। বড়মামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'খুন্তি লে আও।'

'খুন্তি? যে খুন্তি দিয়ে বেগুন ভাজে?'

চারজন চারদিকে ছুটলেন। বড় ছোট চার-পাঁচ রকমের খুন্তি এসে গেল।

বড়মামা বললেন, 'শুইয়ে দাও।'

রুগীকে চার-পাঁচজনে শুইয়ে ফেললেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমার কায়দাটা কী হবে শুনি বড়দা?'

'ভেরি সিম্পল। ঝিনুকের মুখ ফাঁক করে যেভাবে মুক্তো বের করে আনে সেই কায়দায়...।'

'সেই কায়দায়? ইনি মানুষ। সামুদ্রিক ঝিনুক নন। ঠোঁট দুটো আস্ত থাকবে?'

'তা হলে কী করব? এমন কেস তো জীবনে আমার হাতে আসেনি।'

মাসিমা বললেন, 'একটু মোটা সুতো আর মোম আছে?'

সুহাসবাবু বললেন, 'অবশ্য আছে, অবশ্য আছে।'

'মোম আর সুতো এসে গেল। বড়মামাকে সরিয়ে দিয়ে মাসিমা চিকিৎসায় লেগে গেলেন। প্রথমে মোটা সুতো জলে ভিজিয়ে দু'সার দাঁতের ফাঁকে ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগলেন। সকলে হাঁ করে দেখছেন। বড়মামা বলছেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, খুলে দাও বাবা। হ্যাঁ রে, চিচিং ফাঁক বললে কোনো কাজ হবে?'

মাসিমা বললেন, 'তুমি চুপ করো।'

বেশ কিছুক্ষণ কেরামতি চলার পর ভদ্রমহিলার দাঁত খুলে গেল। সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুল গিয়া, খুল গিয়া।'

মাসিমা দ্রুত হাতে মোমের টুকরোটা দু'দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলেন।

বড়মামা বললেন, 'ও আবার কী হল?'

'দাঁতে দাঁত ঠেকলেই আবার জুড়ে যাবে। যে সাংঘাতিক জিনিস তৈরি করেছ! যে কটা আছে সব গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে এসো।'

'আজ্ঞে ঠিক লজেন্স নয়। লজেন্স কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়া যায়। এ জিনিস আঠা-আঠা, চটচটে। সর্বক্ষণ চুষতে হবে। দাঁত দিয়ে কেরামতি করতে গেলেই ওপর পাটি, নিচের পাটি জুড়ে যাবে, ওই সীমার যেমন হয়েছে।'

'ট্রাই করে দেখব?'

চারপাশ থেকে সমস্বরে আর্তনাদের মতো শোনা গেল, 'না, না, খবরদার না। এখুনি আটকে যাবে।'

'কী এমন জিনিস মশাই, দাঁতে ভাঙা যায় না!' আশুবাবু মাসিমার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। 'এ কি গীতার সেই আত্মপুরুষ! অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে গলে না! কী করে বানালেন এমন জিনিস?'

'করতে করতে হয়ে গেছে। তেমন কিছু চেষ্টার দরকার হয়নি। একটা মুখে ফেললে এক মাস কেন, মনে হয় সারাজীবন চলে যাবে!'

'ভাল করে প্রচার করুন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার!'

সুহাসবাবু সবিনয়ে বললেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিমিত্তমাত্র।'

সুহাসবাবু বললেন, 'এঁকে সারাজীবনই কি তাহলে মোমের টুকরো দাঁতে নিয়ে ঘুরতে হবে?'

'তা কেন? এইবার বেশ করে ছাই দিয়ে দাঁত মেজে আসুন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড়মামা বললেন, 'কুসী, তোর এই চিকিৎসাটা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে!'

'থাক, এমন ঘটনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ঘটবে বলে মনে হয় না।'

মেজমামা বললেন, 'এইবার আমার একটা ব্যবস্থা করো। এই কাদামাখা জামা পরে সভাসমিতি করা যায়?'

বড়মামা চনমন করে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক। এক কাজ কর, তুই আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবিটা পর।'

'আবার তোমার সেই এক কথা। তোমার জামা আমার গায়ে বড় হবে।'

বড়মামা সুহাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চুন আছে, চুন?'

'চুন কী করবেন ডাক্তারবাবু?'

'হোয়াইট ওয়াশ। দেয়াল যদি চুনকাম করা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি কেন করা যাবে না। আলবাত যাবে!'

মেজমামা বললেন, 'থাক বড়দা, খুব হয়েছে। তোমার চিকিৎসা যেমন উদ্ভট, পরিকল্পনাও তেমনি উদ্ভট। আমি আর সভাপতি হতে চাই না! যা পারো তাই করো।'

বড়মামা বললেন, 'তা বললে চল রে পাগলা! এই সভার প্রধান আকর্ষণ তো তুই। তোর ওই কাতলা মাছের মতো মাথা থেকেও তো পথের নির্দেশ বেরোবে। তোর যা মাথা একদিন তুই এম. এল. এ. হবি। এল. এল. এ. থেকে মন্ত্রী। তখন আমাদের জোর কত বেড়ে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'আমার মাথায় সাংঘাতিক এক আইডিয়া এসেছে বড়দা।'

'আসবেই তো, আসবেই তো, তুই যে আমারই ভাই। আমার মাথাটা দেখেছিস, আইডিয়ার পিন-কুশন। বল এবার তোর কী আইডিয়া?'

'কাপড়ের কাদামাখা অংশটা তো টেবিলের তলায় থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না। সমস্যা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটা উল্‌টে পরলেই সব সমস্যার সমাধান। কী বলো?'

'বাহা, বাহা, একেই বলে মাথা। কার মাথা দেখতে হবে তো! আমার ভাইয়ের মাথা! এ-সব মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।'

'তা হলে পরে ফেলি সেইভাবে?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আর দেরি নয়।'

মেজমামা সমস্যা সমাধানের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন। 'আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই ভেরি।'

মাসিমা বললেন, 'পাগলামির একটা সীমা আছে, বুঝলে? যা বাড়িতে চলে, তা সভায় চলে না। উল্টো পাঞ্জাবির পকেট দুটো দু'পাশে জপের মালার ঝুলির মতো ঝুলবে, কী সুন্দর দেখাবে তাই না!'

বড়মামা দরাজ হেসে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে ওটা কোনোও সমস্যাই নয়। অ্যাম্পুটেট করে দোব। পরিষ্কার অস্ত্রোপচার। কাঁচি দিয়ে কুচকুচ করে ছেঁটে ফেলে দোব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেঁটে ফেলে দাও। ও তো একটা কাঁচির ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে মেজমামা পাঞ্জাবিটা উল্টো করে পরে ফেললেন। তারপর বোতাম আটকাতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মাথা নিচু হয়ে গেল, 'দাদা বোতাম!'

'বোতাম?'

'হ্যাঁ গো, বোতাম লাগাব কী করে?'

'কেন? যেভাবে সবাই লাগায়! বোতাম ঘরের মধ্যে খুস্ করে বোতাম ঢুকিয়ে দিবি।'

'তুমি একেবারে গবেট হয়ে গেছ দাদা।'

'কেন, কেন? জানিস আমি ডাক্তার, তোর মতো ছেলেঠ্যাঙানো অধ্যাপ নই!'

'ওই রুগী-মারা ডাক্তারিটাই জানো, উল্টো জামায় বোতাম লাগাবার কিস্যু জানো না। বোতাম আর ঘর দুটোই যে ভেতর দিকে চলে গেছে। বুকে খোঁ মারছে।'

'মারছে মারুক। সহ্য করো। সবই কি আর সুখের হয় ভাই রে। জীব দুঃখময়। যে কারণে রাজার ছেলে গৌতম সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হলেন।'

'আমি গৌতমও নই, বুদ্ধও নই, বোতাম না লাগিয়ে বুক খোলা অবস্থা অসভ্য ইতরের মতো সভায় যেতে পারব না। আমার একটা মানসম্মান আছে

'ওরে মূর্খ, সংস্কৃত জানিস, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বোধেস্তু কুতঃ বলং চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়। ভাগ্নে আমার হামা দিয়ে পাঞ্জাবির ভেতর ঢুে বোতাম লাগিয়ে দিক। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল।'

'তা কী করে হয়?'

'খুব হয় রে ভাই, খুব হয়। গাড়ি কী করে মেরামত হয় দ্যাখোনি মি তলায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে খুটুস-খাটুস কা তার-মার জুড়ে-জাড়ে দেয়।'

মেজমামা একটু চিন্তা করে বললেন, তা হলে শুয়েই পড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়েই পড়ো। একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়ো।'

মাসিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বললেন, 'তোমরা বাড়ি চলো বাড়ি চলো, তোমাদের আর সভা করে দরকার নেই, খুব হয়েছে।'

দু'জনে সমস্বরে বললেন, 'বাড়ি চলে যাব? এ তুই কী বলছিস কুসী?'

সুহাসবাবু বললেন, 'আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে।'

'বলে ফেলো, বলে ফেলো।'

'খুব সহজ সমাধান আমার মাথায় এসেছে।'

'এসেছে? এসেছে নাকি? নিবেদন করো, নিবেদন করো। নিবেদনমিদং।'

'আমাদের তাঁত বিভাগ থেকে একটা সাদা চাদর নিয়ে আসি সেইটি গা দিয়ে—'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'সুহাস, তোমার আইনস্টাইন হওয়া উচিত ছিল তুমি আলেকজান্ডার দি গ্রেট। তুমি চেঙ্গিজ খান।'

মেজমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আঃ, উচ্চারণটা ঠিক করো বড়দা। চেঙ্গিজ নয়, জিঙ্গিজ।'

'হ্যা, হ্যা, সারা জীবন চেঙ্গিজ বলে এলুম। ম্যাট্রিকে ইতিহাসে লেটার পেলুম। তুই এখন উচ্চারণ শেখাতে এলি! জানিস সায়েবরা আমার নাম কী ভাবে উচ্চারণ করে, সু-ড্যাংশু।'

'করো, তাহলে ভুল উচ্চারণই করো। শেখালে যখন শিখবে না, অশিক্ষিতই থেকে যাও।'

দু'জনের ঝগড়া আর তেমন এগোল না। পাড় বসানো সুন্দর একটা সাদা চাদর এসে গেল। উল্টো করে পরা পাঞ্জাবির ওপর চাদর ফেলে মেজমামা হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'চলুন তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক। এদিকে যত রাত হবে ওদিকে তত দিন হবে।'

মাসিমা বললেন, 'তোমারও মাথাটা গেছে। কী বলতে কী যে বলছ ? বলো এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত রাত হবে।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে একটা গল্প শোন।'

'এখন আর গল্প শোনার সময় নেই। তোমার গল্প ভীষণ বড় বড় হয়।'

'এটা খুব ছোট। সত্যি ঘটনা কিনা।'

'কাল শোনা যাবে।'

'না, আজই শুনতে হবে। তা না হলে এই সভা আমি হতে দোব না।'

মেজমামা বললেন, 'যাঃ-ব্বাবা। বেশ মজার লোক তো! নিজের সভা নিজেই পণ্ড করবে?'

'আমার পাঁঠা আমি যেদিকে খুশি কাটতে পারি। ন্যাজেও পারি, মুণ্ডুতেও পারি।'

সুহাসবাবু বললেন, 'ছোট্ট যখন শুনেই নিন না! ঝামেলা চুকে যাক।'

'বেশ, বলো তাহলে।'

'একদিন সকালে চেম্বারে বসে আছি।'

'কত সকালে?'

সুহাসবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেন বাগড়া দিচ্ছেন মেজবাবু!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি বলে যাও।'

'একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শিগগির চলুন, মা আবার ঢুলে ফোল হয়ে গেছে। বলেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি হাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। সেই একইভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে, ডাক্তারবা
ঢুলে ফোল নয় ফুলে ঢোল! ছুটতে ছুটতে চলে গেল।'

বড়মামা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, তোমর
হাসলে না?'

'হাসব কেন? এটা একটা গল্প হল?'

'গল্প হল না! তা হলে কী হল?'

'ঘোড়ার ডিম হল।'

'এটা গল্পের মতো সত্য।'

'সে আবার কী? বলো সত্যের মতো গল্প।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, সব গুলিয়ে গেল। গল্পের মতো সত্য, সত্যের মতো গল্প।
স্টোরির ইংরেজি কী হবে?

সুহাসবাবু বললেন, 'সত্য গল্প।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্য গল্প। সত্য হাসির গল্প।'

মেজমামা বললেন, 'ভেরি সরি। আমাদের কিন্তু হাসি পেল না।'

'তার মানে তোমরা সমঝদার নও। তোমাদের মন তেমন সরল নয়। শিশু
মতো সরল মন না হলে প্রাণ খুলে হাসা যায় না রে পাগলা!'

সুহাসবাবু বললেন, 'আপনি লক্ষ্য করেননি, আমি কিন্তু ফিক্‌ফিক্ ক
হেসেছি।'

'লক্ষ্মী ছেলে। লক্ষ্মী ছেলে।' বড়মামা পিঠ চাপড়ালেন।

'তবে আর বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না বড়বাবু। অনেক সব প্রবলে
আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার স্টার্ট।'

॥ ৪ ॥

ফুল, লতা, পাতা, রঙিন কাগজ, লাল-নীল পতাকা। সভা একেবা
জমজমাট। লাউডস্পিকার কাসছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একজন চিৎকা
করছেন, টেস্টিং, টেস্টিং। বড়মামা বললেন, 'টেস্ট করে আর কী পাবে! এ
ব্রংকাইটিসের কাশি। বুকে সর্দি জমেছে।'

যে ভদ্রলোক টেস্ট করছিলেন তিনি যেই ওয়ান, টু, থ্রি বলতে গেলে
মাইক চ্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ফেলে দাও, ফে
দাও। মাচান থেকে নামিয়ে দাও। অসুস্থ, অসুস্থ। হাসপাতালে পাঠাও।'

ফোর, ফাইভ, সিক্স। সেভেনে এসে মাইক সুস্থ হল। স্বাভাবিক স্বর বেরোল। বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুললেন। মাইক নিয়ে ধস্তাধস্তি শেষ হল। সভা একেবারে লোকে লোকারণ্য। পুরুষ, মহিলা, ছেলে মেয়ে, কেমন একটা গজর-গজর, ভজর-ভজর শব্দ হচ্ছে।' একসঙ্গে অনেক মাছি উড়লে যেমন হয়।

সুহাসবাবু বললেন, 'সাইলেন্স্! সাইলেন্স্!' প্রায় ধমকে উঠলেন, 'একদম চুপ, একদম চুপ।' ঠিক যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার! এখুনি পড়া ধরবেন। না পারলে মাথায় ডাস্টার।

সুহাসবাবু বললেন, 'আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।'

গুনুর গুনুর গোলমাল তখনও চলেছে। ছুঁচ পড়লে আওয়াজ হয় এমন নিস্তব্ধ তখনও হয়নি। একেবারে সামনের সারিতে দুটো বাচ্চা, এ ওর কান, ও এর কান ধরে কান-টানাটানি খেলা খেলছে। সুহাসবাবু মাইক ছেড়ে লাফিয়ে সভায় নামলেন। প্রথমেই দু'হাতে দুই থাপ্পড়। তারপর দুটোকেই বেড়ালছানার মতো নড়া ধরে তুলে ঝোলাতে ঝোলাতে সভার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলেন। এসেই আবার মাইক ধরলেন, 'আজ আমাদের অতিশয় আনন্দের দিন। গত বছর ঠিক এমনি দিনে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'

পেছনের সারি থেকে একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলেন, 'এবার উঠে যাবে!'

বড়মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কে বললে? কে বললে উঠে যাবে? কার এত সাহস? উঠে যাবে কেন?'

পেছনের সারিতে পরপর দশ-বারোজন উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা বলেছি স্যার। আজ আমাদের আনন্দের দিন নয়, দুঃখের দিন স্যার।'

'কেন, কেন? দুঃখের দিন কেন? কোনো কিছু জন্মালে কেউ কি দুঃখ করে, না আনন্দ করে? আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমার বাড়ির সবাই হেসেছিল না কেঁদেছিল? আমি অবশ্য ভ্যাঁ, ভ্যাঁ করে কেঁদেছিলুম। সে তো ভাই তুলসীদাসজি বলেই গেছেন—তুমি যখন এসেছিলে, জগৎ হেসেছিল, তুমি কেঁদেছিলে। তুমি যখন যাবে, জগৎ কাঁদবে আর তুমি হাসবে।'

'ডাক্তারবাবু, আমরা সে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলছি না, আমরা এই কুলতলি মহিলা সমিতির কথা বলছি স্যার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সেই কথাই তো বলবেন। সেই কথা বলারই তো দিন আজ।'

'তা হলে বলেই ফেলি।'

'উঁহু, আপনারা তো শুনবেন। আমরা আজ বলব। সভাপতি বললেন, প্রধান অতিথি বলবেন। আপনারা শুধু কানখাড়া করে শুনবেন। শোনা শেষ হ'লে চটাপট-পটাপট হাততালি দেবেন।'

'সবই বুঝলুম। তবে আপনারা বলার আগে, আমরা যা বলতে চাই শোনা দরকার। অনেক টাকার ব্যাপার তো।'

'ও, এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা অর্থ দান করতে চান ? বাঃ বাঃ, অতি মহৎ প্রস্তাব। পৃথিবীতে দাতা তাহলে এখনও আছেন!'

'ভাল করে শুনুন! আমরা নিতে এসেছি, দিতে আসিনি। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।'

'ক্ষতিপূরণ! সে আবার কী রে ভাই! আমরা তো কারুর কোনোও ক্ষতি করিনি। আমরা তো মানুষের উপকার করার জন্যেই বাজারে নেমেছি।'

'ওই আনন্দেই থাকুন। এদিকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী রকম, কী রকম?'

'বলছি, বলছি। একে একে বলছি। আমিই প্রথমে বলি, তারপর এরা বলবে।'

বড়মামা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সুহাস, সব যে বেসুরে বাজছে গো।' মাইকে বড়মামার আস্তে মন্তব্য বড় হয়ে সভায় ছড়িয়ে পড়ল।

মেজমামা বললেন, 'তা তো একটু বাজতেই পারে। সবসময় সবকিছু কি সুরে বাজে?'

মেজমামার মন্তব্যও সবাই শুনে ফেলল।

সুহাসবাবু মাইক টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের জন্মদিন, বড় আনন্দের দিন, আজ কোনো গণ্ডগোল করা কি ঠিক হবে। আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি থেকে মন্তব্য হল, 'জন্মদিন আর মৃত্যুদিন একও তো হয়ে যেতে পারে।'

'মৃত্যুর কথা আসছে কেন ভাই। এই তো সবে এক বছর হল আমরা জন্মেছি।'

'তা হলে শুনুন, আপনাদের কীর্তিকাহিনী শুনুন। আপনাদের সেই প্যাকেটে ভরা মুড়কি, যার নাম রেখেছিলেন হরিভোগ। সেই মুড়কি আমার দোকানের কী সর্বনাশ করেছে!'

'ভাই, হরিভোগ তো সত্যিই হরির ভোগ। আমরা নিজেরা টেস্ট করে তবে বাজারে ছেড়েছি। ওতে বাদাম আছে, জিবেগজার সুস্বাদু টুকরো আছে, নকুলদানা

আছে, আদার কুচি আছে। ভাবলেই আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে ভাই!'

'আপনার জিভে জল, আর আমার চোখে জল। যা মাল তুলেছিলুম দু'চার প্যাকেট মাত্র বেচতে পেরেছি। এ বাজারে ওসব বৈষ্ণব-পথ্য চলে না মশাই। এ হল মাটনরোল, ফিশরোল, মোগলাইয়ের যুগ। আপনাদের হরিভোগ সব ধেড়ে-ইঁদুর-ভোগ হয়ে গেছে। তাও ইঁদুরে ভোগ করে ছেড়ে দিলে বাঁচতুম। হরিভোগ খেয়ে, ধেড়েরা এমন খেপে আছে, আমার দোকানের সব কাঁচের জার তো ভেঙে চুরমার করেছেই, আমাকেও দোকান খুলতে দিচ্ছে না, তেড়ে তেড়ে আসছে। কামড়েও দিয়েছে পায়ের বুড়ো আঙুলে। তলপেটে এখন ইন্‌জেকশান নিতে হচ্ছে।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'এই ব্যাপার! আপনি আমাদের এই সমিতির তৈরি গোটাকতক আগমার্কা ইঁদুরকল ওই হরিভোগ দিয়েই পেতে রাখুন, সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আগমার্কা ঘি হয় শুনেছি, ইঁদুরকলও হয় নাকি?'

'আরেব্বাপু রে, সেরা জিনিস মানেই আগমার্কা। আমাদের ইঁদুরকল বাজারে এক নম্বর। নাম্বার ওয়ান। লিকপ্রুফ। ইঁদুর এদিক দিয়ে পড়ে ওদিক দিয়ে ফুড়ুত করে বেরিয়ে যাবে, সে আর হচ্ছে না। আমরা সব জিনিস টেস্ট করে তবে বাজারে ছাড়ি।'

'ইঁদুরকল কী করে টেস্ট করবেন স্যার? ওটা তো খাদ্য নয়। কেক নয়, রুটি নয়।'

'ওই কেক আর রুটির কথা যখন উঠল, তখন বলেই ফেলি।' এবার দ্বিতীয় আর এক ভদ্রলোক। সুন্দর চেহারা। একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। বড়-বড় চোখ।

বড়মামা বললেন, 'আপনার আবার কী অভিযোগ? এ দেখছি আমদরবার বসে গেল। অ্যাতো অভিযোগ সামলাই কী করে?'

'আপনাদের ওই কেক আর রুটি স্যার আমার এতকালের ব্যবসার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ও দুটোও কি টেস্ট করে ছেড়েছিলেন স্যার?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি খাইনি, তবে এরা অবশ্যই খেয়েছে। খাবার জিনিস, না খেয়ে পারে?'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছে। আমাদের সামনে দয়া করে একটু চাখুন না!'

'তা চাখতে পারি। আমার আবার খাওয়ার ব্যাপারে তেমন লজ্জাটজ্জা নেই।'

'তা হলে সভাপতি, প্রধান অতিথি দু-জনেই একটু একটু টেস্ট করুন। আমরা দেখি।'

মেজমামা লজ্জা-লজ্জা করে বললেন, 'কী যে বলেন?'

সুহাসবাবু কেক আর রুটি নিয়ে এলেন। দেখেই মনে হল বেশ গরম গরম। সুন্দর গন্ধ নাকের পাশ দিয়ে ভেসে চলে গেল। যেন ডাকছে—আয়. আয়, কপাকপ খেয়ে যা। বড়মামা একটুকরো কেক ভেঙে মুখে পুরলেন। মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে চটাপট, পটাপট হাততালি। দেখতে দেখতে বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল। কী রে বাবা, এখুনি ফিট হয়ে যাবে নাকি।

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলেন স্যার? নুনে যবক্ষার। জিভ হেজে গেল। তাই না!'

বড়মামা ঢোক গিলে ডাকলেন, 'সুহাস।'

'বলুন স্যার। পাশেই আছি।

'পাশেই আছ। আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হতে পারে স্যার। অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, সেজন্যে না। এমন বিদঘুটে স্বাদ হল কী করে? অমানুষিক টেস্ট।'

'হতে পারে স্যার। খুব ভাল কারিগরের তৈরি কিনা!'

'ছাঁটাই করো, ছাঁটাই করো। সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আজই বিদায় করো!'

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে, আমার হাজার-পাঁচেক টাকা পাওনা হল। দোকান নতুন জায়গায় তুলে না নিয়ে গেলে যেখানে আছি সেখানে আর ব্যবসা করে খেতে হবে না। সব খদ্দের ভয়ে সরে পড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'মিথ্যে কথা। এমন কিছু খারাপ খেতে হয়নি।'

'তা হলে আর-একটুকরো খান। আমরা বসছি।'

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে মেজমামা আর মাসিমার মুখের দিকে করুণ মুখে তাকালেন।

মাসিমা বললেন, 'পাঁচ হাজারের চেয়ে জীবন অনেক দামী বড়দা।'

বাইরে একটা হই-হই শোনা গেল। 'কোথায়, কোথায় সেই ডাক্তারবাবু? আমি তাঁকে একবার দেখে নিতে চাই।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওরে কুসী, আবার কে আসছে রে তেড়ে?'

মেজমামা বললেন, 'নাও এবার পরোপকারের ঠ্যালা বোঝো।'

মারমার করে রাগী চেহারার এক বৃদ্ধ সভায় এসে ঢুকলেন। 'ডক্টর মুখার্জি নাকি এসেছেন। তিনি কোথায়?'

পেছনের সারির ভদ্রলোকেরা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওই যে, ওই যে মঞ্চে বসে আছেন। বসে বসে কেক খাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেক তো খাবেনই। কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস। ডক্টর মুখার্জি!'

ভদ্রলোক বুক চিতিয়ে পা দুটো ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন যুদ্ধ করবেন!

বড়মামা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার কী সর্বনাশ হয়েছে?'

'কী সর্বনাশ হয়েছে দেখতে চাও ছোকরা? তোমাদের কৌশল কি আমি বুঝি না ভাবছ। সামনের চৈত্রে আমার বয়েস হবে সত্তর। দাঁতের ডাক্তারদের সঙ্গে ষড় করে তোমরা বাজারে টফি ছেড়েচ। ছেড়েচ কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, টফি আমরা ছেড়েচি, তবে দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে কোনো ষড় নেই।

'তাই যদি হবে মানিক, তাহলে এই বুড়োর বাঁধানো দাঁত দু'-পাটির এ-হাল হবে কেন?'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা মোড়ক বের করে টেবিলে মেলে ধরলেন। খিঁচিয়ে আছে দু'পাটি দাঁত। বাঁধানো সারি থেকে গোটা-দুই খুলে পড়ে গেছে।

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে টফি তো শিশুদের জন্যে, আপনি কেন খেতে গেলেন?'

'এটা কী কথা তুমি বললে হে ডাক্তার! তুমি কি জানো না, আমার এখন দ্বিতীয় শৈশব চলেছে। টফি আমার নাতিও খায়, আমিও খাই। তুমি কি আইন করে আমার টফি খাওয়া ঠেকাবে? এ তো মজা মন্দ নয়!'

'আমাদের টফি একটু কড়াপাক ধরনের। বেশ পাকলে-পাকলে ধৈর্য ধরে না খেলে দাঁত আপনার ভাঙবেই। এ আপনার নকল দাঁতের জিনিস নয়, আসল দাঁত চাই।'

'দ্যাখো বাপু, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে চেও না। আমি এই দাঁতে এখনও মাংসের হাড় চিবোই বৎস। যৌবনে সত্তর-আশি পাউন্ড ওজনের বারবেল

তুলতুম। এখনও নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে ছাপান্নখানা লুচি মেরে দি। কী উল্টোপাল্টা বোঝাতে চাইছ আমাকে? শোনো ডাক্তার, পাঁচশোটি টাকা আমি গুনে নিয়ে এখান থেকে যাব। আমাকে তুমি চেনো না। আমার নাম চিদানন্দ বণিক। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহি বিদ্রোহের সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে তরোয়াল দিয়ে ইংরেজদের মুণ্ডু উড়িয়েছিল ক্যাচাক্যাচ।'

বড়মামা ঢোক গিলে মেজমামার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। মেজমামা চোখের ইশারা করলেন। কী তার মানে কে জানে। বড়মামা আজ বেজায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। সুহাসবাবু কোন ফাঁকে সরে পড়েছেন।

হঠাৎ আশুবাবু এগিয়ে এলেন। মরেছে, ইনি আবার কৌটো সমস্যা তুলবেন নাকি? আশুবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এইভাবে আজকের অনুষ্ঠান পণ্ড করবেন না। যার যা পাওনা, ডাক্তারবাবু সবই মিটিয়ে দেবেন। আপনারা একটা করে দরখাস্ত পেশ করুন।'

'দরখাস্ত? তার মানে? এ কি সরকারি দপ্তরে ডোলের আবেদন নাকি। আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আগে বুঝে নোব, তারপর আমাদের অন্য কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

দাঁতভাঙা বৃদ্ধ বললেন, 'অ্যাঃ, সব উল্টোপাল্টা বকছে। এ-কথায় ওই কথা আসে কী করে। ফেলো কড়ি মাখো তেল। এর পরেই মূর্খরা বলবে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

পেছনের সারির ওঁরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে? আমরা মূর্খ! কী আমার জ্ঞানী, মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ রে? দাঁত ভেঙেছে, দাঁত! প্রমাণ কী, টফি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায়'?

'ওরে মূর্খের দল। এর আবার সার্টিফিকেট কী?'

'বাঃ, মানুষ মরলে পোড়াবার আগে সার্টিফিকেট লাগে না!'

'আরে গাধা, মানুষ মরা আর মানুষের দাঁত ভাঙা এক হল?'

'মানুষের দাঁত কেমন করে হল মানিক? ও তো ছাঁচে ঢালাই নকল দাঁত। তার জন্যে পাঁচশো। টাকা যেন খোলাম কুচি রে।'

'যা না ব্যাটারা, একবার খপর নিয়ে দেখ না, দু'পাটি দাঁত বাঁধাবার খরচ কত? এ তোদের খাতা বাঁধানো নয়, ছবি বাঁধানো গবেটের দল।'

'যা তা গালাগাল তখন থেকে চলেছে। এবার আমরা আর চুপ করে থাকব না। অ্যাকশন নিয়ে নোব।'

'একবার চেষ্টা করে দ্যাখ না চামচিকের দল।'

'তবে· রে।'

মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আশুবাবু বড়মামার কানে কানে বললেন, পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ুন। হাওয়া খুব ভাল নয়। এলোমেলো বইছে।'

॥ ৫ ॥

পেছনে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, জোড়া পুকুর। ভাগ্য ভাল, সূর্য অনেক আগেই ডুবে গেছে। আকাশে যেন ঘোর লেগে গেছে। কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কে জানে। চোরের মতো। ছোট চোর, বড় চোর। আমার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপেঝাড়ে বল খোঁজার অভ্যাস আছে। অসুবিধে হচ্ছে মেজমামা আর মাসিমার। মাসিমার শাড়ির আঁচল। মেজমামার চাদর। কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে ডালপালায়। ওদিকে খুব হই-হই হচ্ছে। ভাগ্যিস দাঁতভাঙা বৃদ্ধ এসেছিলেন।

বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, 'টাকা তো আমাকে দিতেই হবে আশুবাবু। ক্ষতি যখন হয়েছে!'

'কারুর কিস্যু ক্ষতি হয়নি। সব হল ধান্দাবাজ। বেড়ালের জাত মশাই! নরম মাটি দেখেছে কি অমনি আঁচড়াও।'

মাসিমা বললেন, 'দেখেশুনে মনে হল, কম-সে-কম হাজার-দশেক টাকার ধাক্কা।'

মেজমামা বললেন, 'আজ তোমার মহিলা সমিতি আর পরোপকারের শেষ দিন। আজ ওরা সব একখানা একখানা করে ইট খুলে নিয়ে যাবে।'

আশুবাবু বললেন, 'আপনার সেক্রেটারি সুহাসবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো?"

আমগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে আমি এখানেই আছি। মশায় সর্ব অঙ্গ জ্বলিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবু।'

'তুমি আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে এলে সুহাস?'

'আর যে কোনো পথ ছিল না দাদা! জানেনই তো কথায় আছে—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

বড়মামা বললেন, 'এ জায়গাটা তোমার কী রকম মনে হয়, বেশ নিরাপদ? এক কাপ চা পেলে হত।'

'চা? চা এখানে পাবেন কোথায়। সাপখোপ পেতে পারেন।'

'আমরা এখন তাহলে যাই কোথায়?'

'আমি একটা ভাল কাজ করেছি স্যার। কাজের কাজ। ওই ধোবিডাঙার মাঠে আপনার গাড়িটা এনে রেখেছি।'

'সে কী হে! আমার গাড়ি তো বিগড়ে বসে আছে। স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'সে আমি ঠিক করে দিয়েছি। এক ফুঁয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে। কারবুরেটারে ময়লা জমেছিল।'

'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। একবার গাড়িতে উঠে বসতে পারলে আর আমাদের পায় কে! চলো চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

ঝোপঝাড় ভেঙে আমরা ধোবিডাঙার মাঠে এসে উঠলুম। একফালি চাঁদ মুচকি হাসছে আকাশে। গোটাকতক তারা এলামেলো ছড়িয়ে আছে। আমার তেমন কোনো ভয় লাগছে না। মাঝেমাঝে আমার কেবল হাসি পাচ্ছে। কী থেকে কী হয়ে গেল! এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

সুহাসবাবু বললেন, এ হল ওই ঘোষালের কাজ। ভাল কিছু হতে দেখলেই লোক লাগিয়ে সব পণ্ড করে দেয়!'

'অ, তাই বলো, ঘোষাল কলকাঠি নেড়েছে! ওকে আর কিছুতেই টিট্ করা গেল না!'

'যাবে না কেন? সহজেই যায়। ওকে যদি প্রেসিডেন্ট করে দেন!'

'বেশ তো! এ আর এমন শক্ত কী! আজই করে দাও না।'

'আজ কী করে করবেন। প্রথমে টাকা দিয়ে ওকে সভ্য হতে হবে। তারপর নির্বাচন। সব ব্যাপারেরই তো একটা ইয়ে আছে। আজ ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। আপনি দিনকতক বরং গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন।'

'গা-ঢাকা দোব কেন? আমি কি কাপুরুষ? তা ছাড়া আমার কোনো শত্রু নেই।'

'এখন আপনার অনেক শত্রু। সমাজসেবা অত সহজ নয় ডাক্তারবাবু। বেড অব রোজেস।'

'ভুল বললে। বেড অব থর্ন।'

'আজ্ঞে কাঁটা ছাড়া কি গোলাপ হয়!'

কথায় কথায় আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ফিকে চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আমরা উঠে বসলুম। আশুবাবুও উঠলেন। বড়মামা বললেন 'সুহাস, তুমি?'

'আজ্ঞে, আমি বেশ আছি।'

'বেশ আছি মানে! এই বললে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ওরা তোমাকে একা পেলে তো ঠেঙিয়ে শেষ করে দেবে।'

'ওই তো পাশেই আমার দিদির বাড়ি। সেখানেই গা ঢাকা দোব।'

'দেখো মার খেয়ে মোরো না। তুমি আমার রাইট-হ্যান্ড।'

স্টার্ট দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিল। গোল একটা বৃত্ত তৈরি করে, সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সুহাসবাবু আপনার কত দিনের চেনা স্যার?'

বড়মামা স্টিয়ারিং-এ পাক মারতে মারতে বললেন, 'এই বছর-খানেক হবে।'

'লোক মোটেই সুবিধের নয়, বুঝলেন বড়বাবু? এ হল গিয়ে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘোষালের নিজের লোক। ভেতর থেকে সব চুরমার করতে চাইছে।'

'কী আশ্চর্য। আমি তো খারাপ কিছু করতে চাইনি। আমি তো সকলের উপকার করতেই চেয়েছি।'

'সেই অপরাধেই তো আপনার বাঘের পেটে যাওয়া উচিত। মনে নেই নবকুমারের কী হয়েছিল।'

'এবার আমি সব ছেড়ে দোব। এমনকি ডাক্তারিও। এ দেশেই আর থাকব না।'

ফাঁকা রাস্তা ধরে বড়মামার গাড়ি ফরফর করে চলেছে। এটা আবার কোন্ রাস্তা কে জানে। মেজমামা বললেন, 'আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। মনে হয় কুমীর মুখ দেখে।'

মাসিমা বললেন, 'আমি যে তোমার মুখ দেখে উঠেছিলুম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম?'

'রোজ যা করো। নিজের মুখ দেখেই উঠেছিলে।'

আমি বললুম, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম?'

মেজমামা বললেন, 'তুমি উঠেছিল বড়মামার মুখ দেখে। ও মুখ দেখলে সারাদিন বড় আনন্দে কাটে।'

আশুবাবু হই-হই করে উঠলেন, ডানদিক, ডানদিকে চলুন। বাড়ি যাবেন তো।

'বাড়ি যাব কেন? বাড়ি গেলে আর গা-ঢাকা দেওয়া হল কী?'

মেজমামা বললেন, 'সে কী। তুমি তাহলে কোথায় চললে?'

'সোজা মধুপুর।'

মাসিমা বললেন, 'মধুপুর? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বড়দা?'

'কবে আর ভাল ছিল বোন?'

আশুবাবু বললেন, 'সত্যি মধুপুর?'

'আমি বড় একটা মিথ্যে বলি না আশুবাবু। আমার মন্ত্রই হল করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

মেজমামা বললেন, 'এতে তোমার মরার মতো কী করা হল? তুমি যেখানে খুশি যাও, আমাদের নামিয়ে দাও।'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয় ভাই! আমরা সদলে মধুপুর যাব।'

আশুবাবু বললেন, 'কোথায় থাকবেন?'

'সেখানে আমাদের ফাসক্লাস বাগানবাড়ি আছে। বড় বড় গোলাপ।'

'কী মজা।' আশুবাবু আনন্দে আটখানা।

মাসিমা বললেন, 'গাড়ি থামাও। আমরা নেমে যাই।'

আশুবাবু বললেন, 'মাঈজি আপনাদের আনন্দ হচ্ছে না? কী সুন্দর আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি!'

মেজমামা বললেন, 'বাড়ির কথা ভেবেছ?'

'খুব ভেবেছি, দশ দশটা কুকুর পাহারা দেবে। কাকাতুয়া ধমকাবে।'

'ওদের দেখবে কে?'

'লক্ষ্মী আছে, জনার্দন আছে, শামুকাকা আছে।'

'না ফিরলে ওরা ভাববে না?'

'সখি ভাবনা কাহারে বলে, সখি যাতনা কাহারে বলে...।' বড়মামা গান ধরলেন। গাড়ির গতি বাড়ল।

আশুবাবুও হুঁ-হুঁ করছেন। খুব ফুর্তি! হুঁ-হুঁর মাঝেই সুরে বললেন, 'এইবার একটু চা হলে ভাল হত। ওই দেখা যায় দোকান দূরে।'

বড়মামা গানের সুরে উত্তর দিলেন, 'গাড়ি থামালেই। গাড়ি থামালেই। ওরা নেমে পালাবে। পালাবে, পালাবে, পালাবে। গাড়ি থামালেই।'

মেজমামা বললেন, 'আমরা চেঁচাব। চিল চেল্লান চিল্লে লোক জড়ো করে তোমাকে ছেলেধরার ধোলাই খাওয়াব। তোমাদের আহ্লাদ তখন বেরোবে।'

'ছেলেধরা?' বড়মামার অট্টহাসি। 'বল বুড়োধরা। তোরা নিজেদের এখনও ছেলে ভাবিস?'

আশুবাবু বললেন, 'ছোড়দা, কেন বাগড়া দিচ্ছেন? কী মজা করে, কেমন কোথায় চলেছি। এখন একটু বেশ ছেলেমানুষ হয়ে যান না। একেবারে শিশু।'

'হ্যাঁ মশাই। শিশু হও বললেই শিশু হওয়া যায়? খুব তো লাফাচ্ছেন। ওদিকে আপনার দোকানের সব মিষ্টি তো পচে ভ্যাট হয়ে যাবে।'

'সেই আনন্দেই থাকুন মেজবাবু। আমার মিষ্টি পচে না। সবই তো কাগজের তৈরি।'

হু হু করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামা বললেন, 'ব্যান্ডেল ছাড়ালুম। বুঝলি মেজ। শান্ত হয়ে বোস। বেশি ছটরফটর করিসনি। দুর্গাপুর আসার আগে দুর্গানাম জপ কর। ডাকাতের হাতে না পড়ে যাই। তার আগে শক্তিগড়ে পেট ভরে ল্যাংচা খাব। জয় বাবা তারকেশ্বর।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে আমরা চেল্লাই।'

'চেল্লাও বসে। আমিও গান ছেড়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা টেপ ছাড়লেন, 'প্রেমদাতা নিমাই বলে গৌর হরি হরি বোল।'

সঙ্গে আশুবাবুর চটাস-চটাস হাততালি। ভোঁ ভোঁ করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামার হাত খুলেছে। গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভটাস্ করে একটা শব্দ।

'যাঃ, টায়ার গেল।'

গাড়ি ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পথের বাঁ পাশে একটা বটগাছের তলায়। আশুবাবু গেয়ে উঠলেন, 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!'

এরপর যা হল সে আর এক গল্প।

গরুর রেজাল্ট

বড়মামা প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে নীচে থেকে ওপরে উঠে এলেন। এমন চেহারা এর আগে আর কখনও দেখিনি। কপালের ডান পাশটা ফুলে ট্যাপা লাল। দু'হাতের কনুইয়ের কাছ পর্যন্ত কুচোকুচো খড় বড় বড় লোমের সঙ্গে আটকে আছে। চোখ দু'টো লাল টকটকে। গাঢ় নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি একটু উঁচু করে পরা। পায়ে কালো ওয়াটার-প্রুফ জুতো।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে বড়মামা দোতলার ঢাকা বারান্দায় উঠে এলেন। ঝলমলে রোদ জাফরির নকশা পেতে রেখেছে ঝকঝকে লাল মেঝের ওপর। দূর কোণে মেজমামা বসে বসে ক্যামেরার লেনস পরিষ্কার করছিলেন। আমি তাঁর ফাইফরমাস খাটছিলুম। 'এটা দে, ওটা দে।'

মেজমামার কোলের ওপর ক্যামেরা। হাতে হলদে রঙের ফ্ল্যানেলের টুকরো। চোখ আর ক্যামেরার দিকে নেই, বড়মামার দিকে। মেজমামা হঠাৎ বললেন, 'স্টপ। ঠিক ওই জায়গাতেই এক সেকেন্ড। আমি চট করে তোমার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নি। তোমাকে ঠিক দিশি কাউবয়ের মত দেখাচ্ছে। বেড়ে দেখতে হয়েছে ত! কী করে হলো?'

বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'শাট আপ। শা-আট আ-আপ!'

মেজমামা ফিস করে আমাকে বললেন, 'সাবজেক্টটা ভাল ছিল তবে একটু খেপে আছে।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার। কুইক।'

'শুনে আসি মেজমামা।'

'হ্যাঁ শুনে আয়। কেসটা কি আমাকে জানিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা।'

ঘরে ঢুকতেই বড়মামা বললেন, 'কী হবে?'

'কিসের কী হবে?'

'জুতো পরে ঢুকে পড়েছি যে!'

'ও কিছু হবে না।'

'এটা যে রাস্তার জুতো। কুসী দেখলে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।'

'মাসিমা তো এখন ধারেকাছে নেই।'

'মেঝেতে যে দাগ পড়ে গেল?'

'আমি পা দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি।'

'আমি যে দাঁড়িয়ে পড়েছি!'

'চলতে চান তো চলে ফিরে বেড়ান না। অসুবিধে কিসের!'

'যেদিকে যাব সেই দিকেই তো দাগ পড়ে যাবে!'

'জুতো খুলে ফেলুন।'

'ইয়েস, দ্যাটস রাইট।'

বড়মামা জুতো খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বারকতক নেচে নিলেন। লাল চকচকে মেজেতে নাচে জুতোর নকশা তৈরি হল।

'দেখলি, দেখলি! সাধে কুসী আমার ওপর রেগে যায়। রেগে যাবার অনেক কারণ আছে! পৃথিবীতে কোন কিছুই কি সহজ নয় রে!'

'জুতোটা না খুলে অমন করে নাচছেন কেন?'

বড়মামা রেগে উঠলেন, 'আমি কি ইচ্ছে করে নাচছি। আমাকে নাচাচ্ছে যে! রবারের জুতো পড়ে একবার দেখ না। পরা সহজ, তারপর পা থেকে আর খুলতে চায় না। কৃতদাসের জাত। পায়ে ধরে বসে থাকতে চায়।'

'এখন তা হলে কী হবে! সারাদিন এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'আমি বরং দাগে দাগ মিলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তুই ওই মারকিউরোক্রোমের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে আয়। ও, না।'

'কি হল আবার?'

'বাইরে তো উনি ক্যামেরা তাক করে বসে আছেন। এখুনি ফট করে একটা ছবি তুলে এত বড় করে বাঁধিয়ে রাখবেন।

'তাহলে আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি পা থেকে জুতো দু'পাটি খুলে দি।'

'না, দেখে ফেলবে।'

'দেখলে কী হয়েছে? আর কেই বা দেখবে?'

'ও বাবা, দেখলে কী হয়েছে! হোল্ বাড়িতে হই-চই পড়ে যাবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ভাগনেকে দিয়ে জুতো খোলাচ্ছে! মনে নেই সেদিনের কথা। তোকে বলেছিলুম পিঠে একটু তেল ঘষে দিবি, সেই নিয়ে কত রকমের কথা!'

'তাহলে আমি চেয়ারটাকে টেনে আনি, আপনি বসে বসে খুলে ফেলুন।'

'অগত্যা তাই করতে হবে। আমার আবার জুতোয় হাত দিতে কি রকম গ ঘিন-ঘিন করে। পায়ের জিনিস পায়ে পায়েই খোলা উচিত। আমারই সাবধা হওয়া উচিত ছিল, এটা হল সন্ধের জুতো, সকালের নয়।'

'সে আবার কী, জুতোর আবার সকাল-সন্ধে আছে নাকি?'

'জুতোর নেই। শরীরের আছে। সারারাত ঘুমের পর সকালের শরীর হ ফুলো ফুলো, তাজা! মুখ ফুলো, চোখ ফুলো, হাত ফুলো, পা ফুলো। শরী যত সন্ধের দিকে এগোচ্ছে তত শুকোচ্ছে, চুপসে যাচ্ছে। এসব হল অ্যানাটমি ফিজিওলজির ব্যাপার। ডাক্তার হলে বুঝতে পারতিস।'

বড়মামা ডাক্তার। চেয়ারটাকে প্রথমে দু'হাতে তুলে আনার চেষ্টা করলুম বেজায় ভারী। এখন টেনে আনার চেষ্টা করলুম। ঘষটাতে ঘষটাতে আসি তেলা মেঝের ওপর দিয়ে। চেয়ার ঠেলতে বেশ মজা লাগে। ইচ্ছে করেই বে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছি। সোজা রাস্তায় আসছি না। পথ ফুরিয়ে যা তাড়াতাড়ি!

'একি, একি, অ্যাঁ ঘরের একি অবস্থা, তুই সারা ঘরে চেয়ার নিয়ে ঘু বেড়াচ্ছিস কেন! বসার জায়গা পাচ্ছিস না! ও মাগো মেঝেটার কী অবস্থা!'

দরজার সামনে মাসিমা। আমি যেখানে যেভাবে ছিলুম সেইভাবে, বড়মামা সেই একইভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে।

বড়মামা চোখ দু'টো কেবল বুজিয়ে ফেলেছেন। এটা বড়মামার নিজ টেকনিক। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলা।

সেই চোখ বোজানো অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, 'কুসী, আমি আহত।'

'তোমাকে কিছু বললেই তো তুমি আহত!'

'আমি সেভাবে আহত নই, এই দেখ আমার কপাল।'

বড়মামা মাসিমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কপালটা এর মধ্যে আরও ফুলছে থেঁতো হয়ে গেছে।'

'তোমার কপালে এই সবই লেখা আছে আমরা জানতুম!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' মাসিমার পাশে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ক্যামেরা।

মেজমামাকে দেখেই বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'ও, নো নো—নো ফটোগ্রাফ।

'ছোট্ট করে একটা। ফ্যামিলি অ্যালবামে মানাবে ভাল।'

মাসিমা মেজমামাকে থামিয়ে দিলেন, 'রাখ তো তোমার ক্যামেরা। আগে ছবি তোলা শেখ। ঠ্যার ঠ্যার করে হাত কাঁপে, ফোকাস করতে পার না! কেবল পয়সা নষ্ট।'

'হাত কাঁপে! আমার হাত কাঁপে?'

'হ্যাঁ, কাঁপে। ছবি না তুলে তোমার কম্পাউন্ডার হওয়া উচিত ছিল। জল দিয়ে পেনিসিলিন গোলাবার জন্য কসরত দরকার হত না, তোমার কাঁপা হাতে শিশিটা ধরিয়ে দিলেই আপনি গুলে যেত!'

মেজমামা একটু মুষড়ে গেলেও হেরে যেতে প্রস্তুত নন। আমার মামারা সহজে হারতে চান না। মেজমামা বললেন, 'আমি যখন রেগে যাই তখনই আমার হাত কাঁপে, তা না হলে আমার হাত ল্যাম্পপোস্টের মতই স্টেডি।'

'তোমার সবসময়েই হাত কাঁপে, তা হলে বুঝতে হবে সবসময়েই রেগে আছ। কথা বাড়িও না, যা করছিলে তাই করগে যাও।'

মাসিমাকে সুবিধে করতে না পেরে মেজমামা বড়মামার ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

'আহা, তোমার কপালটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে বড়দা। কিসে ঠুকলে অমন করে!'

বড়মামা যেন হালে পানি পেলেন। মাসিমা যেভাবে তাকিয়ে আছেন, একমাত্র কপালের জোরেই বড়মামা বাঁচতে পারেন।

'ঠোকা? ঠোকাঠুকির মধ্যে আমি নেই। ওই লক্ষ্মীছাড়া! যার নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মী, সেই লক্ষী পেছনের পায়ে ঝেড়েছে এক লাথি।'

আমি চেয়ারটা যেখানে ছিল সেইখানেই চতুষ্পদ করে রেখে, ওষুধ আর তুলো নিয়ে মাসিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকেও তো একটা বাঁচার রাস্তা বের করতে হবে। সারা মেজেতে চেয়ার টানার লম্বা লম্বা দাগ।

'এই নিন মাসীমা ওষুধ।'

মাসিমা ওষুধ আর তুলোটা হাতে নিয়ে বড়মামাকে ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি সাত-সকালে গরুর কাছে কী করতে গিয়েছিলে? তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না!'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই তো, তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না? তুমি কি পশু চিকিৎসক? তুমি তো মনুষ্য চিকিৎসক!'

বড়মামা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, কথা শোন দু'জনের। যা হয় একটা কিছু বলে দিলেই হল! তোরা জানিস না?'

'কী জানতে হবে?' মাসিমা তুলোয় লাল ওষুধ লাগালেন।

'তোরা জানিস না, আমার সব কটা কাজের লোক পালিয়ে গেছে। মাদি
গন। কুকুরগুলোকে যে দেখত সেই বিশে ব্যাটা হাওয়া। গরুটাকে যে দেখত
সেই রামখেলোয়ান সরে পড়েছে। দেন হু উইল বেল দ্য ক্যাট? তোমরাই
বল?'

'ইংরেজিটা ঠিক হল না বড়দা।' অধ্যাপক মেজমামা আবার বানান ভুল
ভাষার ব্যবহারের ভুল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

'তোমার অবশ্য দোষ নেই। তুমি তো লিটারেচারের লোক নও। সারাজীবন
প্রেসক্রিপশানই লিখে গেলে, টিডি, বিডি। তোমার বলা উচিত ছিল...।'

মাসিমা কটমট করে মেজমামার দিকে তাকাতেই মেজমামা আমতা আমতা
করে চুপ হয়ে গেলেন, যেন গান শেষ হল, 'না, মানে ভুল, মানে বেল মানে
ক্যাট দি বেল মানে, না না বেল দি ক্যাট মানে,...'

মাসিমা আবার তাকাতেই মেজমামার রেকর্ড একেবারেই থেমে গেল।

'দেখি কপালটা নীচু কর। ওঃ লম্বা বটে! তালগাছ।'

বড়মামা অভ্যর্থনা সভার সভাপতির মত কপালে যেন তিলক নিচ্ছেন।

মাসিমা একহাতে বড়মামার হাতের পেছন দিকটা ধরে সামনে ঝুঁকিয়ে আর
এক হাতে অ্যান্টিসেপটিকে ভেজানো তুলো থ্যাঁতলান কপালে চেপে ধরেছেন
বড়মামার যেন চুল কাটা হচ্ছে সেলুনে। তুলোটা কপালে চেপে ধরতেই
বড়মামা বিশাল একটা চিৎকার ছাড়লেন। মানুষ উঁচু ছাদ থেকে পড়ে যাবার
সময়েই অমন চিৎকার করে। চিৎকার শুনেই কোথা থেকে ছুটে এল বড়মামার
কুকুরদের অন্যতম, সবচেয়ে দুর্দান্ত স্প্যানিয়েল, 'ঝড়ু'। সবকটা কুকুরেরই
বাঙলা নাম। ঝড়ু, সুকু, ডাকু।

ঝড়ু বড়মামাকে বাঁচাতে এসেছে। সামনের থাবার ওপর মুখ নামিয়ে, ঝিবি
মেরে মেরে, বার কতক ঘেউ ঘেউ করে খুব খানিকটা বকাঝকা করল। যখন
দেখল মাসিমা তবু তার প্রভুকে ছাড়ছে না, তখন শাড়ির আঁচল ধরে হিড়হিড়
করে টানতে শুরু করল। ফাইন লাগছিল ব্যাপারটা। ঝড়ুর মুখটা ভারি সুন্দর
সেই মুখে আঁচলের আধখানা, পেছনের দু'পায়ে ভর রেখে, মুখটা সামান
ওপরে তুলে, টান টান, টানাটানি, টাগ অফ ওয়ার।

বড়মামার কপাল ততক্ষণে মেরামত হয়ে গেছে। মাসিমার দু'হাত এখন
মুক্ত। দু'হাতে আঁচল ধরে টানছেন। নতুন শাড়ি। সহজে ছিঁড়ছে না কুকুরেও
ছাড়ছে না। মেজমামা তারিফ করে বললেন।

'ডগ ইজ এ ফেথফুল অ্যানিম্যাল। প্রভুভক্ত জীব।'

'প্রভুভক্তি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। এই, লাঠিটা নিয়ে আয় তো।'

লাঠির নাম শুনে ঝড়ু একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর চোখ দুটো আধবোজা করে যেমন টানছিল তেমনি টানতে লাগল, ঝটকা মারতে লাগল, খোঁটায় বাঁধা প্রাণীর মত অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। বড়মামা একটু সামলেছেন। মুখ দেখে মনে হল ঝড়ুর বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে বেশ গর্বিত। তবে লাঠি থেকে বাঁচাতে হবে। ভক্তেরই তো ভগবান! বড়মামা শাসনের সুরে বললেন, 'ঝড়ু, ঝড়ু, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নো অসভ্যতা।'

উত্তরে ঝড়ু আরও মরিয়া হয়ে মাসিমার আঁচলে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল। মেজমামা বললেন, 'ঝাড়ু ছাড়া ঝড়ুর কিছু করতে পারবে না। কুকুরের সঙ্গে কুকুরের ল্যাঙ্গোয়েজেই কথা বলতে হবে।' বড়মামা কুকুরের পক্ষেই গেলেন, 'আসলে কি হয়েছে জানিস, কুকুরের তো বাঁকা বাঁকা দাঁত, কুসীর শাড়িটা তাঁতের জ্যালজেলে, দাঁতে আটকে গ্যাছে। ও টানছে না, ও দাঁত থেকে খুলে ফেলার জন্যে ছটফট করছে। দেখি, কাঁচিটা দেখি, এ কেসটা হল সার্জারির কেস।'

মাসিমা বললেন, 'শাড়িটার দাম জান? সেভেনটি সিকস্। সার্জারি নয় লাথি।'

মাসিমা সত্যি সত্যিই একটা লাথি চালালেন। ঝড়ুর গায়ে লাগল না, কিন্তু ভয়ে ছেড়ে দিল। শাড়ির আঁচলটা ফুটো ফুটো, চিবোনো চিবোনো। মাসিমার চোখে জল এসে গেছে।

'আজই নতুন শাড়িটা সবে ভেঙে পরলুম, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার কুকুর। শাড়িটার কি সুন্দর রঙ ছিল!' মাসিমার কাঁদ কাঁদ গলা শুনে মেজমামা বললেন—

'ছিল বলছিস কেন, এখনও তো সুন্দর রঙই রয়েছে! জলে পড়লে রঙ ওঠে, কুকুর ধরলে রঙ উঠবে কেন?'

বড়মামা বললেন, 'বারো হাত শাড়ির হাতখানেক কেটে ফেলে দিলেও এগার হাত থাকে। যে কোন মহিলার পক্ষে এগার হাত যথেষ্ট। কি বল?'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস ইয়েস। ইলেভেন ইয়ার্ডস'—

'তোমার ইংরেজিটা শুদ্ধ কর, ইয়ার্ড মানে গজ, হাত নয়।' বড়মামা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছেন।

নীচে 'হাম্বা' করে একটা শব্দ শোনা গেল, 'গরু খুলে গেছে, ওমা গরু খুলে গেছে, গরু যাঃ যাঃ, হায় গো, ডাঁটার ঝাড়টা নিয়ে পালাল গো!'

'কী হল মানুর মা!' মাসিমা শাড়ির শোক ভুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন।

মেজমামা বললেন, 'দাদা, তোমার ভিটামিন বি কমপ্লেকস্ গবায় নমঃ হয়ে গেল। আসল কাটোয়ার ডেঙ্গো ছিল।'

বড়মামা বললেন, 'নো ক্ষমা, আর ক্ষমা করা চলে না, সেই লাইনটা, অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—

আমরা সদরে নীচের উঠোনে নেমে এলাম। মাসিমার পেছনে ঝুলছে কুকুরে চিবোন আঁচল। পেছনে আমি। আমার পেছনে বড়মামা। বড়মামার পেছনে মেজমামা।

লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মী উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজিয়ে ডেঙ্গোর ঝাড় চিবোচ্ছে। এত চিৎকার চেঁচামেচি, কোনদিকে কোন দৃকপাত নেই। নিজের কাজ করে যাচ্ছে আপন মনে। ডাঁটা ঝাড়ের আধখানা চলে গেছে গলায়, বাকি অংশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। মাসিমা সেই বাড়তি অংশটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। যতটুকু পারা যায় উদ্ধারের চেষ্টা।

মেজমামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছেড়ে দে কুসী। পারবি না। বোভাইন-টিথের স্ট্রাকচার জানা থাকলে তুই আর চেষ্টা করতিস না। গরুর ওপর আর নীচের পাটিতে কটা করে দাঁত, কীভাবে সাজানো থাকে জানিস?'

মাসিমা বললেন, 'তোমরা জান, আমার জেনে দরকার নেই।' মাসিমা পাতা ধরে টানতে লাগলেন। লক্ষ্মী চিবিয়েই চলেছে। এক ঝটকায় মাসিমাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে টলমল করে দিয়ে লক্ষ্মী পেছন ফিরে দাঁড়াল। ন্যাজটা মাঝে মাঝে দুলছে। বিরক্তি ভাল লাগছে না তার।

কাটোয়ার ডাঁটা চিবোতে চায়। গরুটাকে দেখতে ছবির গরুর মত। সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। ন্যাজের দিকটা চামরের মত। ডগাটা কালো। শিং দুটো তেলতেলা। চোখ দুটো বড় বড় ভাসা ভাসা।

'বড়মামা, আপনার গরুটাকে ভারি সুন্দর দেখতে।'

'অতি অসভ্য গরু। একগুঁয়ে, অবুঝ। গরুর সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে দিয়েছে। মানুষের চেয়েও অসভ্য!' মাসিমা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সামলে নিলেও ভীষণ রেগে গেছেন।

'অনেকদিন তোমাকে বলেছি দাদা, তোমার এই গরু কুকুর এসব হাটাও। বাড়িতে টেঁকা যায় না। এ আমাদের কম সর্বনাশ করেছে! আদরে আদরে বাঁদর তৈরি হয়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আর মায়া নয়, আজই একে বিদায় করতে হবে। মানুর মা, আজই, এখনই তুমি এটাকে নিয়ে যাও।'

'আমি গরু নিয়ে কী করব দাদাবাবু! আমার নিজেরই থাকার জায়গা নেই। চাল নেই, চুলো নেই।'

'কেন, তোমার বাড়ির পাশের মাঠে বেঁধে রেখে দেবে। যখন দুধ হবে দুধ খাবে, দই খাবে, ক্ষীর খাবে, চেহারা ফিরে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'মাঝে মাঝে লাথিও খাবে। সভ্যতা এত বছর এগিয়ে গেল, গরু কিন্তু সেই গরুই রয়ে গেল! প্যালিওলিথিক গরু, নিওলিথিক গরু আর এই স্পেস এজ গরু, বিবর্তনের ধারাটা কত স্লো দেখেছ দাদা। আমরা কত অসম্ভবকে সম্ভব করলুম! গরু কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল, তার তরল দুধকে আমরা গুঁড়ো করে টিনে ভরে ফেলব?'

উঠোনে একটা বাঁধানো বসার জায়গা ছিল, বড়মামা তার ওপর বসে পড়লেন। চুল উড়ছে। কপালের একটা পাশ গোলাপী। ফর্সা চেহারায় বেশ মানিয়েছে। মাসিমা ডাঁটা উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে ভীষণ যেন রেগে গেলেন। সকালে বাজার এসেছে। মানুর মা সব ধুয়ে ধুয়ে রেখেছে। আলু, পটল, উচ্ছে, কুমড়ো, কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবু।

এই নে সব খা, তুইই খা।' ঝুড়িসুদ্ধ সব টান মেরে মাসিমা লক্ষ্মীর মুখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

লক্ষ্মী খুব চালাক গরু, ভেবেছিলুম পটলের সঙ্গে লঙ্কা চিবিয়ে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। লক্ষ্মী জানে কোন্‌টার পর কী খেতে হয়। সে কুমড়োটা মুখে পুরেছে। ডেঙ্গো শাক কুমড়ো দিয়েই রাঁধে। এর পরই হয়ত আলু আর পটল খাবে, সঙ্গে একটা কাঁচালঙ্কা। পেটে গিয়ে হয়ে যাবে আলু পটলের ডালনা।

মেজমামা বললেন, 'শিশু আর গরু বুদ্ধিবৃত্তিতে সমান স্তরের প্রাণী। যা পাবে তাই মুখে পুরবে। যতরকমের অপকর্ম আছে নির্বিবাদে করে যাবে। হ্যাঁ, শিশু আর গরু এক জিনিস, সেম থিঙ্গস, চেহারা ছাড়া সব এক।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে দেখ, সেই শিশু স্নেহ পায় বলেই মানুষ হয়। গরুর বেলায় উলটো। গরু স্নেহ পায় না, তাই বড় হয়েও গরুর গরুমি যায় না। হ্যাঁরে বাঙলাটা ঠিক হল তো?'

'কি বললে, গরুমি! বাঁদর, বাঁদরামি, পাগল, পাগলামি, ছাগল, ছাগলামি, গরু থেকে বোধহয় গবরামি হবে। সংস্কৃত গো শব্দ থেকে উৎপত্তি। গো, আর রামি।'

'আমরা কত স্বার্থপর দেখ? গরু মানেই আমাদের কাছে দুধ, মাখন, ছানা, দই রসগোল্লা, গব্য ঘৃত, ফুলকো লুচি!'

হঠাৎ লক্ষ্মী একটা লাফ মারল। বালতি, ঝুড়ি সব উলটে পালটে, সেই ছোট উঠোনে টাট্টু ঘোড়ার মত গোল হয়ে ছুটতে লাগল। মাসিমা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। মেজমামা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে, বড়মামা যে বেদিটায় বসেছিল সেইটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

দোতলার বারান্দা থেকে আমি বললুম, 'ওর ঝাল লেগেছে। বড়মামা, কাঁচালঙ্কা খেয়েছে।'

'একটু পরেই রতন আসবে।'

রতনের খাটাল আছে। মাসিমাই রতনের কথাটা বললেন। বড়মামা যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, কুসী! রতনের ওখানে থাকলে লক্ষ্মীটা মানুষ হবে, সঙ্গী পাবে। একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসবে। আর পাঁচটা গরুকে দুধ দিতে দেখলে নিজের দুধ দেবার ইচ্ছে হবে।'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস, কম্পিটিসন। প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে গরু ভাল রেজাল্ট দেখাতে পারবে।'

লক্ষ্মী সেজেগুজে রেডি হল। নীল নাইলনের দড়ি। গোয়াল থেকে উঠোনে এসেছে, একটু পরেই সদর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'বাবু আছেন, ডাক্তারবাবু?' ওই যে রতন এসে গেছে। গায়ে হলদেটে ফতুয়া। নীচের দিকে দু'টো পকেট, নানারকম জিনিসে ফুলে আছে। লুঙ্গিটা একটু উঁচু করে পরা। কালো তেল কুঁচকুঁচে রঙ, কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুল।

'এস, রতন এস।' ধরাধরা গলায় রতনকে ডাকলেন।

'বাঃ লক্ষ্মী তো লক্ষ্মীই, বেশ চেহারাটি! গরু হলে এইরকম গরু হওয়াই উচিত।'

'একটা রিকোয়েস্ট রতন, তুমি নজর দিও না।'

'হাসালেন ডাক্তারবাবু, ও তো এখন থেকে আমার নজরেই থাকবে। আমি চেহারা-ফেয়ারা বুঝি না, আমি বুঝি দুদ্। দুদ্ দিলে খাতির, না দিলে জুতো।'

'জুতো মানে, গরুকে জুতো পেটা'!

'না না, হিন্দুর ছেলে গরুকে জুতো মারতে পারি? মহাপাপ! গরু মেরে জুতো তৈরি হবে।'

বড়মামা চমকে উঠে লক্ষ্মীর পিঠে আঙুল ঠেকালেন। লক্ষ্মীর গা-টা কেঁপে উঠল থির থির করে। ন্যাজটা দুলে উঠলো চামরের মত।

'অবাক হবার কি আছে!' রতন বলল, 'এত জুতো তাহলে আসবে কোথা থেকে? লাখ্-লাখ্ জোড়া পা, লাখ্-লাখ্ জোড়া জুতো। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গরু বড় উপকারী জন্তু!' রতন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন চামড়া, কমসে কম একশো জোড়া জুতো হবে। এই শিং আর পায়ের খুর থেকে কেজি খানেক শিরিস তৈরি হবে। তারপর হাড়। হাড় থেকে তৈরি হবে বোন মিল। গরু কি মানুষ? মরল আর পুড়ে ছাই হল?'

বড়মামা রতনের কথা শুনে লক্ষ্মী গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। রতন তখনও শেষ করেনি কথা।

'ওই জন্যে আমরা করি কি, ফুকো দি।'

'ফুকো? সে আবার কি?'

ডাক্তারবাবু, বিজ্ঞানের কম উন্নতি হয়েছে? ফুকো হল ইঞ্জেকসান।'

'ও ইঞ্জেকসান।' বড়মামা খুশি হলেন, 'ভাল, ভাল, গরুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল হবে।'

'সে ইঞ্জেকসান নয়, দুধ বাড়াবার ইঞ্জেকসান। যে গরু আড়াই দেয় সে দেবে পাঁচ, যে পাঁচ দেয় সে দেবে দশ। ডবল ডবল দুধ, ডবল ডবল রোজগার, হ্যা হ্যা।'

'ম্যাজিক নাকি? সে তো জল মেশালেই দুধ বাড়ে!'

'তা বাড়ে, তবে দুধ বাড়লে জল বাড়ে, সব মিলিয়ে আরও বাড়ে। ফুকো দিলে গরুর রক্তটাই দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে। হিসেব করুন না, একটা গরু দশ বছর বেঁচে আড়াই সের দুধ দেওয়া লাভের, না পাঁচ বছর বেঁচে পাঁচসের দেওয়া লাভের? নিজে তো খাইয়ে দেখেছেন, গরুর খোরাক তো জানেন? যত তাড়াতাড়ি পার সব দুধ শুষে নিয়ে, জ্যান্ত কঙ্কালটাকে কষাইখানায় পাঠিয়ে দাও। হ্যা হ্যা। চল লক্ষ্মী চল।'

'বেরোও! গেট-আউট', বড়মামা পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়েছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লালা। 'চামার, তুমি গরুরও অধম। নিকালো, আভি নিকালো।'

বড়মামা ঠকঠক করে কাঁপছেন। মাসিমা দৌড়ে এসে বড়মামাকে ধরেছেন। রতন বলছে, 'কী হল, হঠাৎ! বেলাড প্রেসার মনে হচ্ছে!' মেজমামা ইসারা করে রতনকে চলে যেতে বলছেন। লক্ষ্মী গরু হলেও তার বোধশক্তি আছে। লম্বা জিভ দিয়ে বড়মামার পিঠ চেটে দিচ্ছে। তবে ওই, সামান্য একটু ভুল করে ফেলল। বড়মামার পৈতেটা তার মুখে। সে আর কী হবে! মানুষের কাজেও তো অনেক ভুল থাকে।

ফিজিওথেরাপি

মেজমামা অষ্টাবক্র মুনির মতো কাতরাতে কাতরাতে বড়মামার ঘরে এসে ঢুকলেন। ডান হাতটা কোমরে। পরনে কালো শর্টস, স্যান্ডো গেঞ্জি। গলার কাছে একটা সোনার পদক ঝুলছে। চোখে চশমা নেই, তাই, মুখটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বড়মামা সকাল থেকেই আজ ভীষণ ব্যস্ত। বড়মামার কুকুর লাকি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছে। গায়ে বুরুশ দিলেই গাদা গাদা লোম উঠে আসছে। সাতদিন আগেও বড়মামাকে দেখলে যে-ভাবে যত ঘনঘন পটাক পটাক ন্যাজ নাড়ত ইদানীং তত জোরে আর নাড়ছে না। নাড়ছে, তবে দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ধীরে ধীরে, একবার এদিকে একবার ওদিকে। ডাকেরও আর তেমন ঝাঁজ নেই। মিইয়ে মিইয়ে ডাকে। সবসময় হাত-পা ছড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে থাকে।

সেই কুকুরের জন্যে সুষম খাদ্য তৈরিতে বড়মামা ব্যস্ত। সামনে একটা বড় বই খোলা। বারে বারে পাতা উলটে যাচ্ছে বলে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, 'ধরে থাক। বই আর ছাত্র দু'পক্ষই সমান চঞ্চল। শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই তো হবে না, বইয়ের স্বভাবটাও তো দেখতে হবে। তখন থেকে খোলা রাখার চেষ্টা করছি। চশমার খাপ, পেপার ওয়েটমোয়েট কোনো কিছু দিয়েই জব্দ করা যাচ্ছে না। স্বভাব যাবে কোথায়? পাতায় পাতায় এত জ্ঞান ঠাসা, স্বভাবে নির্বোধ। ঝপাত করে বন্ধ হয়ে গেলেই হল।'

একটু আগেই বইয়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বইটার মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে বড়মামা একপাশে চাপা দিয়েছিলেন চশমার খাপ আর একপাশে একখণ্ড চৌকো কাঠ। আমি বসেছিলুম জানলায় পা তুলে। হাতে টিনটিন। মেজমামা কালই এনে দিয়েছেন। কোমর দুরমুশ করে দেবার পুরস্কার। হঠাৎ হুম্মার দুড়মুড় শব্দ। কাঠের টুকরো, চশমার ভারী খাপ দুটোই মেঝেতে। পাশাপাশি চিৎপাত। পরক্ষণেই বইটাও মেঝেতে। বড়মামার দাঁত কিড়মিড় করছে, 'রাসকেল থার্ডগ্রেড ইডিয়েট।' আমি দেখছি, দেখে যাচ্ছি।

বড়মামা বইটাকে মেঝেতে ফেলে জায়গা মতো খুললেন। তারপর সেই

খোলা বইয়ের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসেই বললেন, 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। লাইক ডগ, লাইক ক্লাব।'

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মন্তব্য করলেন, 'রাসকেল শব্দটা গালাগাল নয়। তুমি আবার মেজকে গিয়ে যেন বোলো না, বড়মামা সবসময় গালাগাল দেন।'

'বইটার ওপর ওভাবে বসলেন?'

'ওর মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে কাজ করা যাবে না। মানুষের মতো জ্বালাতনে স্বভাব হয়েছে। উনি খোলা থাকতে চান না, বন্ধই থাকবেন। এই যা ব্যবস্থা হল, এখন সারাজীবন খোলাই থাকবে, বন্ধ আর হবে না।'

মোটা রেকসিন বাঁধাই 'ডগ ম্যানুয়েল'। পাতায় পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় কুকুরের ছবি। বড়মামার ভাবে সামান্য দমে গেলেও মেরুদণ্ডের জোর এখনও বেশ প্রবল। বইটার ওপর আরও অত্যাচারের প্ল্যান হচ্ছিল। মমতা পড়ে যাওয়ায় ছুটে এসে ধরে আছি।

টেবিলের কাচের ওপর নানারকম ট্যাবলেট ফেলে শিশির পেছন দিয়ে বড়মামা গুঁড়ো করছেন। কাজে এতই ব্যস্ত, মেজমামা এসেছেন লক্ষ্যই করেননি।

মেজমামা কাতরাতে কাতরাতে বললেন, 'কোমরটা আর সোজা করতে পারছি না।'

'সারাজীবন বেঁকে বসলে সোজা হবে কী করে? বেঁকেই থাকবে।' মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন বড়মামা।

'আহা, সোজা করতে গিয়েই তো বেঁকে গেল।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী? কুকুরের ন্যাজ নাকি? সোজা করা যায় না?' বড়মামা এইবাব চোখ তুলে তাকালেন। তাকাতেই হল।

'কোমর সোজা করা যায় না মানে? এই দ্যাখ আমার কোমর। সোজা করছি, বাঁকা করছি।' বড়মামা চেয়ারে বসে বসেই মেজমামাকে কোমর বাঁকানো আর সোজা করার খেলা দেখাতে লাগলেন।

মেজমামার ডান হাতটা কোমরে। শরীরটা সামনে বেঁকে ধনুক। চেষ্টা করেও সোজা হতে পারছেন না। মুখ দেখে মনে হয় যন্ত্রণাও হচ্ছে। সেই অবস্থায় বললেন, 'তোমার কোমর আর আমার কোমরে অনেক তফাত।'

বড়মামা সামনের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, সোজা হয়ে গেলেন, 'তার মানে? কিসের তফাত? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমি কি নিজেকে অতিমানব ভাব নাকি? ও তোমার হল গিয়ে শৌখিন কোমর আর আমার হল গিয়ে মেহনতি কোমর।'

মেজমামা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সব কথাকেই তুমি বড় বাঁকা করে নাও, বড়দা। তোমার কপালে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের গুঁড়ো।'

বড়মামা কপালে হাত দিলেন। মেজমামা থামেননি, 'আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি ক্যাঁট-ক্যাঁট করে কথা শোনাতে লাগলে। আমি বলতে চাই, তোমার শরীরটা চিরকালই তো ভাল। ব্যায়াম-ট্যায়াম কর। আসন কর। আমার তো 'সে-সব নেই। কোমরটাকে না খেলিয়ে নষ্ট করে ফেলছি।'

মেজমামার কথায় বড়মামা যেন খুশিই হলেন। প্রশ্ন করলেন, 'খেলাওনি কেন? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান তোমার মাথায়, এই জ্ঞানটাই নেই, দরজার কব্জাকে যেমন খেলাতে হয় তেমনি শরীরের কব্জাকেও সচল রাখতে হয়।'

'আহা! এতদিন পরে সেই জ্ঞানটাই তো হয়েছিল। ক'দিন থেকে কনকন করছে, কনকন করছে, সকালে উঠে ভাবলুম, মাথার উপর হাত তুলে কানের পাশে চেপে ধরে হাঁটু না ভেঙে সামনে ঝুঁকি, ঝুঁকে পায়ের পাতা ছুঁই। হাঁটুটা একটু বাঁকলেও মোটামুটি হল, তারপর যেই সোজা হতে গেলুম, খটাক করে একটা শব্দ হল, আর আমি এইরকম হয়ে গেলুম।' মেজমামার মুখ কাঁদোকাঁদো।

অন্যের দুঃখে বড়মামা সবসময়েই কাতর। উঠে দাঁড়ালেন। মেজমামাকে বললেন, 'আয়, ঘরের মাঝখানে সরে আয়। ওষুধে কাজ হবে না। ফিজিওথেরাপি করতে হবে।'

মেজমামা একপাশে চেত্তা খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে সরে গেলেন। মেজমামার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। হাসি চাপবার কুঁক-কুঁক শব্দ হল কয়েকবার। ভীষণ অসভ্যতা। কী করব, চাপতে পারছি না।

বড়মামা মেজমামার কোমরে আস্তে আস্তে দু'বার চাপড় মারলেন, 'অ্যাঃ, একেবারে দরকচা মেরে গেছে। রেগুলার একে তেল খাওয়াতে হবে। জং ধরে গেছে।' দু'হাত পিছিয়ে এসে দেয়ালে ছবি টাঙাবার সময় যেভাবে বাঁকা সোজা দেখে, বড়মামা সেইভাবে মেজমামাকে দেখতে লাগলেন। 'মনে রাখ, ফর্টি ডিগ্রী নর্থ, টেন ডিগ্রি ওয়েস্ট, জিরো ডিগ্রি ইস্ট।'

বড়মামার কথা শুনে মেজমামা বললেন, 'তুমি যেন জাহাজ চালাচ্ছ?'

'এইবার বুঝবি কেন বাউলরা বলে দেহতরী। প্রথমে তোকে ঠেলে উত্তর দিকে চল্লিশ ডিগ্রি তুলব, তারপর দু'কাঁধ ধরে পশ্চিমে ১০ ডিগ্রি মুচড়ে দেব, পুবে কিছু করতে হবে না। ব্যস, আবার তুই সোজা প্রফেসার হয়ে যাবি।'

বড়মামা কুস্তিগীরের মতো হাতের তালুতে তালু ঘষলেন। মেজমামা ভয়ে

ভয়ে বললেন, 'এটা তো তোমার আসুরিক চিকিৎসা হয়ে গেল দাদা। ভীষণ লাগবে। এমনকি চিরকালের মতো আমার কোমরটা কব্জা-ভাঙা দরজার মতো ঢকঢকে হয়ে যাবে।'

'অ্যানাটমির তুমি কী বোঝ হে! মেরুদণ্ডের শেষটা কীরকম তুই জানিস? কটা হাড় আছে তুই জানিস? এই জায়গাটায় হিঞ্জ সিসটেম, তুই জানিস?'

কথা বলতে বলতে বড়মামা মেজমামার দিকে এগোচ্ছেন। মেজমামা একটু একটু করে পেছোচ্ছেন। বড়মামা বলছেন, 'তুই ভাবছিস সামনের দিক থেকে তোকে মারব? মোটেই না। পেছন দিক থেকে একটা হাত চালিয়ে দেব তোর গলার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি। কব্জিটাকে লাগিয়ে দেব গলা আর ঘাড়ের মাঝখানের খাঁজে, তারপর পেছন দিকে মারব টান।'

মেজমামার মুখ দেখে মনে হল পালাতে চাইছেন। ক্রমশ দরজার দিকে পেছোচ্ছেন। বড়মামা ধরতে পেরেছেন, 'তুই সরে-সরে দরজার দিকে যাচ্ছিস কেন? পালাবার মতলব?'

মেজমামা বললেন, 'তোমার হাবভাব আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না, দাদা। যেভাবে ব্ল্যাকপ্যান্থারের মতো গুটি-গুটি এগিয়ে আসছ! আমার ভয় লাগছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। নিজে নিজেই ঠিক করে নোব।'

'তার মানে? অবিশ্বাস? আমাকে হাতুড়ে ভাবছিস? ভাবছিস শরীরতত্ত্বের কিছুই জানি না?'

'আহা, তা ভাবব কেন? এই গ্রামে তোমার মতো অ্যালোপ্যাথ আর কে আছে? আসলে অ্যালোপ্যাথিতে আমার আর তেমন বিশ্বাস, না না, বিশ্বাস নয়, উৎসাহ নেই। আমি হোমিওপ্যাথি করাতে চাই।'

'ধ্যার, আমি কি তোকে অ্যালোপ্যাথি করছি নাকি? ফিজিওথেরাপিতে সবে যে ট্রেনিং নিয়ে এলুম গত তিনমাস ধরে, তারই প্রথম প্রয়োগ হবে তোর ওপর। এরকম একটা কেস এত সহজে ঘরে বসেই পেয়ে যাব ভাবিনি।'

'দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি। বিশ্বাস করো, আমি প্রায় সোজা হয়ে গেছি। তাকিয়ে দ্যাখো। আগের চেয়ে সোজা-সোজা লাগছে না?' মেজমামা জোর করে একটু সোজা মতো হতে গিয়ে 'আউ' করে চিৎকার করে উঠলেন।

বড়মামা শব্দ করে হেসে বললেন, 'আমার হাত না পড়লে তুই মেরামত হবি না রে মেজ!'

বড়মামা দরজা আটকে ফেলেছেন, 'চল, চল, ঘরের মাঝখানে একটু স্থির হয়ে দাঁড়া। তুই তো জানিস একসময় আমি কুস্তি লড়তুম। তুই যত চলে চলে বেড়াবি আমি আর তোকে রুগী ভাবতে না পেরে প্রতিপক্ষ ভেবে হঠাৎ একটা

আড়াই-প্যাঁচ মেরে দোব, তখন মাস তিনেক আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবি না।'

বড়মামার খাটের তলায় এক টুকরো কার্পেটের উপর লাকি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিল। শরীর ভাল না। সারাদিন শুয়েই থাকে। পেছন দিকের অল্প একটু অংশ ন্যাজ সমেত খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে। বড়মামাকে সত্যিই এবার কিংকংয়ের মতো মনে হচ্ছে। যেমন করেই হোক মেজমামাকে ধরে পেছন দিকে মটকে দেবেন। মেজমামা বেকায়দা। খাটের দিকে পিছু হটছেন।

আমি জানতুম এইরকম ঘটনাই ঘটবে। লাকির বেরিয়ে থাকা ন্যাজে মেজমামার পদপাত। অনেকদিন পরে লাকি লাফিয়ে উঠল। সেই পুরনো ঝাঁজ, সেই পুরনো চিৎকার। ঘাউ ঘাউ করে লাফিয়ে উঠেছে। খাটে মাথা ঠুকে কেঁউ কেঁউ। মেজমামার ভীষণ কুকুর-ভীতি। আচমকা লাকির চিৎকারে চমকে আনায়াসেই সোজা হয়ে গেছেন। কোমরের খটকা নিজেরই চমকানিতে খুলে গেছে।

বড়মামা টেবিল থেকে লাকির সুষম খাদ্য তৈরির সমস্ত মালমশলা সরাতে সরাতে বললেন, 'বুঝলি, ডাক্তারের কুকুরও ডাক্তার হয়। আমাকে হাত দিতেই হল না। আসিস্‌টেন্টই এক চিৎকারে তোর মেজমামাকে মেরামত করে দিল।'

আমি বললুম, 'মেজমামার পা যেন রামচন্দ্রের পা। লাকির ন্যাজে পড়তেই অহল্যা উদ্ধারের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠল। সেই থেকে কীরকম চেল্লাচ্ছে দেখেছেন। সেই পুরনো মেজাজ।'

কথাটা বড়মামার তেমন পছন্দ হল বলে মনে হল না।

বামাখ্যাপার চেলা

বিরাট প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। কলকাতার টিম আসছে আমাদের পাড়ার টিমের সঙ্গে খেলতে। বাঘাদা আমাদের ক্যাপটেন। খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে বড়মামার বাগানের নড়বড়ে পাঁচিল। ইটের খাঁজ থেকে মশলা ঝরে পড়েছে। নোনা ধরে গেছে। ইটের চাপে ইট দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে সাপের খোলস ঝুলে থাকে।

এত বড়ো একটা খেলা! বড়মামা না দেখে পারেন! তায় আবার রবিবারের বিকেল। স্টেথিসকোপের এক বেলা ছুটি। দেয়ালের গায়ে সাপের মতো ঝুলছে। সোমবার সকালে নেমে আসবে বড়মামার গলায়। সিল্কের লাল লুঙ্গি। ট্যাঁকে নস্যির ডিবে। গায়ে গোল গলা, বোতাম লাগানো, হাতাঅলা, ধবধবে সাদা গেঞ্জি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। পাড়ার দলের প্রধান সাপোর্টার হয়ে বড়মামা গোল লাইনের পেছনে। বড়মামার পেছনে আরো এক দল। আর এক দল উঠে বসে আছে বড়মামার পাঁচিলে। বড়মামা একবার একটু খুঁতুর খুঁতুর করেছিলেন। তবে এত বড়ো একটা খেলা। তাছাড়া পাঁচিলে চেপেছে আমাদেরই দলের সাপোর্টাররা।

আমাদের টিম খেলছে ভালো। তার চেয়েও ভালো আমাদের চিৎকার। মাঝমাঠ থেকে বল ওদের সীমানায় ঢুকেছে কি ঢোকেনি, অমনি আমাদের গগনভেদী চিৎকার—গোল, গোল। খেলা ড্র যাচ্ছে। শেষ হাফে আমাদের ফরোয়ার্ড লাইনের বাঘাদা বাঘের মতো বল নিয়ে, ও-দলের সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে গোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড়মামার নস্যির টিপ হাতের আঙুলে। নাকের কাছে উঠছে আবার নেমে নেমে যাচ্ছে। চিৎকার করছেন, 'ডু অর ডাই। বাঘা, ডু অর ডাই।' বাঘাদার প্রথম শট গোলকিপার ফিরিয়ে দিয়েছে। বল নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে! সাপোর্টাররা সামনে পেছনে দুলছে। গলা থেকে গোল শব্দটা গোল না হওয়া পর্যন্ত বেরোবে না। সকলেই চেঁচাচ্ছে—গোও, গোও। ওল আর হয় না। হবে কী করে? গোলের মুখে যে গুলতানি শুরু হয়েছে।

গোল হোক না হোক, এই উত্তেজনায় বড়মামার বাগানের সেই মান্ধাতার আমলের পাঁচিল কোল্যাপ্‌স্‌ করল। হই-হই রই-রই ব্যাপার। ইট চাপা পড়েও সাপোর্টাররা গোঙ গোঙ করছে। ওল আর হল না। খেলা ড্র-ই রয়ে গেল।

সকালে বড়মামা মিস্ত্রী ধরে আনলেন। রাস্তা আর বাগান এক হয়ে গেছে। নতুন পাঁচিল তো তুলতেই হবে। তা না হলে ওই সাপোর্টাররাই বাগান সাফ করে দেবে। ইট এসেছে, বালি এসেছে, সিমেন্ট এসেছে। বড়মামার মিস্ত্রী রহমতুল্লা এসেছে, সঙ্গে দু'জন মজুর। রহমতুল্লা একটা উঁচু ঢিবিতে উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর জোগাড়ে দু'জনের সঙ্গে খুব গল্প করছে। বকরিঈদের সময় খিদিরপুর থেকে পাঁঠা কিনবে।

খ্যাঁটের গল্প।

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'বড্ড ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে। নটা বেজে গেছে রহমতুল্লা।'

রহমতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে, 'হচ্ছে বাবু হচ্ছে। বেশি টিকটিক করবেন না। কাজ ভালো হবে না।'

'তাই নাকি রে ব্যাটা?'

'ব্যাটা ব্যাটা করবেন না।'

'মেজাজ দেখাচ্ছিস?'

'মেজাজ আপনিই দেখাচ্ছেন।'

'আমি দেখাচ্ছি? না তুই দেখাচ্ছিস ব্যাটা?'

'আবার ব্যাটা বলছেন?'

'ব্যাটার মানে জানিস? ব্যাটা ভূত!'

'আবার ভূত বলছেন?'

'ভূতকে ভূত বলব না, তো কি মানুষ বলব!'

বেশ মজা লাগছে। দু'জনে কেমন তরজা চলেছে। বড়মামার পাশে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। গোলমাল হই-হই মেজমামা একদম সহ্য করতে পারেন না। কারুর ছেলে কাঁদলে দৌড়ে গিয়ে বলেন, এই নে বাবা পাঁচটা টাকা, ওকে থামা। সেই মজাতেই আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, সে বেশ পেয়ে বসেছে। গেণ্ডিপেণ্ডি গোটা তিনেককে নিয়ে আসে সাত সকালে। এসেই

পেটাতে থাকে। মেজমামা থাকলে পিটুনি বেড়ে যায়। টাকার লোভে। মাসিমা দেখেশুনে বলেন, 'পৃথিবীটা শয়তানে ভরে উঠেছে।'

মেজমামা বড়মামাকে বলছেন, 'কাজ করাবে কাজ করাও, তুমি ওকে ভূতপ্রেত বলছ কেন?'

'প্রথমে আমি ব্যাটা বলেছি, ব্যাটা খারাপ শব্দ! তুই-ই বল-না। ব্যাটা মানে ছেলে। আর ভূত? ভূত তো আদর করে বলে।'

'তোমার অত বকবক, খবরদারির কী দরকার? জানই তো, ওর মাথায় একটু ছিট আছে।'

রহমতুল্লা শুনতে পেয়েছে নিচে থেকে, চিৎকার করে বললে, 'ছিট আমার মাথায় না তোমাদের মাথায়?'

মরেছে, আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে। বড়মামা জানলার পাশ থেকে হুড়মুড় করে মেজমামাকে একপাশে কাত করে দিয়ে ভেতর দিকে সরে গেলেন। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি নিচে থেকে। দাঁড়া। জানলা থেকে সরে যাওয়া মানেই বড়মামা নিচে নামছেন। ঠিক তাই। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাগানে প্রবেশ করলেন।

'অ্যাই তোকে কাজ করতে হবে না। নিকালো, আভি নিকালো।'

'নিকালো বললেই নিকালো! নটা বেজে গেছে, এখন আমরা নতুন কাজ ধরতে পারব?'

'দ্যাটস নট মাই লুক আউট।'

'আমরা যাব না, এ বাড়িতে আমরা বড়বাবুর আমল থেকে কাজ করছি, হু আর ইউ!'

'উরে ব্বাবা ইঞ্জিরি বলছিস?'

'আমরাও কইতে পারি জনাব।'

'তুমি আমার ইটে হাত দেবে না।'

'জরুর দোব। আতা, মশলা মাখ।'

'মজুরি দোব না!'

'চাই না!'

আতা হোসেন বালি মাপছে, রামভরোসা সিমেন্টের বস্তা খুলছে। বড়মামার মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। তবে শেষ প্রতিবাদ, 'তুমি আমার পাঁচিল গাঁথবে না, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি।'

'যান, যান, নিজের কাজে যান। বাইরের ঘরে অনেক রুগী জমেছে। নিজের চরকায় তেল দিল। অয়েল ইওর ওন মেশিন।'

'তুই গেঁথে দেখ, আমি রন্দা মেরে ফ্ল্যাট করে দোব।'

'বড়বাবুর আমলের লোক, তুই বলতে তোমার লজ্জা করছে না?'

'আমি বামাখ্যাপার চেলা। আমি সব্বাইকে তুই বলি। আমার শ্যামা মাকেও তুই বলি রে পাঁঠা।'

'বেশ কর। তুমি এখন যাও। ডিসটার্ব কোরো না।'

'আমার এক কথা, তুমি আমার পাঁচিলে হাত দেবে না।'

'হ্যাঁ, পাঁচিলই নেই তো পাঁচিলে হাত দেবে না। রামছাগলের মতো কথা।'

'আমি রামছাগল?'

'আমি পাঁঠা হলে তুমি তাই। আমি মানুষ হলে তুমি তাই। রামভরোসে মাখা লে আও।'

খপাস খপাস করে দু'কড়া মাখা মশলা পাঁচিলের কাছে পড়ল। 'আতা, ইটে পানি ঢাল।'

বড়মামা বললেন, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! আমার কাজ আমি তোমাকে দিয়ে করাব না। ভদ্রলোকের এক কথা।'

কর্নিকে এক খাবলা মশলা তুলে সেই ডাঁটিয়াল মিস্ত্রী ইটের ওপর থপাস করে ফেলে, একটু নেড়েচেড়ে একটা ইট বসিয়ে কর্নিকের পেছনের বাঁট দিয়ে ঠুকুস ঠুকুস করে ঠুকে দিল! বড়মামা দু'হাত পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গা-জোয়ারি হয়ে যাচ্ছে রহমত।'

'জোর যার মুলুক তার।'

তিনটে ইট গাঁথা হয়ে গেল। বড়মামা একেবারে হেলপ্‌লেস। জোগাড়েরা ঘিরে রেখেছে রাজকে! এমনভাবে জল ঢালছে, মশলা ফেলছে, বড়মামার পায়ে ছিটকে ছিটকে লাগছে। কিছু করার নেই, কাজ ইজ কাজ। রহমতুল্লা ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে সরে সরে যাচ্ছে, ইট গাঁথতে গাঁথতে। বড়মামা এমন মানুষের পেছনে কেন যে লাগতে গিয়েছিল? কাজের স্পিড কি, যেন মেশিন! কিন্তু বড়মামা যে এমন তক্কে তক্কে ছিলেন আমরা কেউই বুঝিনি। রহমতুল্লা যেই পাঁচিলের ওকোণে সরে গেছে, বড়মামা সদ্য গাঁথা ইটের সারিতে মারলেন এক লাথি। ব্যস্, গোটাকতক ইট সরে গিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারি।

রহমতুল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'কবার ভাঙবে? আমি আবার গাঁথব। দেখি তুমি হার কি আমি হারি!'

'দেখা যাক।' বড়মামার রোখ চেপে গেছে। রোদ ক্রমশ চড়ছে। বেলা বাড়ছে হু হু ক'রে। রহমতুল্লা গেঁথে চলেছে, বড়মামা ভেঙে চলেছেন। জবরদস্ত খেলা! বড়মামার রুগীরা চেম্বার ছেড়ে বাগানে চলে এসেছেন। এঁরা সব ডাক্তারবাবুর সাপোর্টার। ওপাশে রাস্তায় একদল, তারা মিস্ত্রীর সাপোর্টার। বড়মামা যেই ভাঙেন, এরা হই-হই করে। রহমতুল্লা যেই আবার গাঁথে ওরা হই-হই করে।

মেজমামা দর্শনশাস্ত্রে বুঁদ হয়ে চিলেকোঠায় বসেছিলেন। মাসিমা রান্নার কলেজে ভর্তি হয়েছেন। নোটবই খুলে চচ্চড়ি রাঁধছিলেন। দু'জনকেই ঘটনাটা জানালুম। মেজমামা উদাস গলায় বললেন, 'ভাঙচে? ভেঙে ফেলছে? ও তোমার দেখার ভুল। কেউ ভাঙতে পারে না, গড়তেও পারে না। ব্রহ্ম স্ট্যাটিক। স্থির জ্যোতিপুঞ্জ।' মাসিমা ওপরে চলে এসেছেন।

'মেজদা, তুমি থাকতে সকলের সামনে বড়দা এইরকম ছেলেমানুষি করে বংশের মুখ ডোবাবে?'

'আমাকে কী করতে বলিস?'

'তুমি বড়দাকে থামাও। ইটে লাথি মেরে পা-টা যে যাবে।'

'চল, তা হলে।'

বড়মামা লাথি মারবেন বলে সবে ডান পাটা তুলছেন, মাসিমা আর মেজমামা খপাত করে পেছন দিক থেকে আচমকা বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। রাস্তায় রহমতুল্লার সাপোর্টারদের তখন সে কী ভয়ংকর চিৎকার—হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!

গুপ্তধন

রাত তখন কটা হবে কে জানে। চারপাসে ফটফট করছে চাঁদের আলো। হু হু করে বাতাস বইছে। দক্ষিণের জানলায় লতিয়ে ওঠা জুঁইগাছটা দুলে দুলে উঠছে। বড়মামা বলছেন, 'ওঠ ওঠ, উঠে পড় শিগ্‌গির। ভীষণ ব্যাপার।' বিছানায় উঠে বসলুম। ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। ঘরে তখন নীল আলো জ্বলছে।

একই বিছানায় বড়মামা গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে মোটা সাদা পইতে। নীল আলোয় আরও সাদা দেখাচ্ছে। এক ঝলক চাঁদের আলো নাইলনের মশারি গলে বিছানায় আমাদের পাশে শুতে এসেছিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে বড়মামা? চোর এসেছে?'

'আরে না রে না, চোর আসবে কোন দুঃখে। ছ'টা ছ'রকমের কুকুর ছ' দিকে পাহারা দিচ্ছে। এলে চোরের নাম ভুলিয়ে দেবে।'

'তবে'?

'স্বপ্ন দেখেছি রে বোকা। ভীষণ এক স্বপ্ন।'

'বাঘ?'

'বাঘ নয়। গুপ্তধন।'

'কোথাকার গুপ্তধন? আফ্রিকার?'

'আজ্ঞে না, এই বাড়িতে। রাশি রাশি গুপ্তধন। নে ওঠ, উঠে পড়।'

'আজই উদ্ধার করবেন?'

'একদম বকবক করবি না। ভুলে যাবার আগে স্বপ্নটাকে আবার তৈরি করতে হবে।'

'স্বপ্ন আবার তৈরি করা যায় নাকি?'

'আবার প্রশ্ন?'

'বাঃ, আপনিই তো সেদিন বললেন, প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'

'মূর্খ, সেটা হল ধর্মশিক্ষার সময়। বেদবেদান্তের বেলায়। এখন যা বলি তাই কর।'

বড়মামা মশারি তুলে মেঝেতে নামলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি সোফার

ওপর ঘুমোচ্ছিল, সেও অমনি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ে অ্যায়সা গা ঝাড়া দিল, তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে উল্টে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। ছোট্ট একটা ডন মেরে নিল। ভেবেছে ভোর হয়েছে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। সবে রাত পৌনে তিনটে।

বড়মামা ইজিচেয়ার পাতলেন।

'ইজিচেয়ার কী হবে বড়মামা?'

'স্বপ্নে ছিল।'

'এই যে বললেন গুপ্তধন ছিল।'

'চুপ। একটাও কথা নয়। স্বপ্ন ভুল হয়ে যাবে। যা বলি মুখ বুজে করে যাও। এই আমি ইজিচেয়ারে বসলুম।'

বড়মামা যেই বসলেন, লাকি কোলে উঠে পড়ল। নামাতে গেলুম, বড়মামা বললেন, 'থাক থাক, আমার স্বপ্নে ছিল। তুমি ওই দরজার সামনে দাঁড়াও।'

নির্দেশ পালন করতেই বড়মামা বললেন, 'ভেরি গুড, তুমি হলে মা লক্ষ্মী। তা হলে এই হল গিয়ে তোমার স্বপ্নের ফার্স্ট পার্ট। আমি ইজিচেয়ারে বসে লাকির গায়ে হাত বুলোচ্ছি। বেশ, এই আমি হাত বুলোলুম। দরজার কাছটা হঠাৎ আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল। চমকে তাকাতেই তোমাকে দেখলুম।'

'আমাকে?'

'আহা, তোমাকে কেন দেখব? দেখলুম মা-লক্ষ্মীকে। দরজার সামনে ঝলমল করছেন। তুমি কি ঝলমল করছ? ম্যাড়ম্যাড় করছ। জিজ্ঞেস করলুম, মা, আপনি কে? উত্তর দাও।'

'বাবা সুধাংশু, আমি মা-লক্ষ্মী, আমাকে চিনতে পারছ না?'

'ভেরি গুড। ভেরি গুড। অবিকল মা-লক্ষ্মী আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তুই কী করে জানলি?'

'তা জানি না।'

'মনে হয় মা তোর ওপর ভর করেছেন। আচ্ছা, এরপর মা কী বললেন বল তো?'

'আমাকে চিনতে পারলে না বাবা সুধাংশু। আমাকে তুমি ঠাকুরঘরের পটে রোজই দেখ। তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কী বর চাও বলো?'

'আঃ ভেরি গুড' ভেরি গুড। ঠিকই প্রায় বলেছ, তবে শেষটায় একটু গণ্ডগোল করে ফেলেছ। মা রেগে বললেন, 'ব্যাটা আমাকে তুই চিনবি কী করে? কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। গাড়ি কেনার সময় রোজ

আমার পটের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঠুকতে, মা আরও চারটি রুগী এনে দাও, রুগী এনে দাও। মায়ের প্রাণ। সন্তান চাইছে রুগী। ফেরাই কী করে। ঝাঁক-ঝাঁক প্যাঁচা ছেড়ে দিলুম। ফসল খেয়ে ফাঁক করে দিলে। রেশনে পচা চাল এল। খেয়ে সব কাত। তোর রুগী বেড়ে গেল। এখন আর আমাকে চিনবে কেন?'

'আমি অমনি দুম করে লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলুম।'

বড়মামা সত্যি সত্যিই লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। ইজিচেয়ারে মানুষ একবার ঢুকলে সহজে শরীর বের করতে পারে না। ওঠার সময় হাঁচরপাঁচর করতে হয়। বড়মামা কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন 'আমি তখন মাকে বললুম, মা, পায়ের ধুলো দাও মা, এ দীনের অপরাধ তুমি মার্জনা করো মা। এমনি ভাবে নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিতে গেলুম।'

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

'আপনি আমার পায়ের ধুলো নেবেন নাকি?'

সামনে ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, 'ধ্যার বোকা, ধুলো নেবার আগেই তো মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তুইও অদৃশ্য হয়ে যা।'

'আমি কী করে অদৃশ্য হব? আমি কি স্বপ্ন।'

'গাধা। তুই দরজা খুলে ছাদে চলে যা। চট্ করে যা। কতক্ষণ নিচু হয়ে থাকব? কোমর টনটন করছে।'

'কত দূরে যাব বড়মামা?'

'দরজার পাশে পাশে লুকিয়ে থাকবি।'

নির্দেশ-মতো ছাদের দরজা খুলে পাশে জুঁইগাছের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে রইলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, বড়মামা সামনে আর একটু ঝুঁকে পড়েই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ কী মা, তুমি গেলে কোথায়? মা, মা।'

আড়াল থেকে আমি বললুম, 'এই যে আমি এইখানে বাবা সুধাংশু।'

স্কুলের থিয়েটারের ডায়ালগ আজ খুব কাজে লেগে যাচ্ছে। বড়মামা কিন্তু ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে এলেন, 'কে তোকে উত্তর দিতে বলেছে! স্বপ্নে মা কি আমায় উত্তর দিয়েছিলেন? মা তো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।'

বড়মামা রেগে গিয়ে গজগজ করতে লাগলেন। আমি কী করে জানব? স্বপ্ন কি আমি দেখেছি, না মামা দেখেছেন। আগে থেকে রিহারসাল দেওয়া না থাকলে অভিনয়ে গোলমাল তো হবেই।

বড়মামা বললেন, 'এইরকম উলটোপালটা করলে স্বপ্ন তৈরি করা যায় না। বারে বারে তুই আমার ভাব নষ্ট করে দিচ্ছিস। দু'-একটা উত্তর শুনে ভেবেছিলুম তোর ওপর মা বোধহয় ভর করেছেন। এখন দেখছি সব বোগাস।'

ধমক খেয়ে জুঁইগাছের পাশে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক আছে। নিজের থেকে আর কিছু করব না। এবার যা বলবেন তাই করব।

বড়মামা দরজার বাইরে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, আমি ছাদে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালুম, হ্যাঁ দাঁড়ালুম। তারপর কী হল। মা অদৃশ্য হয়েছেন। চাঁদের আলোয় ফিনিক ফুটছে। কেউ কোথ্থাও নেই। ভীষণ ভয় করছে। হঠাৎ ওই যে, ওই তো ওইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি দেখতে পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম। চাঁদের আলোয় মা আমার ঝমঝম করে উঠলেন। কিন্তু কোন্‌দিকে?

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন্‌দিকে বল তো? স্বপ্নে যে দিক ঠিক থাকে না। সব কিছু কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে ছড়িয়ে থাকে।'

একটু আগে ধমক খেয়েছি। অভিমান হয়েছে। আমি বললুম, 'আপনার স্বপ্ন আমি কেমন করে বলব?'

'রাগ করছিস কেন? একটু সাহায্য কর না। গুপ্তধন পেয়ে গেলে হিমালয়ে গিয়ে একটা পাহাড় কিনব। বরফ-ঢাকা পাহাড়। সেই পাহাড়ে টানেল কেটে একটা আধুনিক গুহা বানাব। সেই গুহায় সব-কিছু থাকবে। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, টিভি, লাইব্রেরি, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, একটা হেলিপ্যাড, হেলিকপ্টার। আমেরিকা থেকে ইন্‌জিনিয়র আনিয়ে জেমস বন্ড ছবির কায়দায় সব তৈরি করাব। একটু সাহায্য কর না রে। পেয়ে গেলে তোর আর আমার দুজনেরই বরাত ফিরে যাবে। তোর এই ঘ্যানর ঘ্যানর পড়া আর আমার ওই ছুঁচ ফোটানো, সব ছেড়ে মনের আনন্দে হিমালয়ে গিয়ে উঠব। চমরিগাইয়ের দুধ চিনি দিয়ে মেরে ঘন করে পাথরের বাটিতে ঢেলে বরফের গর্তের মধ্যে রেখে দোব। জমে আইসক্রিম। রোজ আমরা কাপ কাপ আইসক্রিম খাব। পাহাড়ের গা বেয়ে কাবুলি ফেরিঅলারা হেঁকে যাবে, হিং চাই সুর্মা। সঙ্গে সঙ্গে দশ কেজি বারো কেজি আখ্‌রোট, কিশমিশ, খুবানি, মনাক্কা, বাদাম কিনে নোব। আইসক্রিমে একবারে গিজগিজে করে দোব। বল না রে কোন্‌দিকে? এদিকে না ওদিকে?'

'আচ্ছা' মা-লক্ষ্মী যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিকে আর কিছু কি ছিল? পেছনে, সামনে, পাশে, মাথার ওপর?'

'দাঁড়া, ভেবে দেখি। হ্যাঁ, মাথার ওপর অ্যাসবেসটাসের চালের একটা অংশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল, তারই ছায়া পড়েছিল মায়ের মুখে।'

'ব্যস্‌, আর বলতে হবে না। পেয়ে গেছি। ওই যে ওই জায়গাটায়। ঠাকুরঘরের পাশে তুলসীগাছের টবের কাছে।'

'উঃ, তোর মাথা বটে। ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, ওখানে গিয়ে একবার দাঁড়া তো। দূর থেকে দেখি।'

'বড়মামা, আপনি এত সব করছেন কেন? মা লক্ষ্মী কী বললেন, সেইটা মনে পড়লেই তো হয়ে গেল।'

'অ্যায়, ওই জন্যেই তোর ওপর রাগ ধরে যায়। তুই কখনও গাধা, কখনও পণ্ডিত। মা-লক্ষ্মী ছাদে দাঁড়িয়ে বললেন, এদিকে আয়।'

কাছে গেলুম। বললেন, 'তোদের বাড়িতে গুপ্তধন আছে।'

আমি বললুম, 'কোথায় আছে মা?'

হাসি-হাসি মুখে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশের দেয়ালে হাত রেখে বললেন, 'এই লিখে দিলুম।'

'কী লিখলেন মনে আছে?'

'মনে হয়, মনে হয়—'

'মনে করুন, মনে করার চেষ্টা করুন।'

'মনে হয়, মনে হয়—' বড়মামা ঘাড় চুলকোতে লাগলেন। 'মনে হয় লিখলেন, ক, খ, গ, ঘ। ওই জায়গায় চল তো, দেখি সত্যিই কিছু লেখা আছে কি না!'

আমরা দুজনে ঠাকুরঘরের কাছে গেলুম। ছাদে যেন দুধের মতো চাঁদের আলোর ধারা বইছে। ঠাকুরঘরের দেয়ালে অনেকদিন আগে বালির কাজ করা হয়েছিল। বছরখানেক হল রঙ পড়েছে। দেয়ালে কোথাও কোনও লেখা নজরে পড়ল না। বড় ইচ্ছে ছিল মা-লক্ষ্মীর হাতের লেখা দেখব।

বড়মামা ভীষণ হতাশ হয়ে বললেন, 'কী হল বল তো? জায়গাটা মনে হয় ঠিক হল না।'

'স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় বড়মামা, তা হলে পরীক্ষার আগে স্বপ্নে যেসব প্রশ্ন দেখি তার একটাও অন্তত আসত।'

বড়মামা আবার রেগে গেলেন, 'তুমি ঘোড়ার ডিম জানো। লিঙ্কন স্বপ্ন দেখে মারা গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, কোথায় যেন পড়েছি।'

'পড়েছ যখন তখন অবিশ্বাস করছ কেন? ইংল্যান্ডে জে ডব্লু ডান নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন, জানো কি?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে স্বপ্নকে অবিশ্বাস করছ কেন?'

'তিনি কে ছিলেন?'

'একজন ইনজিনিয়ার। যা-তা নয়, উড়োজাহাজের ইনজিনিয়ার, বিজ্ঞানী। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর হাতঘড়িটা রাত সাড়ে চারটের সময় বন্ধ হয়ে

গেছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখলেন, সত্যিই তাই—ঘড়ি সাড়ে চারটে বেজে অচল হয়ে আছে। কী বুঝলে, তোমার কিছু বলার আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'সেই ডানসায়েব আর-একদিন স্বপ্ন দেখলেন, পৃথিবীর কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে, শত শত লোক লাভাস্রোতে পুড়ে মারা গেছে। মৃতের সংখ্যা চার হাজার। তিনি স্বপ্নে খবরের কাগজের হেডলাইনও পড়ে ফেলেছিলেন। পরের দিন কাগজ খুলেই চমকে উঠলেন প্রথম পাতার খবর বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন, মার্টিনিতে অগ্ন্যুদ্গার, মৃত চার হাজার। পরের দিন আবার ভ্রম সংশোধন—মৃত চার নয়, চল্লিশ হাজার। তার মানে স্বপ্নে কাগজ পড়ার সময় ডানসায়েব চল্লিশকে চার হাজার পড়েছেন, শূন্যের গোলমাল। কিছু বলার আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে?'

'তা হলে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, কিছু কিছু লেখা আছে যা জলে ভেজালে তবেই পড়া যায়। মা-লক্ষ্মী মনে হয় সেই রকম কোনও কালি ব্যবহার করেছেন। দেয়ালটাকে জলে ভেজালে তবেই পড়া যাবে।'

'আঃ, সাংঘাতিক বলেছিল। তোর মাথাটা আমি বাঁধিয়ে রেখে দোব।'

খড়াস করে একটা শব্দ হল। বড়মামা চমকে উঠলেন। ছাদের ও-মাথায় মেজমামার ঘর। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। বড়মামা ঠোঁটে আঙুল রাখলেন, মানে একটাও কথা নয়। মেজমামা কবি মানুষ। দু'পাশে দ'হাত মেলে চাঁদের আলো ধরছেন। সাবান মাখার মত গায়ে মাখছেন। বড়মামা বললেন, 'গুঁড়ি মেরে মেরে ঘরে চলো। দেখতে না পায়।'

মেজমামা বলছেন, 'কে, কে ওখানে?'

আর কে। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিয়েছি। লাকিটা তিন লাফে ঘরে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়েছে।

সকালবেলার চায়ের টেবিল।

আমার মেজমামা সব সময় ফিটফাট। চোখে ইয়া মোটা পুরু ফ্রেমের চশমা। দু'পায়ের মাঝে চটির ওপর পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে দিশি ধুতির কোঁচা। সামনে বোতাম লাগানো, হাফ হাতা, গোলগলা গেঞ্জি। ধবধব করছে সাদা। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল।

মেজমামা চেয়ারে এসে বসেছেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ। মুখ

তোলার অবসর নেই। টেবিলে কাপ ডিশ চামচ এসে গেছে। চিনির পাত্র, দুধের পাত্র এসে গেছে, চা এল বলে। বড়মামার দেখা নেই। অন্যদিন বড়মামাই আগে এসে বসেন, আর দানা দানা চিনি খান। আমি জানতুম আজ আসতে একটু দেরি হবে। আমি এখন বড়মামার গুপ্তচর হয়ে বসে আছি। মেজমামার গতিবিধির দিকে নজর রাখছি। নড়াচড়া কি ওঠাব চেষ্টা করলেই যে-কোনও একটা পড়ার প্রশ্ন করব। এই ঘরে মেজমামাকে যেমন করেই হোক আটকে রাখতে হবে। বড়মামা এখন দেয়াল জল দিয়ে ভিজোচ্ছেন। সত্যিই যদি ক, খ, গ, ঘ লেখা ফুটে ওঠে, তা হলে আজ রাত থেকেই শুরু হয়ে যাবে গুপ্তধন খোঁজার কাজ।

মেজমামা কাগজ থেকে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন। খুবই সন্দেহজনক। হঠাৎ না উঠে পড়েন। মাসিমা কী করছেন। চা এসে গেলে বাঁচা যায়। কড়া নিয়ম। পাঁচ মিনিট ভিজবেই। মেজমামা উঠে দাঁড়ালেন।

'কী হল মেজমামা?'

'চায়ের এখনও দেরি আছে মনে হচ্ছে। যাই, আর একটা কাজ ততক্ষণ সেরে আসি।'

'না না, দেরি নেই। এখুনি আসবে।'

'কী করে জানলে? চা তো তুমি কর না, চা করে কুসী।'

'মেজমামা, একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে।'

'কী জিনিস?'

'বসুন বলছি।'

'আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব। তুমি বলো।'

'এই বড়মামা, প্রায়ই আপনার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেন।'

'কী বলে?'

ব্যস্ ওষুধ ধরে গেছে। মেজমামা বসে পড়লেন, 'কী, বলে কী?'

'বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার চেষ্টা করাটাই অন্যায়। কিছুই হয় না, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। গোরুর জাবরকাটার মতো।'

'আচ্ছা, তাই নাকি? উনি এবার ডাক্তারি ছেড়ে কাব্য-সমালোচক হলেন। এর নাম কি জান? অনধিকারচর্চা। শুনবে তা হলে আমার একটা কবিতা! কাল সারারাত ধরে লিখেছি। দাঁড়াও, খাতাটা নিয়ে আসি।'

মরেছে রে! এইবার আমি কী করি। মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

'মেজমামা, আপনি বসুন, খাতা আমি নিয়ে আসছি।'

'তুমি খুঁজেই পাবে না। সে আমি এক গোপন জায়গায় রেখে এসেছি।'

'আমাকে বলে দিন, ঠিক নিয়ে আসব। আপনি আবার ওপরে উঠবেন, আবার নীচে নামবেন, কী দরকার।'

'কেন, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? গোটা দুয়েক চুল পাকলে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়! ঘোড়ার ডাক্তারের ওসব কথায় কান দিও না, পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

আর বোধহয় মেজমামাকে আটকানো গেল না, দরজার কাছে চলে গেছেন। বড়মামার এজেন্ট হিসেবে একেবারে ফেল করেছি। যাক, ভগবান বাঁচালেন। বড়মামা আসছেন। এবার মেজমামা যেখানে খুশি যেতে পারেন। মেজমামা বড়মামার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঃ করে একটা শব্দ করলেন। বড়মামা তেমন খেয়াল করলেন না। নিজের আনন্দেই মশগুল। ঘরে ঢুকে বললেন, 'পেয়ে গেছি, একেবারে স্পষ্ট। স্বপ্ন আমার কোনও দিন মিথ্যে হয়নি, সেই ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখলুম মাসিমার সিকেতে পুলিপিঠে ঝুলছে। স্পষ্ট স্বপ্ন, যেন কড়িকাঠ থেকে টিকটিকি হয়ে ঝুলতে ঝুলতে দেখছি। স্কুল থেকে ফেরার পথে গিয়ে দেখি ঠিক তাই।'

'কালির লেখা বড়মামা?

'মা-লক্ষ্মী কালি কোথায় পাবেন। প্ল্যাস্টারে সব চুলের মতো ফাট ধরেছে অলৌকিক ফাটল। যেই জল পড়ল অমনি স্পষ্ট ফুটে উঠল, ক, খ, গ, ঘ। কাউকে বলবি না। টপ সিক্রেট।'

'মেজমামাকে আটকাতে পারছিলুম না, তাই আপনার নাম করে রাগিয়ে এতক্ষণ ধরে রেখেছিলুম। এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে পালালেন। এখুনি আসছেন কবিতা শোনাতে।'

'উঃ সর্বনাশ করেছে। এর চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল ছিল রে। কী বলেছিস?'

'সেই রবীন্দ্রনাথ আর এখনকার কালের কবিতা।'

'অন্যায় কী বলেছিস? হেঁকে বল। মাইক নিয়ে বল।'

চা নিয়ে মাসিমা, খাতা নিয়ে মেজমামা প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকলেন। মেজমামা খাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন—

দিন শেষ হলে রাত আসে
রাত শেষ হলে দিন আসে
আকাশের চাকা অহরহ
ঘুরেই চলেছে, ঘুরছে।।

বড়মামা কাপের গায়ে চামচে দিয়ে টাং করে একটা শব্দ করে বললেন, 'আহা অহো!' তারপর নিজেই চারটে লাইন বানিয়ে ফেললেন—

জল জমলে মশা বাড়ে
মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া
কুইনিন খেলে জ্বর ছাড়ে
বড় হয়ে ওঠে পিলে।।

মেজমামা বললেন, 'ওটা একটা কবিতা হল?'

'তোমারটা যদি হয়ে থাকে, আমারটাও হয়েছে, পরিষ্কার মানে, নিখুঁত অন্ত্যমিল।'

'আর আমারটা?'

'তোমারটা পাগলের প্রলাপ! বিকারের রুগীর প্রলাপ, অনেকটা এই রকম—

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে
ভূতের বেগার খেটে মরে
হাত ঘুরালে নাড়ু পাবে
নইলে, নাড়ু কোথায় পাবে।।

মাসিমা বললেন, 'মরেছে, সাতসকালেই শুম্ভ-নিশুম্ভ শুরু হল। পয়সা থাকলে দুটোকেই আমি হস্টেলে পাঠিয়ে দিতুম।'

মেজমামা বললেন, 'দ্যাখো দাদা, সমালোচনা মানে ব্যঙ্গ করা নয়। কবিতার তুমি কী বোঝ হে! পরের চারটে লাইন শুনলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করবে—

জাঁতায় পড়েছে মানুষ
অহঙ্কারের ফানুস
জীবনের চাপে চোখ ঠেলে আসে
মরণ মরে না তবু।।

বড়মামা বললেন, 'অহো, অহো, হৃদয়ের চাপ সহিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা।।'

মাসিমা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের তর্জা থামাবে, নয়তো ওই দরজা আছে।'

মাসিমার কথায় কাজ হল। দুজনের ঠোঁটই চায়ের কাপের দিকে নেমে এল। মাসীমার কাছে দুজনেই জব্দ।

মেজমামা কয়েক চুমুক চা খেলেন। দু-একবাব জানলার বাইরে রোদের দিকে তাকালেন, তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, 'আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বাঃ, এই তো আমার লক্ষ্মী ছেলে, এতদিনে বুঝলে তাহলে, কবিতা লেখা সহজ কাজ নয়।'

মেজমামা বড়মামার কথা কানেই তুললেন না, আপন মনেই বলে চলেছেন, 'এতদিনে, আমি নিঃসন্দেহ, এ বাড়িতে ভূত আছে।'

বড়মামা বললেন, 'অবশ্যই আছে। আমি বহুবার দেখেছি।'

আমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, 'খুব ভয় দেখিয়ে দি, আমাদের কাজের সুবিধা হবে। গুপ্তধনের কাজ খুব গোপনে করতে হয়, আমি বইয়ে পড়েছি। ওর চেহারাটা দেখেছিস, ঠিক ভিলেনের মতো। লাস্ট মোমেন্টে গুপ্তধন নিয়ে সরে পড়তে পারে। তুই আমাকে সাপোর্ট করে যা।'

মেজমামা বললেন, 'ছাদ বড় ডেন্‌জারাস জায়গা বড়দা। সব বাড়ির ছাদেই একটা না একটা কিছু থাকে। গুলি গড়ায়, বল চলে বেড়ায়, পায়ের শব্দ শোনা যায়, ধুপধাপ আওয়াজ হয়। বাড়িতে ওই জন্যে ছাদ রাখতে নেই।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'বললি বটে। ছাদ ছাড়া বাড়ি হয়!'

'কেন হবে না, ঢালু ছাদ কর, টিনের চালা কর, খড়ের চাল কর, যাতে ভূতের পা স্লিপ করে।'

'ভূতের আবার পা হয় নাকি!'

'নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে শব্দ করে কী করে! মাঝ-রাতে লোহার বল নিয়ে খেলে কী করে! কাল রাতে আমি এক জোড়া ভূত দেখেছি। অবিকল মানুষের মতো চেহারা, কেবল সামান্য একটু কুঁজো। কিছু মনে কোরো না বড়দা, ভূতের চেহারার সঙ্গে তোমাদের চেহারার অদ্ভুত মিল আছে। আমি কাল বড় ভূত, ছোট ভূত একসঙ্গে দেখেছি। তবে এও দেখলুম, ভূত মানুষকে ভীষণ ভয় পায়। আমাকে দেখে কুঁজো হয়ে ভূতজোড়া পালাল। পুরোহিতমশাইকে ডেকে একটু শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাতে হবে। তিলপড়া, সরষেপড়া, জলপড়া।'

শেষ চুমুক চা খেয়ে মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে গটগট করে চলে গেলেন।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো, ঠিক ধরতে পারলুম না হে! এ যেন সেই, তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায় গোছের চরিত্র। সাবধান। স্বপ্নের কথা কেউ যেন জানতে না পারে, বুঝলে।'

বড়মামা নিজের জন্যে আর এক কাপ চা তৈরি করলেন।

মোক্ষদা এসে বললে, 'তিনজন রুগী এসে বসে আছে গো! বলছে, ছিরিয়াছ কেছ।'

বড়মামা উদাস সুরে বললেন, 'হ্যাঃ, সবই সিরিয়াস।'

ঠাকুরঘরের দেয়ালের প্লাস্টার জলে ভেজালে, চুল-চুল ফাটা বেড়ালের নখের আঁচড়ের মতো ফুটে উঠেছে। ভাল করে তাকালে, সত্যিই ক খ গ ঘ চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। বড়মামাকে মজা করে বলেছিলুম, এখন নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্বপ্ন তাহলে সত্যি। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সব সময় এত বড় একটা সাদা প্যাঁচা ঘোরে। প্যাঁচার বড় বড় নখ আছে। সেই নখের লেখা। মামারা একসময় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাড়িতে, রাজবাড়িতে গুপ্তধন থাকে, আমি বইয়ে পড়েছি।

দেখি, মা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে পায়ের ছাপ পড়েছে কি না! নিচু হতেই চকচকে কী একটা নজরে পড়ল। কী রে বাবা! আরে এ যে দেখছি সোনার দুল। মায়ের কান থেকে খুলে পড়ে গেছে। থানায় গিয়ে জমা দেওয়া উচিত। ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি, পরের দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলেও গ্রহণ করা উচিত নয়। এখন আমার কাছে থাক, বড়মামা কলে গেছেন। ফিরে এলে, পরামর্শ করে যা হয় কিছু করা যাবে।

বেলা দুটো নাগাদ বড়মামা ফিরে এলেন। আশ্বিনের রোদে মুখ-চোখ লাল জবাফুল। এক হাতে ডাক্তারি ব্যাগ, আর-এক হাতে খানচারেক ঘুড়ি। মাসিমা বললেন, "তুমি কি ভিজিটের বদলে টাকা ফেলে ঘুড়ি নিয়ে এলে? অবশ্য গ্রামের ডাক্তাররা লাউ, কুমড়ো, কাঁচকলা ভিজিট পায়। ভালই করছে।'

অন্য সময় হলে বড়মামাতে মাসিমাতে লেগে যেত। আজ বড়মামার মুখে দেবতার হাসি।

কোনও রকমে খাওয়াদাওয়া সেরে বড়মামা ঘরে এসেই দরজা দিলেন। অন্যদিন এই সময়ে একটু শুয়ে পড়েন, আজ মেঝেতে বাবু হয়ে বসলেন। আমি বড়মামার ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে, জানালায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে, ট্রেজার অ্যাইলন্ড পড়ছিলুম।

বড়মামা বললেন, 'আয়, নেমে আয়। আমাদের এখন অনেক কাজ। অনেক মাথা খাটাতে হবে। ক খ গ ঘ-র রহস্য উদ্ধার করতে হবে। মা একটা সঙ্কেত রেখে গেছেন। সেই সঙ্কেত উদ্ধার করতে হবে। অনেক ভেবে একটা কোড উদ্ধার করেছি।'

'কোন্‌টা?'

'ঘ। ঘ-এ ঘুড়ি। চারখানা ঘুড়ি কিনে এনেছি।'

'ঘুড়ির সঙ্গে গুপ্তধনের কী সম্পর্ক!'

'উঃ তোর মতো অশিক্ষিত আমি খুব কম দেখেছি। একটু যদি লেখাপড়া করতিস! রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন।'

'আজ্ঞে পড়েছি। ওই সবই তো আমি পড়ি।'

'তাই যদি পড় বাছা, তাহলে বোঝ না কেন, গুপ্তধনের আগে সঙ্কেত, পরে একজন কুচক্রী শয়তান, তারপর এক রাউন্ড ফাইট, তারপর গুপ্তধন। মনে পড়ে গুপ্তধন গল্পে সন্ন্যাসী হরিহরকে যে তুলট কাগজ দিয়েছিলেন, তাতে কী লেখা ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এতবার পড়েছি একেবারে মুখস্থ—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে।
ঈশান কোণে ঈশানী
কয়ে দিলাম নিশানী।।'

'বাঃ ফাসক্লাস। ওই ধাঁধাঁ ভেঙে মৃত্যুঞ্জয় কী পেল?'

'আজ্ঞে ধারাগোল, একটা গ্রামের নাম।'

'ভেরি গুড। বুঝলি, রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ। এসো, তাহলে আমাদের সংকেতের অর্থটা উদ্ধার করে ফেলার চেষ্টা করি। ক। ক মানে কী?'

'ক মানে ক।'

'তোমার মাথা, ওইজন্যে রাগ ধরে। ক দিয়ে কী কী হয়, কী কী শব্দ, গবেট।'

'আজ্ঞে কালি, কলম, কাজল, কমলা, কয়লা, কলস, কেবল, কলা, কদম, কমল, কুসুম, কালা, কিল, কুল, কাঁটা, কাদা।'

বড়মামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'বড় ডেঁপো হয়ে গেছ।'

'বাঃ, ক-দিয়ে যা যা মনে আসছে বলছি। এই তো বললেন, ক দিয়ে যে শব্দ হয় বলতে।'

'ওভাবে হবে না অভিধান আনো।'

'মেজমামার ঘরে।'

'ঘরে আছে?'

'না কলেজে।'

'নিয়ে এসো। আনার সময় দেখে আসবে, কীভাবে রাখা ছিল। ফেস ডাউন অর ফেস আপ, রাখার সময় সেইভাবে রেখে আসতে হবে, যেন ধরতে না পারে। বুঝলে?'

অভিধান নিয়ে ফিরে এলুম। বড়মামা বললেন, 'ক-এর এলাকায় ঝট করে একটা পাতা উলটে ফেল। কী পেলি?'

'আজ্ঞে, করকচ, করকচি, করকর, করকা, করগ্রহ, করঙ্ক, করঙ্গ, করঞ্জা।'

'ফেলে দে, ফেলে দে। কিস্যু নেই ওতে। হোপলেস, হোপলেস। আবার খোল। মুড়ে ঝপাস করে খোল। কী পেলি?'

'আজ্ঞে, কোঁ, কোঁক, কোঁকড়া, কোঁড়, কোঁত, কোঁৎকা।'

'ধ্যাত, তোমার হাতে ভাল কিছু উঠবে না। তখনই সাবধান করেছিলুম, অত মুরগির ডিম খেও না, গলা দিয়ে কোঁকর কোঁ-ই বেরোবে! দাও, আমার হাতে দাও। তোমার হাত নষ্ট হয়ে গেছে।'

বড়মামা অভিধান নিয়ে ঝট করে একটা জায়গা খুললেন।

'কী পেলেন বড়মামা?'

করুণ মুখে বললেন, বীভৎস! কল্কী, কল্প্য, কল্মষ, কল্মা, কশ, কশা, কশাড় কশিদা। ফেলে দে, ফেলে দে। এভাবে হবে না। এইসময় বেশ মাথাঅলা একজন কাউকে পেলে বেশ হত। ক-তেই এই অবস্থা! এখনও খ আছে, গ আছে, ঘ আছে। আচ্ছা শোন।'

'বলুন।'

'গুপ্তধন তো তোর আমার একার হতে পারে না। করালীরও ভাগ আছে।'

'করালী কে?'

'যকের ধন পড়িসনি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আবার বোকার মত প্রশ্ন করছিস কেন, করালী কে? এ কেসে করালী হয়ে দাঁড়াবে মেজ। প্রথম থেকেই সে পথ মেরে দিতে হবে।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছিস?'

'আমরা করালী হয়ে যাব। উলটো রথের মতো, উলটো যকের ধন লেখা হবে। মেজমামার মাথা ভাল। মেজমামাকে আমরা দলে টেনে নোব। লাস্ট মোমেন্টে সিন্দুকটা যখন—'

'সিন্দুক নয়, চেন-বাঁধা পেতলের ঘড়া, স্বপ্নে আমি সেইরকমই দেখেছি।'

'আচ্ছা, তাই হোক, সিন্দুকের বদলে যেই ঘড়া বেরোবে, আমরা করালী হয়ে যাব।'

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মেজমামা ফিরলেন।

বড়মামার এক রুগী বড়মামাকে খুব সুন্দর বিস্কুট-রঙের একটা টি-সেট প্রেজেন্ট করেছেন। ভদ্রলোকের মেয়ে সেলাই করতে পাখিছুঁচ খেয়ে ফেলেছিল। বাঁচার আশাই ছিল না। ছুঁচ রক্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও পেটে খোঁচা মারে, কখনও বুকে খোঁচা মারে। বড়মামা কী ভাবে যেন বাঁচিয়ে দিলেন। মনে হয়, ম্যাগনেট খাইয়েছিলেন।

বড়মামা ছোটখাটো একটা টি-পার্টি দিয়েছেন। মেজমামা আর মাসিমা নিমন্ত্রিত। সেই বিস্কুট-রঙের টি-সেটের আজ উদ্বোধন হল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর চানাচুর আছে। এক চুমুক চা খেয়ে বড়মামা বললেন, 'বন্ধুগণ, আজ তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ আছে।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'বন্ধুগণ কী বন্ধুগণ? তুমি কি নির্বাচনী সভা ডেকেছ?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'শত্রুগণ!'

মেজমামা লাফিয়ে উঠলেন, 'শত্রুগণ! আমি প্রতিবাদে চা-সভা পরিত্যাগ করছি।'

'ও, তুমি দেখি শাঁখের করাত! যেতেও কাট, আসতেও কাট। বন্ধুগণও পছন্দ নয়, শত্রুগণও পছন্দ নয়, তাহলে তোমরা আমার কে? বলে দাও।

'কেন, ভ্রাতা আর ভগিনী বলা যায় না, ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার!'

মাসিমা বললেন, 'সত্যিই, তোমরা দু'জনে একেবারে বিগড়ে গেছ। তোমাদের সংশোধনী স্কুলে দিতে না পারলে মানুষ হবার আশা নেই।'

বড়মামার কানে কানে বললুম, 'করছেন কী? এখন মেজমামাকে চটাচ্ছেন কেন? আমাদের মাথাটা চাই। তারপর তো করালী হবই।'

বড়মামা বললেন, 'ইস্, একদম ভুলে গেছি। দাঁড়া, সামলে নিচ্ছি। আমার প্রাণের ভ্রাতা, আমার প্রাণের ভগিনী!'

মাসিমা বললেন, 'না না, তোমার মতলব ভাল নয়। সেবারের মতো আবার বাইরে যাবার তালে আছ। আমার ঘাড়ে যত কুকুর, বেড়াল, গরু, মোষ। ওসব আর আমি সামলাতে পারব না।'

'বৎসে, স্থিরোভব। তোমাদের এখন আমি যে সংবাদ দোব, তা শুনলে তোমরা দু'জনেই তাথৈ তাথৈ করে নৃত্য করবে। আমি এই বাড়িতে অবশেষে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। আমাদের কোনও এক পূর্বপুরুষের সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার।'

মেজমামা হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ করে গলার এক অদ্ভুত শব্দ করলেন।

মেজমামা বললেন, 'এর মানে?'

বড়মামা এবার পা নাচাতে নাচাতে সেইরকম শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, 'অবিশ্বাস করছিস?'

মেজমামা এবার নিজেকে ভাঙলেন, 'আমিও পেয়েছি বিগ ব্রাদার!'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ, ক খ গ ঘ!'

বড়মামা চমকে উঠলেন। মুখ দেখে মনে হল চোপসানো বেলুন। আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক! তুমি ডবল এজেন্ট হয়ে বসে আছ!'

'যাব্বাবা, যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমি কিছুই জানি না বড়মামা। মেজমামাকে আমি কিছুই বলিনি।'

'তাহলে জানল কী করে?'

'তা আমি জানি না, মেজমামাকে জিজ্ঞেস করুন।'

মেজমামা বললেন, 'তুমি যেভাবে জেনেছ, আমিও সেইভাবে জেনেছি। একই স্বপ্ন দু'জনে, একই সময়ে দেখেছি।'

'তা কখন হয়!'

'এই তো হয়েছে।'

'তুমি ক খ গ ঘ-এর রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছ?'

'তুমি পেরেছ?'

'না।'

'আমিও পারিনি।'

'এসো তাহলে, হাত মেলাও।'

'মেলাও।'

মাসিমা চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, 'নাও, এবার আর এ পাগলামি শুরু হল। বিরাশি সালে গুপ্তধন! লোকে শুনলে হাসবে।'

মাসিমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুই মামা বসলেন, রহস্য-সমাধানে।

বড়মামা বললেন, 'তাহলে ক দিয়ে শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ, ক। ক হল এই বাড়ির এমন একটা অংশ যার প্রথম অক্ষর ক। এই চৌহদ্দির মধ্যে আছে, বাইরে কোথাও নেই। নাও, এইবার খুঁজে বের করো। পরিধি অনেক ছোট হয়ে এল কেমন?'

'উঃ, তোর মাথা বটে! নাঃ কবিতাটা তুই ভালই লিখিস!'

'বলছ! পরে আবার মত পালটাবে না তো?'

'নেভার।'

'ভাগনে, ক দিয়ে কী কী আছে, আমরা বলে যাই, তুমি লিখে যাও।'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কলাঝাড়।'

'রাইট কলাঝাড়। এবার লেখো, কয়লার ঘর।'

'রাইট, কয়লার ঘর, লেখো কলতলা।'

'ঠিক, কলতলা। তারপর?'

'তারপর? আর তো কিছু নেই।'

'আচ্ছা এবার তাহলে খ-এ এসো। এই তিনটে জায়গার কাছাকাছি কোথায় আছে।'

আমি বললুম, 'কেন? কলতলার পাশেই রয়েছে খড়ের ঘর।'

দু'মামাই লাফিয়ে উঠলেন, ব্রিলিয়েন্ট, ব্রিলিয়েন্ট, এ ছেলে শার্লক হোমস হবে।

মেজমামা বললেন, 'আর কিছু দরকার নেই, বাকিটা জলবৎ তরলং, কলতলায় খড়ে ছাওয়া গোরুর ঘর, ক খ গ ঘ। পেয়ে গেছি বড়দা, আর ভাবনা নেই। নাও চা বলো। মিউজিক, মিউজিক লাগাও।'

বড়মামা চেয়ারের পেছনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওই জন্যেই বলে, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল।'

বড়মামা একই সঙ্গে রেকর্ডপ্লেয়ারে চাপালেন সেতার আর টেপরেকর্ডারে চাপালেন সানাই। মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী হল?'

'কেন? ফাসক্লাস যুগলবন্দী।'

'ও, যুগলবন্দী? যেমন তুমি আর আমি। তাহলে তুমি হলে ওই সানাই, আমি হলুম গিয়ে সুললিত সেতার।'

'তা কেন, তুই হলি সানাই। প্যাঁ করে পোঁ ধরে আছিস, একটু কর্কশ।'

'আমি কর্কশ, আর তুমি হলে মধুর, নিজের সম্বন্ধে তোমার কী উচ্চ ধারণা তাই না!'

'জানিস আমি ডাক্তার ! জীবনদান করি।'

'জানো আমি অধ্যাপক। আমি জ্ঞান দান করি বলেই তুমি ডাক্তার।'

'তোর জ্ঞানে মানুষ গোরুর ডাক্তার হয়।'

'তুমি কি নিজেকে তার চেয়ে বড় কিছু ভাবো?'

মাসিমা গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'তোমরা দু'জনেই বেরোও, বেরিয়ে যাও। যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে বোসো।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তো আমার ঘরে রয়েছি রে কুসী!'

পুরোহিতমশাই কাঠের চৌকির ওপর বসে কাঁসার গেলাসে চা পান করছেন। পরনে পট্টবস্ত্র, গলায় চাদর। মনে হল এইমাত্র পুজো সেরে উঠে এলেন। এক চুমুক চা খেয়ে, জিবে আর দাঁতে একটা চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'কী বললে ডাক্তার, কী প্রতিষ্ঠা করবে?'

'আজ্ঞে, মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী? লোকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে, দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করে, তুমি কী প্রতিষ্ঠা করবে বললে?'

পুরোহিতমশাইয়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাই মনে হয় এক কথা একশোবার বললে তবেই বুঝতে পারেন। বড়মামা আবার বললেন, 'আজ্ঞে মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'ও বস্তু তুমি পেলে কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমি পেয়েছি। অলৌকিক উপায়ে পেয়েছি। সবই আমার মায়ের দয়ায়।'

'যাক্, সে আমার জানার দরকার নেই। কোথায় প্রতিষ্ঠা করবে?'

'আমাদের ঠাকুরঘরে।'

'বেশ, দেখি, ওই পাঁজিটা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দাও।'

আমি পাঁজিটা এগিয়ে দিলুম। পাতার পর পাতা উলটে এক জায়গায় এসে তাঁর চোখ স্থির হল। সামনে ঝুঁকে পড়ে বিড়বিড় করে কী পড়লেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, কাল সকালেই একটা দিন আছে। নটা পনেরো গতে সকাল বারোটা এক।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই হোক, খুব ভাল সময়।'

'তাহলে আমি একটা ফর্দ করে দি।'

প্রায় এক ফুট লম্বা একটা ফর্দ হাতে আমরা দু'জন সেই পবিত্র ধাম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলুম। রহমতুল্লার রিকশা অপেক্ষা করছিল। দু'জনে উঠে বসলুম। বড়মামা ফর্দ পড়তে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলেন, 'একটি স্বর্ণ-সিংহাসন, স্বর্ণ-সিংহাসন মানে সোনার সিংহাসন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো প্রচণ্ড দাম হবে রে!'

'তাতে কী হয়েছে বড়মামা, গুপ্তধন ধরুন পাওয়াই হয়ে গেছে, মায়ের দুল প্রতিষ্ঠার পরই তো আমরা গোয়ালের মেঝে খুঁড়তে শুরু করব, তারপর ট্যাং করে একটা আওয়াজ। শাবল গিয়ে লাগবে ঘড়ার কানায়। গুপ্তধন মানে কী বড়মামা?'

সাঁই সাঁই করে রিকশা ছুটছে। বাতাসে বড়মামার চুল উড়ছে। আমার দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'যাব্বাবা সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে শেষে এই প্রশ্ন?'

'না, তা নয়, আমি বলছি, সে-যুগের টাকা বেরুলে তো কোনও কাজে লাগবে না, এ যুগে অচল। মোহর বেরুলে, মেজমামা বললেন, গভরনমেন্ট গুপ্তধন আইন অনুসারে নিয়ে নেবে।'

'মেজ? আবার তুই সেই অপোজিশন ক্যাম্পে চলে গেছিস? মেজ আমার এনিমি। স্বপ্নটপ্ন সব বাজে, তুই-ই তাহলে মেজকে বলেছিলিস?'

'সত্যি বলছি, আমি বলিনি। মা-লক্ষ্মী সেদিন দু'কপি স্বপ্ন তৈরি করে, এক কপি আপনার ঘুমে, আর এক কপি মেজমামার ঘুমে ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

রিকশা থেকে বাড়ির সামনে নেমে বড়মামা বললেন, 'আর কতক্ষণ বা সময় আছে, আটটার সময় চেম্বারে বসতে হবে, এদিকে এই আধহাত ফর্দ, কে সামলাবে?'

'আমি আর মাসিমা সোদপুর থেকে করে আনি।'

'ওই যে স্বর্ণ-সিংহাসন, বউবাজার ছাড়া পাচ্ছ কোথায়?'

'বড়মামা!'

ডাকটা মনে হয় বেশ জোরে হল। উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছি না।

বড়মামা বললেন, 'কী রে? অমন করছিস কেন?'

অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, ওই গুপ্তধনের ঘড়ায় একটা সোনার সিংহাসন আছেই আছে। সেই সিংহাসনে মায়ের কানের দুল বসবেন। ব্যস, আর ভাবনা নেই। আগে গুপ্তধন উদ্ধার, তারপর দুল প্রতিষ্ঠা।

সামনেই মাসিমা। বেশ রাগ-রাগভাবে বললেন, 'গিয়েছিলে কোথায়? থেকে থেকে যাও কোথায়? মানিকের বাবার এখন-তখন অবস্থা! বেচারা সেই থেকে বসে আছে মুখ শুকিয়ে।'

বড়মামা মাসিমার খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, 'নব্বইয়ের আগে বুড়ো মরবে না, একশোতেও যেতে পারে। হাঁপানির রুগী সহজে মরে না।'

'তাহলেও একটা রিলিফ তো দিতে পারা যায়। দাঁড়াও, আমার ফাইনাল ইয়ার, একবার পাশ করে বেরুতে দাও, তোমার সব রুগী কেড়ে নোব!'

বড়মামা কম্পাউন্ডারকে নির্দেশ দিয়ে, মানিকের বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। একটা ইনজেকশন, আবার মাসখানেক ঠিক থাকবেন বৃদ্ধ।

মাসিমা চা এনেছেন। বড়মামা চা খেয়ে চান করে সাদা প্যান্টের ওপর বুক খোলা টি-শার্ট পরে চেম্বার আলো করে চিকিৎসায় বসবেন। তখন বড়মামার অন্য রূপ। তখন কারুর একটার বেশি দুটো কথা বলার সাহস হবে না। তখন মেজমামা, মাসিমা সকলেই ভয় পাবেন।

বড়মামা মধুর স্বরে ডাকলেন, 'কুসী!'

মাসিমা বললেন, 'আবার কী হল? তোমার গলা শুনেই মনে হচ্ছে, কিছু গোলমেলে ব্যাপার।'

'বোস না, একটু বোস না, সব সময় অমন ধানিপটকার মেজাজে ঘুরিস কেন?'

'কী, বলো?'

মাসিমা বড়মামার চেয়ারের হাতলে বসলেন। বড় মধুর দৃশ্য। আমার মা-ও নেই, বোনও নেই। আমার আমি ছাড়া কেউ নেই।

বড়মামা বললেন, 'বুঝলি কুসী, কাল এ-পরিবারের একটা দিনের মতো দিন, ডে অব অল ডেজ।'

'কেন? কাল আবার কী হল? পক্ষিরাজ কিনছ নাকি?'

মুখে রহস্য মেখে বড়মামা বললেন, 'আমি একটা দুর্লভ জিনিস পেয়েছি। তার দাম? পৃথিবীকে গ্রহজগতের নিলামে চাপালেও হবে না। দুর্লভ, সুদুর্লভ, মহাদুর্লভ!'

'আঃ, বিশেষণ থামিয়ে দয়া করে বলো না, জিনিসটা কী?'

'মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডিসটেমপারড হয়ে গেছ। কালই চলো সাইকিয়াট্রিসট ডক্টর গাঙ্গুলির কাছে।'

'চেঁচাচ্ছিস কেন? ঘটনাটা শোন না। যে রাতে স্বপ্নে দেখলুম, ছাদে ঠাকুরঘরের পাশে মা-লক্ষ্মী ইশারায় আমাকে ডাকছেন, তার পরের দিন সকালে বুড়ো দেখে কি, কী একটা চকচক করছে সেই জায়গাটায়। পড়ে আছে এক পাশে। ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলি? মা হলে কী হবে, মহিলা তো, অনেকটা তোর মতই। দেবলোক থেকে নরলোকে আসার পথে, তাড়াহুড়োয় আংটাটা ঠিকমতো লাগানো হয়নি, খুস করে খুলে পড়ে গেছে।"

'কই, দেখি, জিনিসটা কোথায়?'

'আমি আর হাত দোব না, রাস্তার কাপড়, চায়ের হাত, ওই আলমারিটা খুললে কাচের একটা ট্রের মধ্যে আছে।'

মাসিমা উঠে গিয়ে আলমারি খুললেন। দুলটা দু'আঙুলে দোলাতে দোলাতে আমাদের কাছে এলেন, তারপর নিজের ডান কানে পরে নিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, তুমি ঠিক বলেছ বড়দা, আমি মা-লক্ষ্মীর মতোই কেয়ারলেস। বুড়ো, তোকে আইসক্রিম খাওয়াব। থ্যাঙ্ক ইউ বড়দা।' মাসিমা চলে গেলেন।

মেজমামা বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি হাত মিলিয়েছিলুম, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, নেতা কে হবে? সব কাজেরই একটা মেথড আছে। আমি খুঁড়তে শুরু করলুম উত্তরে, তুমি শুরু করলে দক্ষিণে, তা তো হয় না। এ একটা বিরাট কাজ। অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মতো! মহেঞ্জোদারো-হারাপ্পার ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই আমিই আমাকে নেতা নির্বাচিত করলুম। তুমি আমাকে কখনোই যা করতে না, কারণ তোমার মধ্যে সে উদারতা নেই। তোমার এখনও জমিদারি মেজাজ যায়নি, তোমার মধ্যে কোনও দিন আমি গণতান্ত্রিক নেতার সন্ধান পাইনি। তুমি যেন কাইজার উইলহেল্‌ম, তুমি যেন জার নিকোলাস ওয়ান, তুমি যেন লর্ড চেম্বারলেন—'

'আমি তো তোকেই নেতা করতে চেয়েছিলুম, তার আগেই তুই নরম-গরম, গরম-গরম কত কী বলে গেলি। এর থেকেই বোঝা যায় তুই আমাকে একেবারেই ভালবাসিস না।'

'ভালবাসি না? এই তোমার ধারণা? তা হলে শুনে রাখো, আমার প্রথম কবিতার বই তোমাকে উৎসর্গ করেছি। কী লিখেছি জানো উৎসর্গপত্রে, আমার পিতৃপ্রতিম বড়দাকে।'

'তাই নাকি, তা হলে ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই কথাটা ঠিক নয়।'

'সে এখন তুমি বুঝবে।'

'পাড়ার লোকে কী বলে জানিস, দুটি ভাই যেন রাম-লক্ষ্মণ।'

'মাসিমা বললেন, 'গিন্নিবান্নিরা কী বলে জানো, সীতা কোথায়?'

'তোদের ওই এক কথা!'

মেজমামা বললেন, 'শোনো বড়দা, ও সব কথা ছাড়ো, কাজের কথায় এসো। টিমটা আমি ঠিক করে ফেলেছি, আলোকসম্পাতে বুড়ো, মঞ্চসজ্জায় কুসী, রাত্রির প্রথম যামে শাবলে আমি, ঝুড়িতে তুমি, দ্বিতীয় যামে ঝুড়িতে আমি, শাবলে তুমি।'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'মঞ্চসজ্জাটা কী জিনিস?'

'এই যেমন ধর চা দিলি, মাঝে মাঝে কফি সাপ্লাই করলি, কোকোও করে দিতে পারিস। লাইট স্ন্যাকস্। হাতের কাছে জল, তোয়ালে, ফার্স্ট এড। মানে তোর ওপর খুব একটা চাপ পড়বে না, তবে ব্যবস্থাপনা বেশ ভাল হওয়া চাই।'

'তোমাদের এই পাগলামি ক'রাত চলবে?'

'বলতে পারছি না। তদ্দিন চলবে যদ্দিন না ঠ্যাং করে একটা আওয়াজ হচ্ছে।'

'স্বপ্ন নিয়ে এই বাড়াবাড়ি কি ঠিক হবে?'

'তুই জানিস, স্বপ্নে গ্লুকোজের ঠিক ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছিল? মলিকিউলের গঠন? স্বপ্নে কত কী পাওয়া গেছে জানিস? কবিতায় পড়িসনি? স্বপ্নে কুললক্ষ্মী এসে মাইকেলকে বলেছিলেন, বাছা, ইংরিজি নয়, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করো।'

মাসিমা বললেন, 'তোমাদের দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে সাধক-প্রেমিকের সেই গানটা গাই, 'হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপিতে মিলে।' শুধু খেপি শব্দটা পালটে খেপা বসাতে হবে।'

মাসিমা চলে গেলেন। সামনে পরীক্ষা। খুব পড়ার চাপ। এর ওপর গুপ্তধনের উৎপাত। মেজমামা বললেন, 'বড়দা, গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার আগে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হয়। তোমার কাছে গোয়ালঘরের নকশা আছে?'

'গোয়ালের আবার নকশা? কে তৈরি করে গোরু রেখেছিল সেই থেকে চলে আসছে।'

'তা হলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে গোয়ালের একটা ডিটেল্স্ তৈরি করা। তুমি গোয়ালে কোনও দিন ঢুকেছ?'

'কতবার।'

'আমি একবারও ঢুকিনি। বিশ্রী বোটকা গন্ধ—'

'তা কেন ঢুকবে? তুমি হলে ভাই সুখের পায়রা। দুধ খাবে, দধি খাবে, গন্ধটি সহ্য করবে না।'

'সে হল গিয়ে যার যেমন বরাত। আচ্ছা গোয়ালটার আগাপাশতলা কি তুমি দেখেছ ভাল করে? কোথায় কী আছে না-আছে?'

'সেই গোয়েন্দার চোখে কোনও দিন দেখা হয়নি। আরে ম্যান, গোরু আগে না গোয়াল আগে!'

'শোনো, কাল আর্লি মর্নিং-এ আমরা গোয়াল সার্ভে করতে যাব। ইতিমধ্যে সার্ভে কীভাবে করতে হয় আমি পড়ে রাখছি।'

'শুনেছি থিওডোলাইট না কী সব যেন লাগে।'

'ধুর অতসবের দরকার নেই। আসল কথা হল খুঁড়ে যাও। একটা কবিতার প্রথম দুটো লাইন লিখে ভীষণ আটকে গেছি, পরের দুটো লাইন পেয়ে গেলে এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতুম এখুনি।'

'বল না, লাইন দুটো বল না, আমার সবাই মিলে চেষ্টা করি।'

'ভাবটা খুব দার্শনিক ধরনের, বুঝলে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে
গাঁয়ের শ্মশানে চিতা।'

'বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে শেষের কবিতা। তুমি এটাকে এখন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ?'

'আর একটা লাইন টপকে দিয়ে, এমন একটা লাইনে শেষ করতে হবে, যার শেষ শব্দ চিতার সঙ্গে মিলে যাবে।'

'তার মানে চিতার সঙ্গে মেলাতে হবে? ছাইয়ে তা হলে চলবে না!'

'না, ছাই-ফাই চলবে না। সেইটাই তো সমস্যা রে দাদা।'

'চিতার সঙ্গে কী মেলে? মিতা। চিতাই মোদের মিতা।'

'কোন্ যুগে পড়ে আছ তুমি? এইট্টি টুতে তুমি অমন একটা লাইন ভাবতে পারলে?'

'দাঁড়া, দাঁড়া, এসে গেছে, একেবারে আলট্রা মডার্ন লাইন, শোন তাহলে পুরোটা কী দাঁড়াচ্ছে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে
গাঁয়ের শ্মশানে চিতা।
তোমার আমার ভুঁড়ি বেড়ে চলে
মাপিতে পারে না ফিতা ॥

'বল কেমন হল?'

'একসেলেন্ট, একসেলেন্ট!'

'অর্থটা কী মারাত্মক হল জানিস? মৃত্যুতেই মানুষের শেষ। হবেই হবে, তবু আমরা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে ভুঁড়ি বাগিয়ে চলেছি।'

'কামাল কর দিয়া ম্যান। মানুষের কান মলে ছেড়ে দিয়েছ।'

মেজমামা নিজের ঘরে চলে গেলেন।' বড়মামা বললেন, 'লোকটাকে এখনও ঠিক চিনতে পারলুম না।'

'কার কথা বলছেন বড়মামা?'

'তোমার ওই মেজমামা।'

'মেজমামাকে লোক বলছেন?'

'কেন, ও লোক নয়?'

'হ্যাঁ, লোক, তবে ভদ্রলোক বললে ভাল হয়।'

'আরে রাখ, নিজের ছোট ভাই আবার ভদ্রলোক? তোকে আরও কয়েকদিন গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে। প্রফেসারকে বিশ্বাস নেই। সব না বানচাল করে দেয়!'

'উনি তো ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিলেন।'

'জানালা তো খোলা আছে।'

'তা আছে।'

ছাদের দিকে জানলার পাতলা পর্দা ঝুলছে। ঘরে শেড লাগানো টেবল ল্যাম্প ঝুলছে। ঝুলছে কেন? এ বাড়ির সবই অদ্ভুত। টেবিল ল্যাম্প রাখার জায়গা নেই। অসাধারণ উপায়ে সেটাকে দেওয়ালের হুকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মেজমামা টেবিলে একবার করে তাল বাজাচ্ছেন আর খাতায় একটু একটু লিখছেন। বীরেরা তাল ঠুকে যুদ্ধ করে, ইনি তাল ঠুকে লিখছেন। বড় বড় লোকের বড় বড় ব্যাপার। আমার খুব মজা লাগছে। আড়াল থেকে মানুষকে নজরে রাখলে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন লেখার তাল আছে। পেনসিল শুধু ছোটরাই চিবোয় না। বড়রা বড় জিনিস চিবোয়, যার দাম আরও বেশি, পার্কার কলম। লিখতে গেলে মাঝে মাঝে মাথা চুলকোতে হয়। এদিকে ওদিকে তাকাতে হয় বোকার মতো। মাথায় ভাল কিছু এসে গেলে শরীর আর মাথা দোলাতে হয়।

মেজমামাকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, কবিতা লেখা ভীষণ কঠিন কাজ। এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ঘরে একটা স্টিল আলমারি রয়েছে। আলমারিটা খুললেন। লোহার পাল্লা ঝনঝন করে উঠল। মেজমামা নিচু হয়ে একেবারে তলার খোপ থেকে কী একটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হাতে একটা পুরানো খাতা। ফিতে দিয়ে বাঁধা।

টেবিল ল্যাম্পের তলায় খাতাটা ফেললেন। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে পাঁপড় ভাজার মতো হয়ে গেছে। মেজমামা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ওপাশে খুট্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলেন। খাতাটাকে লুকোবার চেষ্টা করলেন।

তার মানে? এ খাতা তেমন নিরীহ খাতা নয়। ওর পাতায় পাতায় অবশ্যই কোনও গুপ্ত তথ্য আছে? গুপ্তধনের পেছনে এই রকম সব গোপন দলিল থাকে। খবরটা আমার 'বস'-কে দিতে হচ্ছে। বড়মামাকে বস বলতে বেশ মজা লাগল!

বড়মামা সব শুনে বললেন, 'অ্যাঁ, বলিস কী, খুব পুরানো খাতা! অনেকটা ডায়েরির মতো! তাহলে কি, তাহলে কি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হলে সেই।'

'তার মানে, কী সেই?'

'সেই বইয়ে যেমন পড়ি, ওর মধ্যে কোনও রহস্য আছে, কবিতা নেই।'

'ঠিক বলেছিস। কবিতা হল একটা মুখোশ। ও মনে হয় কোনওভাবে মামাদের পূর্বপুরুষ প্রসন্নকুমারের ডায়েরিটা খুঁজে পেয়েছে। তখন সারা বাংলায় র্গির হাঙ্গামা চলছে। যার যা ধনসম্পদ সব পুঁতে রাখছে মাটিরতলায় গোপন গায়গায়। ডায়েরিতে লিখে রাখছে সন্ধানের নির্দেশ নিজের জন্যে, উত্তরপুরুষের ান্যে। শুনেছি প্রসন্নকুমারের অনেক কিছু ছিল।'

'তিনি কে ছিলেন বড়মামা?'

'দাঁড়া, গুনে বলি, প্রপ্রপ্রপিতামহ। দেখ তো ঠিক হল কি না? পিতার াতা—পিতামহ, তস্য পিতা—প্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপিতামহ, তস্য াতা—প্রপ্রপ্রপিতামহ, ক'পুরুষ হল বল তো?'

বাবা! এ যে দেখি আর এক গুপ্তধন!

রাতে মেজমামা ঘোষণা করলেন, 'আজ আর আমি খাব না। নো মিল। পটের টিউনিং ঠিক নেই। একদিন অফ করে দি।'

মাসমার ডাকে ঘরের ভেতর থেকেই বললেন। দরজা খুললেন না। মাসমার াশে দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'কী হচ্ছে বলো, একটু ওষুধ দিয়ে দি।'

'না না, ওষুধ কী হবে? কথায় কথায় ওষুধ! মাসে মাসে, উপবাসে।'

'আরে দূর, কারটা কার ঘাড়ে চাপাচ্ছ? ওতে জ্বর সারে, পেটের জন্যে ওয়াই লাগে। হজমি, অথবা অ্যান্টাসিড।'

মেজমামা বললেন, 'মুড়ি আর ভুঁড়ি।'

বড়মামা বললেন, 'আঃ, আবার ভুল বললে! ওটা হল শরীরের যোগাযোগের থা। পেটের সঙ্গে মাথা, মাথার সঙ্গে পেটের যোগ।

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, ডোন্ট ডিস্টার্ব।'

আমরা খাবার টেবিলে বসতেই বড়মামা বললেন, 'একেই বলে, বিষয় বিষ, ালি কুসী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটার স্বভাব কী রকম পালটে গেল! াখে পড়ার মতো।'

মাসিমা বললেন, 'খাচ্ছ খাও, তোমাকে আর কারুর সমালোচনা করতে হবে । বিষয়ের কী দেখলে তুমি?'

'অ্যাঁ, বলিস কি! প্রসন্নকুমার কত লক্ষ কত কোটি টাকা মাটির তলায় পুঁতে খে গেছেন, তোর ধারণা আছে?'

'হঠাৎ সেই পূর্বপুরুষকে ধরে টানাটানি কেন? তিনি ছিলেন সাধক মানুষ। াধি পেয়েছিলেন। সমাধির ওপর সেই বুড়ো বকুলে আজও ফুল ফোটে।

পাঁজিতে জন্মদিন, মৃত্যুদিন লেখা হয়। কত বড় বৈষ্ণব ছিলেন তিনি!'

'তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না, বর্গির হাঙ্গামার সময় সব পুঁতে ফেলেছিলেন মাটিতে।'

'আজ্ঞে না, সব দান করে দিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে না পুঁতে রেখেছিলেন।'

'তর্ক না করে, তাঁর জীবনীটা পড়ে দেখ।'

'কোথায় পাব?'

'মেজদার কাছে পাবে। মেজদা রিসার্চ করছে, বৈষ্ণব আন্দোলন ও প্রসন্নকুমার।'

খাওয়া শেষ হল। বড়মামা মেজমামার ঘরে গিয়ে টুকটুক করে টোকা মারলেন। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গলা ভেসে এল, 'এখন আমাকে বিরক্ত না করলেই সুখী হব।'

বড়মামা বললেন, 'কার গলা বল তো! ডক্টর জেকিলের, না মিস্টার হাইডের?'

'কারুর গলাই যে আমি শুনিনি বড়মামা!'

'তোর কল্পনাশক্তি বড় কম। না দেখলে না শুনলে তোর মাথায় কিছু আসে না। পরী কেউ কোনও দিন দেখেছে! ছবি এঁকেছে। নিয়তির গলা কেউ শুনেছে! যাত্রায়, থিয়েটারে সেই না-শোনা গলাই অনুকরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কম্বুকণ্ঠে কথা বলতেন, মানুষ শুনে জানেনি, জেনে শুনেছে।'

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এলুম। গুপ্তধন নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ভাল লাগছে না। বড়মামা মোটা একটা ডাক্তারি বই নিয়ে বসেছেন। বড়মামার এই এক গুণ দেখেছি, কোন কিছুতে একবার ডুবে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। আমারও একটা গুণ আছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। কোথায় কোন্ জগতে যে চলে যাই।

মনে হয় গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামা ঠেলছেন। ঠেলতে ঠেলতে প্রায় খাটের ধারে এনে ফেলেছেন। শরীরের একটা অংশ ঝুলে পড়েছে। চাঁদের আলোয় চারপাশ ফুটিফাটা।

'ওঠ ওঠ, উঠে পড়।'

'অ্যাঁ, কী হল বড়মামা, আবার স্বপ্ন?'

'ধ্যাত, এবার দুঃস্বপ্ন। শিগ্গির নীচের বাগানে চল। আমার মনে হচ্ছে মেজো গোয়ালে গিয়ে ঢুকেছে। গোরুটা যেন ভেও করে ঢেকুঁর তুলল।'

এই অসময়ে আমার আর নীচে নামতে ইচ্ছে করছে না। বড়মামাকে থামাবার জন্যে বললুম, 'দুপুরে চরতে বেরিয়েছিল। মনে হয় খুব গুরুপাক খাওয়া হয়ে গেছে, তাই বদহজম হয়েছে।'

'হ্যাঁ রে ব্যাটা গোবদ্যি, তুই সব জেনে বসে আছিস! গোরু কি মানুষ, যে দহজম হবে। ফাঁকিবাজ। চল, নীচে চল। আমার একা যেতে ভীষণ ভয় করছে।'

উঠতেই হল। দু'জনেরই ভীষণ ভয়। বড়মামা যদি আমাকে একা ফেলে রখে চলে যান, থাকতে পারব না। বাগানে নেমে অবাক হয়ে গেলুম। আমরা খন ঘুমোচ্ছিলুম, সেই ফাঁকে কত ফুল ফুটেছে। চারপাশ সাদা হয়ে আছে। গায়ালঘর জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। কেউ কোথাও নই। গোরুর নিঃশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে।

বড়মামা বললেন, 'এই নে টর্চ। গোয়ালের ভেতরটা একবার দেখে আয় তা, কেউ আছে কি না!'

'ওরেব্বাবা, আমি পারব না, কামড়ে দেবে।'

'কে কামড়াবে?'

'গোরু।'

'গোরু কামড়ে দেবে?' বড়মামা হো হো করে হেসে উঠলেন, 'কোন বইয়ে ড়েছিস, গোরু কামড়ায়!'

'আপনি যাচ্ছেন না কেন বড়মামা!'

'সত্যি কথা বলব? ছোটদের মিথ্যে বলতে নেই। আমারও একটু ভয়-ভয় গছে রে! বলা যায় না, যদি কিছু থাকে!'

'কী আর থাকবে?'

'তোমার মেজমামা থাকতে পারে।'

'পারে কেন, আছে। তবে গোয়ালে নেই। আছে এই কাঁঠালতলায়।'

বাজ পড়লে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, আমরা দু'জনে ঠিক সেই রকম কে উঠলুম। মেজমামার গলা। বড়মামা বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক।'

'কে তুমি না আমি?'

'তুমি।'

'যদি বলি তুমি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই নীচে নেমে সছ, আমার গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যে।'

'সে তো কিছু ভুল করিনি।'

'ভুল অবশ্যই করেছ। তুমি পরীক্ষায় ফেল করেছ। গোল্লা পেয়েছ। আমার তা ফাঁদে পা দিয়েছ।'

'ফাঁদ মানে?'

'ফাঁদ মানে ট্র্যাপ। তুমি আমাকে কতটা বিশ্বাস কর দেখার জন্যে নীচে ম এসে একটু শব্দ-টব্দ করেছিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই। সুড়সুড় করে ম এলে। বড়দা, একেই বলে বিষয় বিষ।'

'এত বড় একটা কথা বললি, বিষয় বিষ! যাঃ, তোকেই দিয়ে দিলুম। তোকে স্বপ্ন দিলুম, গুপ্তধন দিয়ে দিলুম, সব দিয়ে দিলুম, এমনকি আমার কৌতূহলটা পর্যন্ত দিয়ে দিলুম। সব তোর।'

বড়মামা হাত চেপে ধরে বললেন, 'চল, ওপরে চল। আমরা এখন মুক্ত পুরুষ।'

মেজমামা বললেন, 'স্টপ। এদিকে এসো। দুজনেই এগিয়ে এসো।'

এতক্ষণ মেজমামার গলাই শুনছিলুম। চোখে দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে আলোর খেলা চলেছে। গাছের পাতা রূপকথার রুপোর পাতার মতো ঝিলমিল করছে! সবচেয়ে সুন্দর হয়ে সেজে উঠেছে তাল, সুপুরি, খেজুর আর নারকেল গাছ।

বড়মামা বললেন, 'অন্ধকারে, তুমি আছ কোথায়?'

কাঁঠালগাছের তলায়, একটা ছায়া দুলে উঠল, স্বর ভেসে এল, 'খুব কাছেই। এটাও তোমার একটা শিক্ষা হল।'

'কী শিক্ষা?'

'হৃদয়ে অন্ধকার জমে থাকলে মানুষ চেনা যায় না দাদা। মানুষ চিনতে হলে আলো জ্বালাতে হয়। হৃদয়ের আলো। কাঁঠালতলায় এসো, খবর আছে।'

আমরা দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। চাঁদের আলোয় পাতার ছায়া পড়ে. সে যেন আর এক স্বপ্ন! দূরে ফাঁকা মাঠে ঝলমল করছে আলো। তাকালেই মনে হচ্ছে, এক্ষুণি পক্ষীরাজ নেমে আসবে। পিঠে রাজপুত্র। কাঁঠালতলায় একটা বড় পাথর পড়েছিল, তার ওপর মেজমামা বসে আছেন, দু' হাঁটুতে হাত রেখে আরাম করে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'টর্চ জ্বেলে অন্ধকারকে বিমুক্ত কোরো না। দু'জনে বোসো। ওই যে আরও দুটো পাথর রয়েছে।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে চাইছ? আমরা দু'জনেই কিন্তু নিরস্ত্র!'

'আমিও তাই।'

'তোমার গলাটা কেমন যেন ভিলেনের মতো শোনাচ্ছে. অনেকটা করালীচরণের মতো।'

'তুমি করালীচরণের গলা শুনেছ?'

'ঠিক শুনিনি; কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে কানের কাছে ভাসছে।'

'হৃদয়ের শব্দ শুনতে পাওনি, তাই কানের কাছে করালী।'

'বলো কী, রোজ আমি স্টেথো ফেলে ডজন-ডজন হৃদয়ের শব্দ শুনি।'

'সে-সব অসুস্থ হৃদয়। নিজের হৃদয়ের আসল শব্দ শোনার চেষ্টা করো। বড় অন্ধকার, বড় বেসুরো! বোসো, বোসো।'

আমরা বসলুম, দু'জনে, দুটো পাথরে। সত্যিই মেজমামাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। রহস্যময়। মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা দাদা, ক-এ কী হয়?

'ক-এ কলতলা।'

'ক-এ কাঁঠালতলা হলে আপত্তি আছে?'

'না। তবে তুমি বলেছিলে কলতলা।'

'আচ্ছা দাদা' খ-এ যদি খড়ের বদলে খরগোশের গর্ত হয়, তোমার আপত্তি হবে?'

'না, হতে পারে।'

'তা হলে ক খ গ ঘ যদি এই রকম হয়, কাঁঠালতলায় খরগোশের গর্তে ঘড়গ, তা হলে কেমন হয়।'

'কিন্তু গোয়ালটা তা হলে কী হবে?'

'গোয়ালটা গোরুকে ছেড়ে দাও। অবোধ জীবটিকে শান্তিতে, মশার কামড়ে থাকতে দাও।'

'বেশ, তাই হোক।'

'দেখি টর্চটা দাও।'

মেজমামা বড়মামার হাত থেকে টর্চ নিলেন, 'নাও, এইবার দ্যাখো।'

মেজমামা টর্চের বোতাম টিপলেন। আলোর রেখায় কিছু দূরে একটা গর্ত দেখা গেল।

'দাদা! কী দেখছ, এই সেই গর্ত!'

'কিন্তু খরগোশ আসে কোথা থেকে?'

'খরগোশ আসার তো দরকার নেই। এই রহস্যে গর্তটাই বড় কথা, খরগোশটা নয়।'

'তা হলে?'

'আর প্রশ্ন নয়, গর্ত ইজ এ ক্লিয়ার প্রুফ অব আওয়ার গুপ্তধন। লেট আস স্টার্ট!'

'রাতের বেলায় গর্তে খোঁড়াখুড়ি না করাই ভাল। বলা যায় না, সাপখোপের ব্যাপার থাকতে পারে।'

'দেখ দাদা, ভয় পেলে মানুষের কিছু হয় না। সাহস চাই, সাহস। তুমি টর্চটা ধরো, আমি শাবল চালাই। আমার সে সাহস আছে।'

'কাল সকালে করলে হত না ভাই!'

'সকালে? গুপ্তধন কেউ কোনও দিন সকালে, সবার সামনে খোঁজে? গুপ্তধন গোপনে, রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধানের জিনিস। বিপদের ঝুঁকি থাকবে, বাধা থাকবে, ভয় থাকবে, মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে। এ তো ভাই, ময়রার দোকানের মোয়া নয়। অতএব আজই এখনই। জয় মা!'

মেজমামা নীচু হয়ে পায়ের কাছ থেকে যে জিনিসটি তুলে নিলেন, সেটি একটি বড় সাইজের শাবল। চাঁদের আলোয় শাবল হাতে মেজমামা। কেমন

যেন দেখাচ্ছে। গুপ্তধন সত্যিই কি আছে? দিনের বেলায় বিশ্বাস হয় না। রাতের বেলায় ভাবলে গা ছমছম করে।

মেজমামা বললেন, 'বলো, ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।'

আমরা বললুম, 'ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।'

একটা প্যাঁচা ডাকল। প্যাঁচার ডাক নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ। মা-লক্ষ্মীর বাহন বার-তিনেক চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকল। সেই ডাকের সঙ্গে ডাক মিলিয়ে মেজমামা ডাকলেন—জয় মা। তারপর গর্তে মারলেন শাবলের খোঁচা। খোঁচা মারার সঙ্গে সঙ্গে ঝম করে একটা শব্দ হল।

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পিছিয়ে এলেন। বড়মামাকে বললেন, 'শুনলে কিছু শুনতে পেলে?'

বড়মামা বললেন, 'কে যেন টাকার তোড়া নাচাল!'

'রাইট। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দাঁড়াও, আর একবার শাবল চালাই।'

মেজমামা নাচের ভঙ্গিতে আর একবার শাবল চালালেন, এবার ঝমঝমাঝম করে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। শুধু শব্দ নয়, গর্তের মুখে কী একটা বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

বড়মামা বললেন, 'বুঝলি, মনে হচ্ছে মোহরের থলে।'

মেজমামা বললেন, 'রাইট ইউ আর, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দাঁড়াও বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে। টেনে বের করে আনি।'

মেজমামা হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'ফোকাস, ফোকাস।'

আমার হাতের টর্চ ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল। মেজমামা গর্তে শাবল চালিয়ে কিছু একটা সামনের দিকে টেনে আনতে চাইলেন। তালগোল পাকিয়ে কী একটা বেরিয়ে এল। মেজমামা 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা, 'আমার স্বপ্ন' বলে জিনিসটাকে ধরতে গেলেন।

ঝম্ করে একটা শব্দ হল। গুপ্তধনের চারপাশে কাঁটা উঠল খোঁচা-খোঁচা হয়ে। বড়মামা ভয়ে পিছিয়ে এলেন।

'কী বল তো জিনিসটা!'

মেজমামাও সরে এসেছেন। বড়মামার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আলোর তেজ ক্রমশই কমে আসছে। মেজমামা বললেন, 'পরক্যুপাইন।'

বড়মামা বললেন, 'তার মানে শজারু।'

'ইয়েস।'

'কাঁটা-খোঁচা শজারু, নড়েও না, চড়েও না, গর্তের মুখ আগলে বসে আছে। বড়মামা বললেন, 'এটা মনে হয় ছদ্মবেশী যক্ষ।'

মেজমামা বললেন, 'গুপ্তধনের মুখে অনেক বাধা থাকে, আমাদের সুবিধের

জন্যে, সব বাধা, বাধার তাল হয়ে কাঁটা উঁচিয়ে সামনে বসে আছে। মায়ের কী দয়া বল তো। বলো, 'জয় মা! হেঁকে বলো।'

মেজমামা শাবল তুলে আবার যেই গর্তের দিকে এগোতে গেছেন, শজারু উলবোনা কাঁটার বলের মতো লাফিয়ে উঠল। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'জয় মা সাবধান!'

গোলমাল বেশ ভালই হয়েছে মনে হয়, তা না হলে মাসিমা ঘুম ভেঙে উঠে আসবেন কেন? মাসিমা এসে বললেন, 'তোমাদের ঘুম নেই? রাতেও পাগলামি? তোমাদের জন্য এবার দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এ কী, এটা আবার কী?'

বড়মামা ভালমানুষের মত বললেন, 'আমাদের গুপ্তধন।'

মাসিমা ঝুঁকে পড়লেন সামনে, 'ও মা, এ তো সেই শজারুটা। ক'দিন হল আমাদের বাগানে এসে বাসা বেঁধেছে। ওটাকে টেনেটুনে গর্ত থেকে বের করেছ কেন? ওর বাচ্চা হয়েছে। তোমাদের কি খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই। যাও, বাড়ি যাও।'

মেজমামা বললেন, 'দাদা!'

বড়মামা বললেন, 'ভাই।'

মাসিমা বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা, ভাই, ভাগনে, তিনজনেই আর একটুও কথা না বাড়িয়ে সোজা যে-যার ঘরে। ভোর হয়ে আসছে। উঃ, দেখেছ, কি কাণ্ড, একেবারে শাবল-টাবল এনে, মনের আনন্দে। জানে তো, কুসী এখন ঘুমোচ্ছে!'

বড়মামা বললেন, 'মেজো' গোয়ালটা একবার উসকে দেখলে হয় না? থাকলেও থাকতে পারে। মনে আছে, কতকাল আগে আমরা পড়েছিলুম,

'যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ ভাই
মিলিলেও মিলিতে পারে
পরশ পাথর ॥'

'দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট।'

কাঁঠালগাছের তলা থেকে মাসিমার গলা পাওয়া গেল, 'মেজদা তোমার এই সুটকেসে কী আছে? এখানে ফেলে গেলে কেন?'

'আমার সুটকেস? আমার আবার সুটকেস আসবে কোথা থেকে? কই দেখি?'

আবার আমরা কাঁঠালতলায়। শজারু গর্তে ফিরে গেছে। মেজমামা যে পাথরে বসেছিলেন, চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ায়, সেখানে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। পাথরের পাশে ঝকঝক করছে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস। এইমাত্র কেউ যেন রেখে উঠে গেছে।

মেজমামা বললেন, 'একটু আগেও এটা এখানে ছিল না।'

বড়মামা বললেন, 'আর ইউ শিওর?'

'ডেড শিওর।'

'তা হলে এটাকে খোলা যাক। আমার মনে হয় এর মধ্যে আমাদের জন্যে স্পেশাল কোনও খবর আছে। গুপ্তধন মানুষকে এইভাবেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে যায়।'

মাসিমা সুটকেসটা তুললেন। দু'মামা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, খুব ভারী। খুব ভারী?'

মাসিমা কাঠকাঠ গলায় বললেন, 'ভেতরে চলো। মনে হচ্ছে কিছু আছে।'

রহস্য-উপন্যাসের মতো দৃশ্য। বিশাল উঠোনে এ বাড়ির কোনও পূর্বপুরুষ একটা বেদি তৈরি করে রেখেছিলেন। পাথর বাঁধানো। সেই বেদিতে আমরা বসে আছি। মাথার অনেক ওপরে চৌকো আকাশ। ভোর হয়ে আসছে। বেশ একটা হিম-হিম ভাব।

মেজমামা বললেন, 'কখন সুটকেসটা খুলবি রে কুসী?'

'ধৈর্য ধরো।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধৈর্য মানুষের একটা বড় গুণ, ধৈর্য ছাড়া কিছু হয় না।'

মাথার ওপর শেষ তারাটি মিলিয়ে গেল। একটা-দুটো পাখি ডাকছে। মেজমামা বললেন, 'আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরাবি কুসী?'

মাসিমা বললেন, 'আলো ফুটুক।'

বড়মামা বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আলো আলো। আলো ছাড়া কিছু হয় না।'

পাখিদের শোরগোল পড়ে গেছে। মেজমামা বললেন, 'তোর ব্যাপারটা কী বল তো কুসী? এভাবে ঝুলিয়ে রাখছিস কেন বোন?'

'তোমাদের একটু শিক্ষা হোক।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সব বয়সই শিক্ষার বয়স। শেখার কোনও বয়েস নেই।'

সদরে একটা শব্দ হল। এইবার একে একে সব আসতে আরম্ভ করবে। কাজের লোক। বাড়িতে শোরগোল পড়ে যাবে। সবশেষে আসবেন সাইকেল চেপে কম্পাউন্ডারবাবু। এসেই চা চা করবেন।

প্রথমেই যে এল, সে হল মোক্ষদার নাতি। ছোট্ট এতটুকু ছেলে, ফুলো-ফুলো গাল। চোখে ঘুম লেগে আছে। পরনে হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি। গত বছর ছেলেটির বাবা মারা গেছেন। মাসিমাই মানুষ করেছেন বলা চলে। ওষুধ, পথ্য, জামাকাপড়, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শেখানো। সারাদিন ও বাড়িতেই থাকে। বড় শান্ত ছেলে।

মাসিমা ডাকলেন, 'শঙ্কর, এদিকে এসো।'

মেজমামা বললেন, 'তোর মতলবটা কী বল তো কুসী?'

মাসিমা কথা কানে তুললেন না। শঙ্কর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাসীমা বললেন, 'কান ধরো। দু'কান।'

ভাল মানুষ শঙ্কর আদেশ পালন করল। মাসিমা বললেন, 'তুমি এটা কাল বাগানে ফেলে গিয়েছিলে?'

শঙ্কর ঘাড় নাড়ল। দুই মামা বললেন, 'যাব্বাবা, শুধু শুধু তুই বসিয়ে রাখলি!'

দু'জনে উঠতে যাচ্ছিলেন। মাসিমা বললেন, 'বোসো, শুধু শুধু নয়।' এইবার আমি বাক্স খুলব। সত্যিই এতে গুপ্তধন আছে। এই দ্যাখো।

ছোট একটা শ্লেট, পেনসিল, আর প্রথমভাগ। মাসিমা প্রথম ভাগের পাতা খুলে ভোরের আলোয় মেলে ধরলেন। 'নাও পড়ো। দুজনেই পড়ো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।'

দুই মামা সমস্বরে পড়লেন, 'ক খ গ ঘ।'

'কেমন লাগছে পড়তে?'

দু'জনেই বললেন, 'ফাসক্লাস! আর একবার পড়ি। কী সুন্দর! ক খ গ ঘ। উঃ, মনে হচ্ছে শৈশব আবার ফিরে এসেছে। 'দাদা?'

'ভাই।'

'বুঝলে কিছু? কুসী কী বোঝাতে চাইলে, বুঝলে?'

'না রে ভাই।'

'মোটা মাথা।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ। কিঞ্চিৎ গবেট। গুপ্তধন হল কখগঘ। বর্ণ পরিচয়। আর লুপ্তধন, আমাদের শৈশব।'

'আরে হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো।'

'তা হলে বুঝলে, মা-লক্ষ্মী আসেননি। এসেছিলেন মা-সরস্বতী।'

'বীণা! হাতে তো বীণা ছিল না ভাই।'

'তুমি গবেট। মা কি তোমাকে বাজনা শেখাতে এসেছিলেন? মা এসেছিলেন মানুষের জীবনের গুপ্তধনের সন্ধান দিতে।'

'আর ইউ শিওর?'

'ডেড সিওর। মায়ের হাতের বীণা, আর মায়ের পায়ের প্যাঁচা সরিয়ে নিলে, তুমি বলতে পারবে, কে লক্ষ্মী কে সরস্বতী?'

'না।'

'সব এক, সব একাকার।'

'তা হলে তুমি বলছ, জ্ঞানের সন্ধানই গুপ্তধনের সন্ধান।'

'ইয়েস।'

'মা সেই কথাই বলে গেলেন?'

'ইয়েস।'

'তা হলে কুসী, চা বানাও, আজ কী আনন্দ, কী আনন্দ!'

ভোরের আলোয় শঙ্কর দুলে দুলে আধো-আধো গলায় পড়ছে, ক খ গ ঘ।

সুখে থাকতে ভূতে কিলানো

বড়মামা খেতে খেতে বললেন, 'আমি একটা গাধা।'

মেজমামার বাঁ হাতে একটা বই, ডান হাতে ঝোলে ডোবানো রুটির টুকরো। এইটাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। অগাধ জ্ঞান সমুদ্র, আয়ু অল্প, বিঘ্ন বহু। সবসময় পড়ে যাও। সকালের কাগজ বাথরুমে বসে বসেই পড়েন। এখন যে বইটা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ছেন, সেটা কাক সম্বন্ধে। কাকের স্বভাব, কাকের নিয়মনিষ্ঠা। পড়তে পড়তেই বললেন--

'কী করে বুঝলে! তোমার কান দুটো অবশ্য একটু বড়ই, ঝোলা, ঝোলা, সাধারণ মানুষের কান অত বড় হয় না। প্রকৃতির ব্যাপার। বোঝা শক্ত। কী যে কিং ভাবে জন্মায়! চীনে মেয়েদের শিং বেরোচ্ছে। কলকাতায় ছেলেদের ন্যাজ বেরোচ্ছে।

রুটির টুকরোটা মুখে ঢোকালেন। কোলের ওপর এক ফোঁটা ঝোল পড়ল। আগেও দু-এক ফোঁটা পড়েছে। দৃকপাত নেই! জ্ঞানতপস্বী!

বড়মামা বললেন, 'আমি গাধা, তার প্রমাণ আমার গরু। আমার মত গাধা না হলে কেউ ওরকম তিনটে গরু পোষে না। তোরাই বল, ওই গরু তিনটে আজ পর্যন্ত ক'ছটাক দুধ দিয়েছে?'

মাসিমা যেন বেশ খুশিই হলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা! গরু দিয়েই প্রমাণ করা যায় তুমি একটা গাধা।'

মেজমামা সবসময় বাঁকা পথ ধরেন। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। বড়মামা বললেন, প্রোটেস্টান্ট। মেজমামার উচিত ছিল চুপ করে শুনে যাওয়া। তা আর হল কই। হঠাৎ বলে বসলেন, 'কেন? ওয়াস আপন এ টাইম তোমার কালো গরুটা হঠাৎ দিন তিনেক দুধ দিয়ে ফেলেছিল। তুমি সেই দুধ দেখে কলকাতার রবারের জুতো পায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে। একদিন গরুর অনারে সত্যনারায়ণ পুজো হয়েছিল। তুমি বলেছিলে সিন্নি খেয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, দুধে এতই নাকি ফ্যাট। একদিন মেজারিং গ্লাসে করে প্রত্যেককে এক আউন্স করে দুধ খাইয়েছিলে। সেই খাঁটি দুধ খেয়ে আমাদের সব পেট খারাপ হয়ে গেল। গরুর ভাষা নেই। প্রতিবাদ করতে জানে না বলে যা খুশি তাই বলে যাবে?'

'হ্যাঁ, দিয়েছিল ঠিকই। তারপর? তারপর আর দিয়েছে কি?'

'কেন দেয়নি?'

'তোর মত একগুঁয়ে স্বভাব বলে দেয়নি। দিতে পারি তবু দোব না। কী করতে পার কর।' মেজমামা এবার সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন।

'আমি আর তোমার ভুঁসো কালো গরু এক শ্রেণীতে পড়ল!' অসম্ভব! আর সহ্য করা যায় না। মেজমামা বিদ্যাসাগরী চটির ফটাস ফটাস শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। খুব রেগে গেছেন। যাক্ বাবা, পুডিংটা শেষ করে গেছেন।

মাসিমা বললেন, 'তোমার বড়দা ভীষণ পেছনে লাগা স্বভাব।'

বড়মামা বললেন, 'গাধার ভাই গরুই হয়। আমাদের ভায়ে ভায়ে হচ্ছে তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিসনি।'

'ঠিক আছে।'

মাসিমাও রাগ করে উঠে গেলেন। বড়মামা আমাকে বললেন, 'এদের আজ কী হয়েছে বলত! কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে! সব ব্লাডপ্রেসারের রুগী! গরু তিনটেরও প্রেসার। আমার যেমন বরাত!'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার চোখ ঘুমে জুড়ে আসে। ধপাস করে শুয়ে পড়তে পারলে আর কিছুই চাই না। আজও সেই তালেই ছিলুম। পরিষ্কার বিছানা। নরম মাথার বালিশ, কোল বালিশ। মৃদু পাখার বাতাস। জানালার বাইরে সাদা ফুলে ফুটফুটে কামিনী গাছ। থমথম করছে মিষ্টি গন্ধ। কোণের দিকে বড়মামার আরাম কেদারার কাছে তে-ঠ্যাং বড় টেবিল-ল্যাম্পের মাথার ওপর হালকা সবুজ রঙের শেড স্বপ্নের মত আলো ছড়িয়ে রেখেছে। ঘুম আয়, ঘুম আয় বলতে হয় না, ঘুম যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় পা দুটো তুলে সবে শুতে যাচ্ছি, বড়মামা, 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন, 'এর মধ্যে শুবি কী রে! একটা ফিউচার প্ল্যান তৈরি করতে হবে না?'

'কিসের প্ল্যান?'

'গরু ছেড়ে দিলুম। আর একটা কিছু করতে হবে তো।'

'কেন? কুকুর রয়েছে গোটা ছয়েক, পাখি রয়েছে খাঁচায় খাঁচায়, দুটো বেড়াল।'

'ধ্যার! ওদের কী ধরবে! বড় একটা কিছু ধরতে হবে। মহান মহৎ, অসীম, অনন্ত।'

'সে আবার কী।'

'আমি একটা লঙ্গরখানা খুলব।'

'লঙ্গরখানা?'

'কিছুই জানিস না? রোজ হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি তৈরি করে দুপুরবেলা দরিদ্র মানুষদের খাওয়াব। রাজা রাজেন মল্লিকের মত। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ফ্রি চিকিৎসা চালাব। একটু একটু করে আমার এই সমাজসেবা এমন চেহারা নেবে—হেঁ হেঁ!'

'হেঁ হেঁ মানে?'

'হেঁ হেঁ মানে মাদার টেরেসা! তোর মেজোকে বলে আয় মনের জোর, ইচ্ছাশক্তি, তেজ আর ত্যাগ থাকলে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। শুধু পুডিং খেলেই হয় না, পুডিং খাওয়াতে হয়। আমি আমি করলে নিজের ভুঁড়িটাই বাড়ে। তুমি তুমি করলে আমি পেল্লায় বড় হয়ে বিশ্ব আমি হয়। বিশ্বামি ভবেৎ!

'বিশ্বামি?'

'হ্যাঁ স্বরসন্ধি। আ-কারের পর অ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘাকার হয়। এখুনি জিগ্যেস করবি—দীর্ঘাকার কী?

দীর্ঘ প্লাস আকার। এও স্বরসন্ধি!'

'মেজমামাকে এখুনি বলে আসব?'

'শিওর! নাকের ডগায় রাসেল নিয়ে বসে আছে বার্ট্রান্ড বানান জানে না।' যাক বাবা! বড়মামার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। মেজমামার ঘরে গিয়ে ঘুম লাগাই।

সকালবেলা, বড়মামাকে ঘরে পেলুম না অথচ এই সময়ে ঘরে থাকারই কথা। লাল টকটকে সিল্কের লুঙ্গি। খোলা গা। পিঠের ওপর ইয়া মোটা সাদা পইতে। তাতে আবার একটা আঙটি বাঁধা। হাতের আঙুলে জায়গা নেই। আংটি কোমরের কাছে ঝুলছে! চেয়ারে বাবু হয়ে বসা। ছ'টা কুকুর ঘরময় হ্যা হ্যা করছে। এক একটা পালাকরে লাফিয়ে উঠে বড়মামার হাত থেকে বিসকুট ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে হিসেব করে এক একটা বদমাইশকে ধরে ফেলছেন, 'উঁহু উঁহু সবকটাই তোর, দুটো হয়ে গেছে এইবার ওইটার পালা।' কে কার কথা শোনে, ঘাড়ে ঘাড়ে লাফাচ্ছে। মাঝে মাঝে পইতেতে পা আটকে যাচ্ছে। বড়মামা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'এইবার সবকটাকে দূর করে দোব। ইন্‌ডিসিপ্লিনড জানোয়ার।' বলেই পইতের ঝোলা অংশ তুলে কপালে ঠেকাচ্ছেন।

কোথায় সেই পরিচিত দৃশ্য! ঘরময় কুকুরের ছড়াছড়ি! প্রভু বেপাত্তা।

দক্ষিণের জানালায় উঁকি মেরে দেখি বড়মামা বাগানের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের চেহারায় ভীষণ ভাবনা। কী হল কে জানে? হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন। বাগানে নামতেই আমাকে বললেন, 'বুঝলি এইখানেই হবে।'

'কী হবে বড়মামা? নারকোলগাছ?'

'আরে না রে না। তোর কেবল খাবার চিন্তা?'

'তবে?'

'এইখানে হবে সেই লঙ্গরখানা। একপাশে বিশাল উনুন। আর একপাশে সারি সারি টেবিল আর ফোলডিং চেয়ার। ওই কোণে কল আর জল। এইখানটায় একটা পেটা ঘড়ি। ঢ্যাং করে যেই একটা বাজবে, খাওয়া স্টার্ট।

দুটোর মধ্যে যারা যারা আসবে তারাই খেতে পাবে। একটা থেকে দুটো—কড়া নিয়ম।'

'টেবিল, চেয়ার?'

'তবে না ত কি? দরিদ্রনারায়ণ সেবা। ভেজিটেবল খিচুড়ি আর যে কোনও একটা ভাজা। সপ্তাহে একদিন চাটনি। চল, এইবার চট করে হিসেবটা করে ফেলি।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতেই কুকুরগুলো মুখিয়েছিল ; সকালের বিসকুট পায়নি। চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। একটা পায়ের কাছে। একটা পেছনের দিকে পিঠের ওপর দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে। একটা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে লাফাচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'উঃ পাওনাদারদের জ্বালায় জীবন গেল।'

বিসকুট পর্ব শেষ হতে না হতেই মাসিমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সব কটা কুকুরকে এক জায়গায় দেখে বললেন, 'পয়সার কি জ্বালা। কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস বিসকুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। উৎপাতের ধন এইভাবেই চিৎপাতে যায়!'

'ঠিক বলেছিস কুসী।'

বড়মামার সমর্থন শুনে মাসিমা ভীষণ অবাক হলেন।

'অ্যাঁ ভূতের মুখে রাম নাম।'

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'এবার একেবারে অন্য রাস্তায় যাত্রা। কমপ্লিট বিবেকানন্দ! জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। প্রথমে পঁচিশজন দিয়ে শুরু, ধীরে ধীরে একশো-দুশো, তিনশো, পাঁচশো, হাজার।'

মাসীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হাজার কুকুর! এত কুকুর পাবে কোথায়?'

'গবেট! কুকুর নয়, কুকুর নয়, মানুষ। দরিদ্রনারায়ণ সেবা।'

'সে আবার কি? বারোয়ারি পুজো প্যান্ডেলে ফি বছর একদিন নারায়ণ সেবা হয়। তুমি তার প্রেসিডেন্ট হলে নাকি?'

'আজ্ঞে না স্যার। এ হবে সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের ফ্রি কিচেন, জাস্ট লাইক রাজা রাজেন মল্লিক অফ মার্বেল প্যালেস! আজই নগেনকে ডেকে বাগানে একটা আটচালা তৈরির হুকুম দিচ্ছি। কালই খগেন এসে উনুন করে দেবে। পরশু আসবে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মশলা, তেজপাতা। তরশু বেলা একটা। দেখবি সে কি কাণ্ড? গরমাগরম খিচুড়ি খেয়ে লোক দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছে—লং লিভ রাজা, সরি, ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ কি রে! বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জন্মেছিস যখন দেয়ালের গায়ে একটা আঁচড় রেখে যা। তুই হবি এই নারায়ণ যজ্ঞের সুপারভাইজার। এক সেকেন্ড বস তো। তোর পরামর্শে হিসেবটা সেরেনি। ধর পঁচিশ জন।'

মাসিমা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'তুমি দেউলে হয়ে যাবে বড়দা! তুমি নিজে মরবে আমাদেরও মারবে।'

'আমি মরি মরব। জন্মিলে মরিতে হবে। তোরা মরবি কেন—বালাই ষাট। নে, বল, পঁচিশজনে ডেলি কত চাল খেতে পারে? পেট ভরে খাবে, হাফভরা নয়, ফুলভরা।'

মাসিমা বললেন, 'পঁচিশ কেজি!'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, নার্ভাস করে দিচ্ছিস। বল, পঁচিশ পো, মিনস ওই ছ সের। মিনস ব্ল্যাকে কিনলে আঠার টাকা। এইবার ডাল। ছ সের চালে কত ডাল লাগে রে? ফর্মুলাটা কী?'

'চালের ডবল ডাল।'

'ভাগ, ভাওচি দিচ্ছিস, হাফ ডাল। হাফ মিনস তিন কেজি, পনেরো টাকা। আঠার প্লাস পনের ইজিকল্টু তেত্রিশ। ইত্যাদি আরও সাত—মানে চল্লিশ। কয়লা, রান্না ইত্যাদি দশ। রোজ পঞ্চাশ টাকা, নাথিং, নাথিং। চল ভাগনে লেগে পড়ি।'

বড়মামার সে কি উৎসাহ! তড়াং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। মাসিমা বললেন, 'ভাগনে কী ভাবে লেগে পড়বে?'

'যে ভাবে লাগার সেই ভাবে লাগবে। ওর মত ছেলে লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ।'

'সে ত বুঝলুম, কিন্তু তোমার এই রাজসূয় যজ্ঞে ও কি ঘোড়া ধরতে বেরোবে!'

'আমাদের এখন কত কাজ জানিস! আটচালা তৈরি। রাঁধবার লোক ঠিক করা। উনুন বসান। চাল ডাল কেনা। তারপর প্রচার?'

'প্রচার মানে?'

'প্রচার মানে?' বড়মামা রেগে গেলেন! 'প্রচার মানে প্রচার। লোকে জানবে কী করে? না জানতে পারলে লোক আসবে কী করে!'

'অ। তা সেটা কী ভাবে! কাগজে বিজ্ঞাপন, বিবিধ ভারতী, দেয়ালে পোস্টার, মাইক নিয়ে পাড়ায় পাড়য় ঘোরা, সিনেমায় স্লাইড! কোন্‌টা!'

'ভ্যাক্। ওর কোনটাতেই কাজ হবে না। দুস্থ মানুষ যারা পড়তে জানে না, যাদের পয়সা নেই, সিনেমা দেখে না, তাদের অন্যভাবে জানাতে হবে। ভোটের লিস্ট তৈরির মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃত গরিব মানুষ খুঁজে বের

করতে হাত জোর করে সবিনয়ে বৈষ্ণবদের মত বলতে হবে, দয়া করে এই অধমের গরিবখানায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন।'

মাসিমা বললেন, 'ডাক্তারি তা হলে মাথায় উঠল!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না, ইডিয়েট! যা আর এক কাপ চা করে আন। বেরিয়ে পড়ি। তোদের মত আলস্যযোগে জীবন ম্যাসাকার হতে দোব না। কর্মযোগ। কর্মযোগ! যোগ কর্মসু কৌশলম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। গীতা পড়েছিস গবেট!' মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বড়মামা প্যান্ট জামা পরে তৈরি হবার জন্যে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

মাসিমা ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। বড়মামা চমকে মুখ তুলে তাকালেন। কাগজে দক্ষিণপাড়ার ম্যাপ আঁকছিলেন। যে যে রাস্তা ধরে আমরা যাব তারই পরিকল্পনা।

'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে!'

'রাগলে তোমার আর কী? তুমি কার পরোয়া কর? তবে তোমার এইসব ব্যাপার মেজদা জানে?'

'হু ইজ মেজদা? তার দর্শনে জীবে দয়া নেই জিভে দয়া আছে। ভগবান একটা না দুটো, না শূন্য, ভগবান আমি না আমিই ভগবান, তিনি সাকার না নিরাকার, এই গোলকধাঁধাতেই বেচারা সারা জীবন বোকার মত ঘুরতে ঘুরতে ম্যাড হয়ে গেল। তুই যা তুই যা, আমাদের এখন অনেক কাজ। মেয়েদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই।'

মাসিমা বেশ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি বললুম, 'বড়মামা, হাওয়া খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'রাখ রাখ, ঝোড়ো হাওয়াতেই আমাদের নিশান উড়বে পতপত করে।'

মোটর সাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন, 'প্রথমে একবার চক্কর মেরে যাই। তুই শুধু চোখ-কান সজাগ রেখে যাবি। যেই মনে হবে এই লোক সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে খোঁচা দিবি। গাড়ি থামিয়ে তাকে যা বলার আমি বলব।

বড়মামার মোটর সাইকেল—তার যেমন রঙ তেমন আওয়াজ। কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা। শক্ত করে ধরে বসে আছি। পকেটে সেই ম্যাপ। বীরেন শাসমল রোড দিয়ে ঢুকে, রাম ঢ্যাং রোডে পড়ে, শরৎচন্দ্র স্ট্রিট হয়ে কালু শেখ রোড ধরে বিরাট একটা চক্কর মারা হবে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই বড়মামার অন্নসত্রে আসতে পারবে। বড় বড় হরফে দরমার গায়ে লেখা থাকবে, 'শক, হুণ দল, পাঠান, মোগল এক দেহে হল লীন।'

সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। সকলেই যে যার কাজে চলেছেন। কেউ বাজারে। কেউ স্কুলে ছেলে মেয়ে পৌঁছাতে। কেউ অফিসে। চারপাশের দোকানপাট খুলে গেছে। জমজমাট ব্যাপার। সাইকেলের সামনে

কাগজ ডাঁই করে হকার চলেছে বাড়ি বাড়ি কাগজ দিতে। চোখে এমন একজনও পড়ছে না যাকে মনে ধরে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, 'দেখবি মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জটপাকানো চুল, গর্তে বসা চোখ, শির বের করা হাত, সামনে কুঁজো হয়ে ধুকতে ধুকতে চলেছে, কিংবা উদাস হয়ে রকে কি গাছতলায় বসে আছে, বিড়বিড় করে আপন মনে বকছে, দেখলেই বুঝবি এই সেই লোক, দি ম্যান।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বড়মামা একটা বটগাছতলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'দেশের কি রকম উন্নতি হয়েছে দেখেছিস! গরিবি হটাও ত সত্যিই গরিবি হটাও, সবাই ওয়েল টু ডু ম্যান। একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

'বুধবার তা হলে পাল পাল ভিখিরি আসে কোথা থেকে?'

'আরে দূর। বুধবার এ তল্লাটের মিলফিল বন্ধ থাকে, পালে পালে সব বেরিয়ে পড়ে উপরি রোজগারের ধান্দায়। ওরা কেউ রিয়েল ভিখিরি নয়।'

আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

'আমরা যাদের খুঁজছি তারা কেউ উঠে হেঁটে আর বেড়াতে পারছে না।' কোথাও না কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে।'

'মনে হয় গঙ্গার ঘাটে, মোচ্ছবতলায়, শ্মশানে পাকুড়তলায় বাঁধান চাতালে।'

বড়মামা খুব তারিফ করলেন, 'মন্দ বলিসনি! উঠতেই যদি পারবে তা হলে ত খেটে খাবে। না খেতে পেয়ে সব লটকে পড়ে আছে। ঠিক বলেছিস। বড় হয়ে তুই ব্যারিস্টার হবি। চল তা হলে মোচ্ছবতলাতেই আগে যাই।'

বড়মামা নেচে নেচে মোটর সাইকেল স্টার্ট করলেন। ভু-ভট্‌ভট্ শব্দে আকাশ ফেটে গেল। গাছের ডালপালা থেকে পাখি উড়ে পালাল ভয়ে। গঙ্গার দিকে রাস্তাটা যতই এগোচ্ছে ততই ঢালু হচ্ছে। ইটের গোলা, খড়ের গোলা, বাঁশের গোলা, খড়কাটা কল চলছে ঘসঘস করে।

মোচ্ছবতলাতেই আমাদের প্রথম বউনি হল। একটি লোক উদাস মুখে বসে আছে। যেন জীবনের সব কাজ শেষ। হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। মুখে অল্প অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটরে ঘোলাটে চোখ। শীর্ণ শীর্ণ হাত পা! ভাঙা গাল। বকের মত গলা।

'বড়মামা-আ।'

'দেখেছি।'

'সব মিলছে। তবে নাকে তিলক-সেবা করেছে।'

'তা করুক। বৈষ্ণব, বুঝেছিস।' বড়মামা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লেন। এইবার কথাটা পাড়বেন। লোকটির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কে তা কে। জগতে কোনও কিছুর পরোয়া করে না। এইরকম একটা ভাব। বড়মামা প্রথমে গঙ্গাদর্শন করলেন। তারপর মোচ্ছবতলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এইবার কী করেন দেখি।

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার হই।'

লোকটি বললে, 'জয় নেতাই।'

বড়মামা বললেন, 'জয় নিতাই।'

লোকটি বললে, 'দেশলাই আছে?'

'দেশলাই ত নেই।'

'সিগারেট আছে?'

'সিগারেট ত খাই না।' বড়মামা যেন খুব লজ্জা পেলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা হবে?'

বড়মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল আশার আলো ফুটেছে। এতক্ষণে লোকটি এমন একটা জিনিস চেয়েছে যা বড়মামার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা গোল টাকা বের করে লোকটির হাতে হাসি হাসি মুখে দিলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা আবার ফেরত দিতে হবে না কি?'

'না না, পুরোটাই আপনার। এইবার একটা কথা বলব?'

'কী? কেউ মরেচে নাকি?'

বড়মামা চমকে উঠলেন, 'কেউ মরবে কেন?'

'আমার সঙ্গে লোকের কথা মানেই ত, কেউ মরেচে, দুখী বোষ্টম, চল হে কেত্তন গাইতে হবে।'

'না না ওসব নয়, ওসব নয়। অন্য কথা। আপনি খেতে পারবেন!'

'খেতে?' কি খেতে? শ্রাদ্ধ!'

'না না শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ নয়। এমনি খাওয়া। রোজের খাওয়া। ভোগ আর কি?'

'কোন্ আশ্রম! আমি চরণদাস বাবাজীর চেলা। অন্য ঘরে নাম লেখাতে পারব না। ধম্মে সইবে না।'

'আশ্রম নয়। আমার বাড়িতে।'

'কার পাচিত্তির! কী অসুখ!'

'পাচিত্তির মানে? ও বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্ত। না-না প্রায়শ্চিত্ত নয়। জাস্ট এমনি খাওয়া।'

'বদলে কী করে দিতে হবে? বেড়া বাঁধা, ঘুঁটে দেওয়া, চেলা কাঠ কাটা খড় কাটা!'

'কিচ্ছু না কিচ্ছু না, ওসব কিচ্ছু না। রোজ ১টা নাগাদ যাবেন, খাবেন দাবেন চলে আসবেন।'

'কী খাওয়া!'

'খিচুড়ি, ভাজাটাজা এই আর কী?'

'কী ডাল? মুসুর ডাল চলবে না। মুগ হওয়া চাই।'

'তাই হবে।'

'কী চাল? আলো না সেদ্ধ?'

'ধরুন সেদ্ধ।'

'হ্যাঁ সেদ্ধই ভাল। আলোতে পেট ছেড়ে দেবে। ও বেধবাদেরই চলে রেশনের কাঁইবিচি চাল, না বাজারের চাল?'

'বাজারের, খোলা বাজারের ভাল চাল।'

'ঘি পড়বে, না খসখসে খেসকুটে? খিচুড়িতে ঘি না পড়লে টেস্ট হয় না।

'হ্যাঁ তা পড়বে।'

'শালপাতায় না কলাপাতায়, না চটা ওঠা এনামেলের থালায়?'

'না না, ধরুন শালপাতায়।'

'হ্যাঁ এনামেল হলে খাব না। তা শেষ পাতে একটু মিষ্টি না থাকলে জল খাব কী করে? বোষ্টম মানুষ। একটু পায়েস হলেই ভাল হয়।'

'সপ্তাহে তিন দিন।'

'রোজ হলেই ভাল হয়। যাক মন্দের ভাল। হ্যাঁ, একটা কথা, বোষ্টমীকে নিয়ে আমরা সাতটি প্রাণী। সপরিবারে না আমি একলা!'

বড়মামার মুখ দেখে মনে হল আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন, সাত জন বলে কী? এ যে মেঘ না চাইতেই জল। 'না না, একা নয় একা নয়। সপরিবারে।

'জয় নেতাই। তা হলে কবে থেকে?'

'আজ হল গিয়ে রোববার। সোম, মঙ্গল, বুধ। হ্যাঁ বুধ ভাল বার।'

'প্রভুর নিবাস?'

বাব্বা, বড়মামা প্রভু হয়ে গেলেন। মেজমামা একবার শুনলে হয়। জ্বলে যাবেন। বড়মামা বাড়ির নির্দেশ দিতেই লোকটা বললে, 'অ, আমাদের কেদারবাবুর বড় ছেলে। সেই ছিটেল ডাক্তার।' বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল, 'ছিটেল বললেন!'

'ছিটেলকে ছিটেল বলব না! সবাই জানে ডাক্তারটা খেয়ালি।'

'আমিই সেই ডাক্তার।'

'সে আগেই বুঝেছি। হক কথা বলব, ভয়টা কিসের! উকিল আর ডাক্তার শেষ জীবনে পারের কড়ি কুড়োতে চায় ধম্ম কম্ম করে। সারা জীবনের অধম্মের পয়সা। একজন মারে মক্কেল, আর একজন মারে রুগী। দেখেন না, আজকাল মন্দিরে আশ্রমে কত ভিড়! সব ওই ভেজালদার কালোবাজারি, ডাক্তার, উকিল, এম এল এ, মন্ত্রী।'

ভট্ ভট্ করে মোটর বাইকে আসতে আসতে বড়মামা বললেন, 'কী রকম ট্যাকট্যাকে কথা শুনেছিস! ওই জন্যে লোকের ভাল করতে নেই। নেহাত সেদিন বইয়ে পড়লুম, লিভ, লাভ অ্যান্ড লাফ্ তা নইলে অ্যায়সা রাগ ধরছিল। যাক বরাতটা খুব ভাল। এই বাজারে সাত সাতটা লোক পাওয়া! বাকি রইল আঠারোটা।'

'ভাববেন না বড়মামা। ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। একবার খবরটা ছড়াতে দিন।'

আরও টহল মারা হল। এবার আর চারে মাছ পড়ল না, যাক সাতটা পড়েছে। ভাল ক্যাচ। বড়মামার বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারের নাম সতুবাবু। তাঁর ওপর ভার দেওয়া হল আরও আঠারো জন সংগ্রহ করার। 'পারবেন ত!'

'হ্যাঁঃ' সতুবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'আঠারো কেন, আঠারশো ধরে এনে দিতে পারি।'

বেলা বারোটা নাগাদ লোকলস্কর নিয়ে বড়মামা নেপোলিয়নের মত মার্চ করে বাড়ি ঢুকলেন। একজন বাগানের আগাছা পরিষ্কার করবে, বাঁশ বাঁধবে। একজন উনুন পাতবে। একজন দরমা ঘিরবে। মাসিমা সেই পল্টন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। এখনি হুকুম হবে, চা দে কুসী, চাল নে, সব ভাত খাবে।

হইহই ব্যাপার।

মেজমামা এক ফাঁকে খুব গম্ভীর মুখে আমাকে ডাকলেন, 'কী সব হচ্ছে হে! ভূতের নৃত্য!'

'খুব মজা মেজমামা। কত লোক আসবে। খাবে। দু'হাত তুলে খাবার সময় চিৎকার করে বলবে, জয় রাজা রাজেন মল্লিক।'

'রাজা রাজেন মল্লিক! তোমার বড়মামা কি নাম পালটে ফেললে নাকি! নাম ভাঙিয়ে শেষে এই অসৎ কাজে নেমে পড়ল?'

'আমি কী বলতে কী বলে ফেলেছি! আসলে বলবে জয় রাজা সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'রাজা! কোথাকার রাজা? কাম্পুচিয়ার! টাইমটেবলটা দাও তো। এনে মেজমামার হাতে দিলুম। একটা পাতা খুলে বিড় বিড় করে পড়তে লাগলেন, 'আট নম্বর প্লাটফর্ম, রাত ন'টা চল্লিশ।'

'কোথায় যাবেন মেজমামা!'

'যেদিকে দুচোখ যায়'

'সে কী?'

'হ্যাঁ তাই। পাগলামি অনেক সহ্য করেছি আর নয়।'

'দরিদ্রসেবা পাগলামি? অসৎ কাজ?'

'পরে বুঝবে। এখন যেমন নাচ্ছ নেচে যাও। সবুরে মেওয়া ফলবে। তখন মেও সামলাতে পুলিশ ডাকতে হবে।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসার কী বলছিল রে?'

'বলছিলেন, অসৎ কাজের ঠেলা পরে বুঝবে কাম্পুচিয়ার রাজা।'

'অসৎ কাজ!' বড়মামা হই হই করে হেসে উঠলেন, 'হিংসে, বুঝলি, হিংসে। সারাজীবন ছেলে ঠেঙিয়ে কিছুই করতে পারল না, আমি এককথায় ফেমাস হয়ে গেলুম। এখন পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে, সুধাংশু মুকুজ্যের ভাই। কোন্ সুধাংশু? আরে সেই ডক্টর সুধাংশু—গরিবের মা-বাপ।'

'মেজমামা ত রাত ন'টা চল্লিশের ট্রেনে যে দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভজা, ভজা!'

বড়মামার পার্শ্বচর ভজা। 'যাই বড়বাবু।'

'চাল?'

'আ গিয়া।'

'ডাল?'

'ও ভি আ গিয়া।'

'বহুত আচ্ছা। চা বানাও।'

ভজা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গোয়ালে গরু তিনটে ফ্যাল ফ্যাল করে প্রায় খালি ডাবরের দিকে তাকিয়ে আছে। কালোটা হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল। মানে, এবার দুধ দেবার চেষ্টা কর, নয়ত মালিক খুব খেপে গেছে। ন্যাজ মলে বিদায় করে দেবে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। সানাইটাই যা বাজল না। তা ছাড়া সবই হল। সকালে মন্ত্র পড়ে উনুন পুজো হল। বাঁশ থেকে ফুলের মালা ঝুলল ঝুলুর ঝুলুর করে। কাগজের রঙিন শিকলি চলে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। শ্যাম জেঠা বেলতলায় বসে সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ করলেন। বড়মামা মাসিমাকে ডেকে বললেন, 'কুসী, সকালে আমি আর তোদের বাড়ি খাব না। সকলের সাথে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি হর্ষবর্ধন। সঙ্গমে স্নান করে নিজের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত দান করে দোব—।'

'তারপর নেংটি পরে কুয়োতলায় ধেই ধেই করে নাচব।' মাসিমা রেগে চলে গেলেন। মেজমামা দোতলার বারান্দা থেকে মাসিমাকে চিৎকার করে বললেন, 'ভুলে যাসনি, আমার ট্রেন রাত ন'টা চল্লিশে।'

ওদিকে বেলতলায় শ্যাম জেঠার উদাত্ত গলা, 'রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি।' জোড়া উনুনে আগুন পড়েছে। গল গল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে গাছের ডালপালা ভেদ করে।

মেজমামা খুব উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বললেন, 'সেই সাত সকাল থেকে দেহি দেহি শুরু হয়েছে। যার অত দেহি দেহি সে হবে দাতা কর্ণ!'

ছ'টা কুকুর বাড়ি একেবারে মাথায় করে রেখেছে। যত অচেনা অচেনা লোক দেখছে ততই ঘেউ ঘেউ করছে। মাসিমা গ্লিসারিনে তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রেখেছেন। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। সে এক জ্বালা! জল চাইলে তেল এনে দিচ্ছেন।

পেয়ারাগাছের ডালে কাঁসার ঘড়ি বাঁধা হয়েছে। সাবেক কালের জিনিস। বেলা একটার সময় ঢ্যাং করে বাজিয়ে ঘোষণা করা হবে—শুরু হল সবাই বসে পড়।

দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। ভজুয়া দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে, দু হাতে একটা লোহার রড ধরে ঘড়িতে ঘা মারল। সারা এলাকা কেঁপে উঠল ঢ্যাং শব্দে। আওয়াজ বটে। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

সবার আগে এল জয় নিতাইয়ের দল। সপরিবারে, হইহই করে! সকলেরই নাকে নিখুঁত রসকলি। বোষ্টম, বোষ্টমী, গেঁড়ি-গেঁড়ি ছেলেমেয়ে। এটা লাফায়, ওটা ছোটে। বড়টা ছোটটার মাথায় গাঁট্টা মারে। ছোটটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মা সবকটাকে ধরে পাইকারি পিটিয়ে দেয়। 'ওঁ শান্তি', 'ওঁ শান্তি', শ্যাম জেঠার আর্তনাদ।

'বসে পড় সব, বসে পড় সব।

ফোলডিং চেয়ার উলটে চার বছরের ছেলেটা মাটিতে চিৎপাত হল। বুকের ওপর চেয়ার। পায়ায় ঠ্যাং জড়িয়ে গেছে।

'জয় নেতাই পড়ে গেছেরে বাপ। খেঁচকে তোল আপদটাকে।'

'তুলসীগাছ কোন্ দিকে?'

'তুলসীগাছ কী হবে গো?' ভজুয়া জিজ্ঞেস করল।

'দুর বেটা খোট্টা। তুলসীপাতা ছাড়া ভোগ হয়!' বড়মামার তুলসীঝাড় ফাঁকা।

পঁচিশ কোথায়? পিল পিল করে লোক আসছে।

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'মরেছে, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ রে? হাঁড়ি নয় ড্রাম ড্রাম খিচুড়ি লাগবে। স্টপ দেম। অ্যানাউনস করেছে, পঁচিশ জনের বেশি নয়। গেটটা বন্ধ করে দে রাসকেল ভজুয়া।'

'গেট বন্ধ করে আটকানো যাবে না ডাগদারবাবু। গেট টপকে চলে আসবে।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দে।'

'মেরে শেষ করে দেবে বাবু।'

বড়মামা গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুনুন শুনুন, আমাদের এই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের জন্যে।'

প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল, 'আমি সেই পঁচিশ জনের একজন।'

'তা কী করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটের প্যান্টসার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরিব।'

চিৎকার উঠল 'আমরা মডার্ন গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।'

'আমি মডার্ন গরিব বেছে নেব।'

'বেছে নেব মানে? এটা কি স্টেট লটারি? কে বেছে নেবে?'

বড়মামা খুব অসহায়ের মত বললেন, 'সে কী রে বাবা, এরা যে দেখছি তেরিয়া হয়ে উঠছে, বেশ জোর যার মুলুক তার। আপনারা পঁচিশজন বাকি সকলকে ঠেকিয়ে রাখুন। তাজিয়া কাজিয়া যা হয় নিজেরাই ফয়সালা করুন।'

মার, মার, হই, হই, রই, রই। হে রে রে রে করে লোক ঢুকছে। যেন দশ আনার টিকিটের সিনেমার কাউন্টার খোলা হয়েছে। ভজুয়া পালাতে পালাতে বললে, 'আরও আসছে বাবু। নারায়ণকা জুলুস নিকলেছে আজ।'

শ্যাম জেঠা পালাতে পালাতে বললেন, 'সুধাংশু, প্রাণে যদি বাঁচতে চাও পেছনের দরজা দিয়ে পালাও।'

বড়মামা ভয়ে পেছতে পেছতে বললেন, 'য পলায়তি স জীবতি।' ব্যাপারটা বুফে লাঞ্চের মত হয়ে গেল। যে পারে সে নিয়ে খাক।

চেয়ার ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। একপাশের সামিয়ানা কেতরে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে বড়মামার লাল মোটরবাইক তীরবেগে পশ্চিমে ছুটছে।

মেজমামা কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোন ডায়াল করছেন।

'হ্যালো থানা। নরনারায়ণে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। বড় বড় থান ইট ছুড়ছে। ও সেভ আস, সেভ আস।'

ছ'টা কুকুর বাগানে নেমে পড়েছে খেপে গিয়ে। মাসীমার কানে অ্যায়সা তুলো ঢুকেছে কিছুতেই বের করতে পারছেন না। মাথার কাঁটা, দেয়াশলাই কাঠি যতই খোঁচাখুচি করছেন গ্লিসারিন-তুলো ততই ভেতরে চলে যাচ্ছে। কেবল বলছেন, 'এখনও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে! শিলা-বৃষ্টি হচ্ছে না কি রে!'

আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে। প্যান্ডিমোনিয়াম! আরে দূর মশাই হারমোনিয়াম নয় প্যান্ডিমোনিয়াম!